রবীন্দ্র-গীতি

শ্রীজয়দেব রায়

রবীন্দ্রাব্দ ৯২
পঁচিশে বৈশাখ : ১৩৬০

উৎসর্গ

আমার স্বর্গত পরমাত্মীয়

জগৎমোহন সেন

এবং

নারায়ণদাস সেনগুপ্তের

পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে-

লেখকের—

সঙ্গীত-পরিক্রমা

প্রাচীন বাংলা গান, কাব্য সঙ্গীত,

গ্রাম্য গীতি, সাধন সঙ্গীত,

উচ্চাঙ্গের গান প্রভৃতির আলোচনা

(যন্ত্রস্থ)

বাংলা সাহিত্যের গল্প

কিশোরদের উপযোগী

বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক পরিচয় !

(যন্ত্রস্থ

ভূমিকা

আমি রবীন্দ্রনাথকে চোখে দেখিনি, তাঁর আশ্রমের ছায়া-বীথিতলে আমি আশ্রয়ও পাইনি। তবে তাঁর অতি অন্তরঙ্গ এবং তাঁর সাঙ্গীতিক জীবনের ঘনিষ্ঠ সহচরদের অনেকের সঙ্গে কবিগুরুর গান নিয়ে নানাভাবে আলোচনা করবার সুযোগ পেয়েছি এবং বহুস্থলে তাঁদের উপদেশও গ্রহণ করেছি।

তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী, শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীদিলীপকুমার রায়, শ্রীকালিদাস নাগ. শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্ত এবং শ্রীসুধীরচন্দ্র করের নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। বিশেষ ভাবে আমি দিলীপকুমারের কাছে ঋণী, তাঁর কাছেই আমি সব চেয়ে বেশি উৎসাহ পেয়েছি।

এ ছাড়া রবীন্দ্র-সঙ্গীতের পরিবেশনকারী রসিক শিল্পীরা অনেকেই আমাকে উৎসাহিত করেছেন। লয়লা আর্জুমন্দ্ বানু কবির গানের একটা দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যতো মুদ্রিত প্রবন্ধ, অভিমত এবং গ্রন্থাদি আমার চোখে পড়েছে, সেগুলি থেকে আমি যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি।

এজন্য সেই সকল রচনার লেখকদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা ভরে ঋণ স্বীকার করছি।

রবীন্দ্র-গীতির বিষয়ে আরো কিছু বলার বাকি রইল, সে সঙ্গে অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত এবং নজরুলের

গানের আলোচনা সমেত বাংলা গানের একটা ধারাবাহিক ইতিহাসের বই সত্বর প্রকাশের বাসনা আছে।

এ প্রবন্ধগুলি সবই বহু পূর্বে নানা দৈনিক-সাপ্তাহিক-মাসিক এবং বার্ষিক পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল—অনুরাগী ও কৌতূহলী পাঠকদের সুবিধার জন্য সেগুলি এখানে একত্র সঙ্কলিত করা হ'লো।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর গানের সম্বন্ধে নানা মতামত জানিয়ে গেছেন, এখানে তাঁর অভিমত হ'তে বহুস্থলে অংশ বিশেষ উৎকলন করেছি।

প্রবন্ধগুলি লিখ্‌বার সময়ে কবির একটা কথা বারবার মনে হয়েছে—

"যে সব বই লিখেছি তার চেয়ে অনেক বেশি বই লিখিনি, সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার মাষ্টারপীস্‌টা সেই অলিখিত রচনা-রত্নভাণ্ডাগারে রয়ে গেল! আমার সব মত যদি নিজেই স্পষ্ট করে লিখে দিয়ে যাব, তবে যারা থীসিস্‌ লিখে খ্যাতি অর্জন কর্‌বে তাদের যে বঞ্চিত করা হবে। সেই সব অনাগত কালের থীসিস্‌রচয়িতার কল্পচ্ছবি আমার মনের সামনে ভাস্‌ছে, তারা একাগ্রচিত্তে অতীতের আবর্জ্জনাকুণ্ড থেকে জীর্ণবাণীর ছিন্ন অংশ ঘেঁটে বের ক'রে তার ঘণ্ট তৈরি কর্‌ছে—যে অংশ পাওয়া যাচ্ছে না সেইটেতেই তাদের মহোল্লাস। আমি তাদের আশীর্ব্বাদভাজন হোতে চাই।"

কবির এই উক্তির উপর নির্ভর করে তাঁর টুক্‌রো টুক্‌রো মন্তব্যগুলোকে গ্রথিত করবার সাহস পেয়েছি।

সূচি-পত্র

বিষয়

বাংলা গানের ইতিহাস

আধুনিক যুগের পূর্বে সাহিত্য এবং সঙ্গীত ছিল অঙ্গাঙ্গী ভাবে সন্নিবিষ্ট। প্রায় প্রতি দেশেই সাহিত্য-সৃষ্টি হইয়াছে প্রথম পদ্যে, তাহার পর গদ্যে। বাংলা ভাষাতেও প্রথম সৃষ্ট হইয়াছিল কাব্য-সাহিত্য, তাহার পর ইংরাজী প্রভাবে গদ্যসাহিত্যের উৎপত্তি। পদ্যের প্রচারও হইত সঙ্গীতের মাধ্যমে। প্রাচীন যুগে মুদ্রাযন্ত্রও ছিল না, লিপিকারেরও অভাব ছিল; শিক্ষারও প্রসার হয় নাই, বর্ণপরিচয়ই ছিল অতি অল্প-সংখ্যক লোকের। কাজেই সাধারণ লোকের পক্ষে পুঁথি ধরিয়া পদ্য পড়িবারও প্রথা ছিল না। সাহিত্যের যেটুকু রস, ভাব বা কলাচাতুর্য্যের পরিচয় জনসমাজ পাইত, সবই এই সঙ্গীতের মাধ্যমেই। সঙ্গীতই ছিল একমাত্র হৃদয়াবেগ প্রকাশের পথ—রসিক এবং রসশিল্পীর মধ্যে সংযোগ সাধন করিত সঙ্গীত।

বাংলাগানের উৎস শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দে। জয়দেবই পদাবলী-সঙ্গীতধারার প্রবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার ললিতকান্ত কোমল পদগুলি সুর ও ছন্দে উদ্‌গীত হইবার জন্যই রচিত হইয়াছিল। এগুলির বৈশিষ্ট্য—কেবলমাত্র আবৃত্তিতেই এগুলি সঙ্গীতের পদবীতে উন্নীত হয়। গানের ভাষা প্রায় বাংলাই, পদগুলি পরে বাংলা গানের সঙ্গে কীর্ত্তনাঙ্গের পালার অঙ্গীভূত হইয়া সমাদর পাইল।

কবি জয়দেবের কৃষ্ণগীতি হইতেই বাংলা গানের যাত্রা সুরু হইল। তাঁহার ভাবধারাকে অবলম্বন করিয়া আমাদের নিজস্ব গীতিধারা প্রবাহিত হইল। জয়দেবের সময়ে গীতগোবিন্দের গানগুলি কিভাবে

গাওয়া হইত জানা যায় না, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেরণায় কীর্ত্তন-সঙ্গীতে গীতগোবিন্দের পদাবলী অভিনব ব্যাখ্যা ও সার্থকতা পাইল, গুণিগণ তাহাতে অপূর্ব সুর, রসরূপ এবং ভঙ্গীও আরোপ করিল। শ্রীচৈতন্যদেব নিজে এসব গান শুনিতেন—

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ। এই তিন গীত করায় প্রভুর আনন্দ॥

বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যগণের গানগুলিতে হইয়াছিল একাধারে সঙ্গীত, ধর্ম ও কাব্যসাহিত্যের সমন্বয়। চর্য্যাগানগুলির সুরভঙ্গিমা ছিল উচ্চাঙ্গের। এইগুলিতে আধ্যাত্মিক সাধনার গূঢ় তথ্য আছে। কাজেই সাধারণ জনগণের জন্য সুরভঙ্গি সহজে অধিগম্য হয় নাই। গানের অর্থ এবং রস গূঢ়ব্যঞ্জনায় অর্থাৎ ঠারে-ঠোরে গ্রহণ করিতে হয়। সে হিসাবে বাউল জাতীয় Mystic songsএর সহিত চর্য্যাগানের তুলনা হইতে পারে। চর্য্যাপদের নির্দিষ্ট রাগিণী গুলি সবই সুপরিচিত। 'ভবনই গহন গম্ভীর বেগে বাহী' (গুজ্জরী) এবং 'সুনে সুন মিলিআ জবে'(মল্লার)।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গাওয়া হইত নাটকীয় ধরণে। ইহাকে ধামালী সঙ্গীত বলা হইত, ধামালী হইল সঙ্গীতে রসকলহের ঢঙ। অনেকটা যাত্রার পূর্ব্বাভাস। তাহার ভাষা ছিল প্রাচীন বাংলা; পদগুলিতে সুরশ্রেণীর সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে—

কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে—(কেদার রাগ রূপক তাল)। একতালা প্রভৃতি তালের সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেই।

বিদ্যাপতি ভারতীয় কবি-সমাজে গুরুস্থানীয়। বাংলার বৈষ্ণব গীতির ধারা বিদ্যাপতি হইতেই উৎসারিত। বিদ্যাপতি কবিতা রচনার জন্য মৈথিলীর একটি অপভ্রষ্ট রূপ 'অবহট্‌ঠা' নামে কৃত্রিম ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাংলায় এই ভাষাই ব্রজবুলি রূপ ধারণ করিয়াছে। বিদ্যাপতির প্রসিদ্ধ পদের সুর-শ্রেণী—

আজু রজনী হাম, ভাগে পোহাইলুঁ—(ললিত)।

রবীন্দ্রনাথ শৈশবে এই ভাষার শব্দঝঙ্কারে মোহিত হইয়া ললিত মধুর গীত রচনা করিয়াছিলেন 'ভানু সিংহ ঠাকুরের পদাবলী' নামে।

পদকর্তাদের অনেক আগেই মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণবিজয় নামে 'ভাগবতের' কাহিনী-অংশের অনুবাদ করিয়াছিলেন। পয়ার ছন্দে রচিত হইলেও এবং গীতি-মাধুর্য্যের অভাব থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণবিজয়ও গ্রামে গ্রামে পরিগীত হইত। রাগ-রাগিণীর মধ্যে মল্লার, শ্রী, বেলোয়ার, রামকেলি, কানাড়া এবং অসংখ্য অপ্রচলিত রাগের উল্লেখ আছে।

চৈতন্যোত্তর-যুগে বাংলা দেশ গানের বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল। পদাবলী এবং কীর্ত্তনসঙ্গীত অঙ্গাঙ্গীভাবে অনুস্যূত! ধর্মসঙ্গীতের চাহিদায় ও প্রেরণায় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির এইরকম দৃষ্টান্ত জগতের সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল নয়। দেশের সঙ্গীত-প্রতিভা সম্পূর্ণ ভাবে এই পদাবলী গানেই নিয়োজিত হইয়াছিল। তাহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত কীর্ত্তনসঙ্গীতই বাঙ্গালীর ভাবমানসকে প্রতিবিম্বিত করিতেছে।

"বর্ষা ঋতুর মত মানুষের সমাজে এমন একটা সময় আসে, যখন হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাষ্প প্রচুররূপে বিচরণ করিতে থাকে। শ্রীচৈতন্যের পরে বাংলা দেশের সেই অবস্থা আসিয়াছিল। তখন সমস্ত আকাশ প্রেমের রসে আর্দ্র হইয়াছিল। তাই দেশে সে সময় যেখানে যত কবির মন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সকলেই সেই রসের বাষ্পকে ঘন করিয়া কত অপূর্ব ভাষা এবং নূতন ছন্দে কত প্রাচুর্যে এবং প্রবলতায় তাহারে দিকে দিকে বর্ষণ করিয়াছিল।"(র)

অনেকে অনুমান করেন কীর্ত্তন পূর্বেও প্রচলিত ছিল, তবে শ্রীমহাপ্রভুর প্রেরণায় তাহার নব ভাবকলেবর লাভ হয়। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পদকর্তাদিগের মধ্যে আমরা স্মরণ করিতেছি গোবিন্দদাসের গানকে—'কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল—(কামোদ), জ্ঞানদাসের রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর—(ভূপালী)। পদকর্তাদের মধ্যে

দ্বিজ চণ্ডীদাসের স্থান স্বতন্ত্র। তাঁহার গানকে জনসাধারণ এত আপন করিয়া লইয়াছিল যে আজো সে গান কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে। 'যত নিবারিয়ে চিতে নিবার না যায় রে' (গান্ধার) প্রভৃতি পদ কীর্ত্তনের সুরকে অপূর্বতা দান করিয়াছে। মনোভাবকে প্রকাশ করিবার আনন্দ এত. আবেগ এত যে, তখনকার শাস্ত্রীয় সঙ্গীত একা তাহাতে থই পাইল না। তখন নানা জনে মিলিয়া কবির সে ভাবের উপযোগী এক অপূর্ব্ব বিশিষ্ট সঙ্গীত-প্রণালী গঠন করিল। এই সঙ্গীত-শিখা যেন বাংলার গ্রামের কুটীরের স্নিগ্ধ প্রদীপ-খানি প্রাঙ্গণে আজো সমভাবে জ্বলিতেছে।

"এক একটি জাতির আত্মপ্রকাশের এক একটি বিশেষ পথ আছে। বাংলাদেশের হৃদয় যেদিন আন্দোলিত হয়েছিল, সেদিন সহজেই কীর্ত্তন-গানে সে আপন আবেগ সঞ্চারের পথ পেয়েছে—এখনো সেটা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নি!" (র)

খেতুরির মহোৎসবে বৈষ্ণবগুরু নরোত্তমদাস ঠাকুর কীর্ত্তনের বিজ্ঞান-সম্মত সুর সৌষ্ঠব দান করেন। তাঁহার প্রবর্তিত কীর্ত্তন-রীতির নাম গরানহাটী। শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রেরণায় মনোহরশাহী ও রেনেটি রীতির প্রবর্ত্তন হয়। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতির পদ মনোহরশাহী রীতিতে গীত হয়। মান্দারনা রীতি লঘুসুরের উপযোগী।

আগমনী-বিজয়ার গান, এবং কালী-মহিমাপ্রচারের জন্য বিভিন্ন ভঙ্গীর গানের সৃষ্টি হইল। রামপ্রসাদকেই শাক্ত পদাবলীর প্রথম প্রবর্ত্তক বলা হয়। কবিরঞ্জন কেবল গীতরচয়িতাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন সাধক, সঙ্গীতে মহাশক্তির তান্ত্রিক পূজার প্রবর্ত্তক। রামপ্রসাদ-প্রবর্ত্তিত শ্যামাসঙ্গীতের গানের ধারাটিকে রামকৃষ্ণ-

বিবেকানন্দের সময় পর্য্যন্ত শাক্তকবিরা নূতন নূতন সুর-তরঙ্গে বাহিয়া আনিয়াছেন।

এই শ্যামা-সঙ্গীত-ধারাই আবার বাংলার কবি-গানের মধ্য দিয়া আধুনিক যুগে প্রবাহিত হইয়াছে। বিখ্যাত কবিওয়ালা হরু ঠাকুর, রাম বসু, ভোলা ময়রা, এণ্টনী সাহেবও শ্যামাসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন।

দেশের অধিকাংশ সংগীত-প্রতিভা গতানুগতিক ভাবে কীর্ত্তন এবং পাঁচালীতে নিয়োজিত হইয়াছিল, অবশিষ্ট যাহা ছিল তাহার অতি সামান্যই সঙ্গীতের অন্যান্য ধারারক্ষার জন্য বিশেষতঃ সুরের কৌশল বা কালোয়াতি প্রদর্শনের জন্য প্রয়োগ করা হইল। শ্যামাসঙ্গীতেই সঙ্গীতের সেই সুরাভিজাত্য রক্ষিত হইয়াছিল; তাহাই বাংলাগানে সঙ্গীতের উচ্চাঙ্গের ধারা বজায় রাখিয়াছে।

বহু প্রাচীনকাল হইতে কথকতার মধ্য দিয়া আমাদের দেশে রসপরিবেষণের প্রথা প্রচলিত আছে। কথক ঠাকুরদের গাহিবার ও ব্যাখ্যানের ভঙ্গী অনেকটা প্রায় একই প্রকার। বাংলার সঙ্গীত ধারায় কথক ঠাকুরের দান অল্প নয়।

বাংলার গীতি-সাহিত্য, ব্যতীত অপর যে সকল কাব্যধারা প্রচলিত ছিল, তাহার কিছু অংশ এই কথকতার আশ্রয়েই প্রচারিত হইত। এইগুলির মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত, চরিত কাব্য এবং মঙ্গল-কাব্যগুলির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইগুলির কতকটা আবৃত্তি, কতকটা সুর ও কতকটা গদ্যাত্মক ব্যাখ্যায় অভিনব রূপ ধরিত।

রামনিধি গুপ্ত মহাশয় পশ্চিমের হিন্দুস্থানী সঙ্গীত হইতে যে নব-সঙ্গীত-রীতি বাংলা গানে প্রবর্ত্তন করিলেন তাহাই হইল প্রাকৃত প্রেমের গানের প্রধান অবলম্বন। নিধুবাবুর গান শোরিমিঞার টপ্পার অনুকরণে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের আদর্শে রচিত। তাঁহার এ শ্রেণীর বাংলা

গানে সুরেরই প্রাধান্য ঘটিয়াছে—অল্প কথাশ্রিত স্বল্পাক্ষর গানে কাব্যের বিশেষ স্থান ছিল না। সুরের খেলার জন্য গানের মধ্যে প্রচুর অবসর ও অবকাশ আছে। নিধুবাবুর পর শ্রীধর কথক টপ্পায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন।

গোপাল উড়ের প্রভাবে বাংলায় ঠুংরি ভঙ্গীর গানের প্রচলন হয়। প্রণয়ের চটুলতা প্রকাশের জন্য ঠুংরি চালের গানের আদর হইত।

বাংলা দেশে যথার্থ উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত বা Classical গানের প্রচলন কোনোদিনই বিশেষ ছিল না, অভিজাত সমাজে হয়ত কতকটা আদর হইত। সাধারণ লোকের নিকট ধ্রুপদ-খেয়ালের বিশেষ আকর্ষণ মোটেই ছিল না। তাই ব্রাহ্মসমাজে রাগ-সঙ্গীতের অনুকরণে গান রচনা করিবার সময় কবিদের হিন্দুস্থানী গানের শরণ লইতে হইয়াছিল।

অভিজাত সুরের গীতরচনায় দাশরথি রায় বিশেষ স্মরণীয়। দাশুরায়ের পাঁচালী ব্যতীত তাঁহার অসংখ্য উচ্চাঙ্গের রাগ-প্রধান গান বৈঠকী আসরে প্রচলিত ছিল। "হৃদি বৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি" (জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল) তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ উচ্চাঙ্গের গানের নিদর্শন।

শাক্তপদাবলীর পরবর্ত্তী কবি-সাধক কমলাকান্ত রামপ্রসাদী শ্যামাসঙ্গীতের ধারা অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। আগমনী বিজয়ার গান বা উমাসঙ্গীতকে রামপ্রসাদের পরে তিনিই পরিপুষ্ট করেন। 'মজ্‌ল আমার মন ভ্রমরা' (সিন্ধু খাম্বাজ) তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গান।

গোবিন্দ অধিকারী এবং নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়—দুইজন যাত্রাধিকারীর নাম গানের ইতিহাসে স্মরণীয়। নীলকণ্ঠের ভজনশ্রেণীর গানগুলির কবিত্ব এবং সুরশ্রেণী প্রশংসনীয়। "কতদিনে হবে প্রেমের সঞ্চার" তাঁহার বিখ্যাত গান।

বাংলা গানে নজরুলপূর্ব্ব যুগে আরেকজন মুসলমান গায়কের নাম

শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতে হয়—তিনি বেলায়েৎ হোসেন। সঙ্গীত রচয়িতা হিসাবে কবির উপনাম ছিল কালীপ্রসন্ন। 'নিত্যধামে যাবে বলে' (ইমন) তাঁহার প্রসিদ্ধ গান।

কীর্ত্তনের পুরাতন ধারা টপ্পার প্রভাবে প্রায় অবলুপ্ত হইয়া আসিয়াছিল। বাংলায় গ্রাম্য বাউলগণ সেই ধারাতে নূতন সুরপ্রবাহ বহাইয়াছিলেন। এই অখ্যাত, অবজ্ঞাত, অশিক্ষিত বাউলদের গানেই বৈরাগী বাংলার প্রাণের দ্রুত স্পন্দন ধ্বনিত হইতেছিল। পূর্ব্ববাংলার ভাটিয়ালী, সারি এবং পশ্চিম বাংলার বাউল আমাদের বিশিষ্ট লোকসঙ্গীতের ধারা।

'মানুষ চলে কলের বলে' প্রভৃতি বাউল অঙ্গের হাসির গান রচনা করিয়াছিলেন রূপচাঁদ পক্ষী।

মধুকানের গান 'ঢপকীর্ত্তন' নামে পরিচিত। বাংলার কীর্ত্তন ধারার গানে নূতন সুরভঙ্গিমা সৃষ্টির জন্য তিনি স্মরণীয়।

কলঙ্কভঞ্জন, অক্রূরসংবাদ, মাথুর, প্রভাস এই চারিটি তাঁহার গানের প্রসিদ্ধ পালা।

বাংলা উচ্চাঙ্গের গানে কবিত্বের অবকাশ ছিল অল্প; সুরকে প্রকাশ করাই ছিল গায়কদের একমাত্র লক্ষ্য। মুষ্টিমেয় রসিকজনের জন্য সুর ছিল অভিজাত, শ্রোতারা ছিলেন দরদী এবং গীতিকার ছিলেন সতর্ক। ক্রমেই প্রচারের সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ শ্রোতৃগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তাহাদের মনোরঞ্জনের জন্য সুর হইয়া পড়িল নিকৃষ্ট বাণীর দাস। ঠিক্ এরকম নজির আধুনিক ফিল্মগানেও পাওয়া যায়। 'কবির গান' হইল সেই যুগসন্ধিক্ষণের সাক্ষী। পরে রবীন্দ্রনাথ সেই সুর-সঙ্কটের মধ্য হইতে বাংলা গানকে রক্ষা করিলেন।

"পূর্ব্বকালে গানগুলি হয় দেবতার সম্মুখে, নয় রাজার সম্মুখে

গীত হইত সুতরাং স্বতই কবির আদর্শ সেখানে অত্যন্ত দুরূহ ছিল। তার ভাব, ছন্দ, রাগিণী সকলের মধ্যেই সৌন্দয্য এবং নৈপুণ্য ছিল। কিন্তু ইংরাজের নূতন সৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্ব্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি এবং সেই হঠাৎ-রাজার সভায় উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান। কর্ম্মক্লান্ত বণিক্ সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসিয়া দুই দণ্ড আমোদ উত্তেজনা চাহিত। তাহারা সাহিত্য অথবা শিল্পরস চাহিত না।" (র)

প্রায় এক শতাব্দী এই কবিগান, খেউড় এবং তর্জা ছিল বাঙ্গালার গীতির প্রধান অবলম্বন।

রাজা রামমোহনের সাধনায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর উদ্যোগে হিন্দী রাগসঙ্গীতের সুরের আনুরূপ্যে ব্রহ্মসঙ্গীত রচনার সূত্রপাত হইল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই ব্রহ্মসঙ্গীতের মধ্য দিয়াই সংস্কৃতিক্ষেত্রে সুপরিচিত হইলেন। গীত-রচয়িতা এবং সুর-রচয়িতার একত্র সমাবেশ রবীন্দ্রনাথের মত বাংলা গানে আরও কয়েকজন কবির মধ্যে পাওয়া যায়।

তাঁহাদের মধ্যে অতুলপ্রসাদই একমাত্র কবি, যিনি মাত্র কয়েকটি গান রচনা করিয়াই বাংলাসাহিত্যে গৌরবের আসন পাইয়াছেন। রবীন্দ্র সঙ্গীতের সঙ্গে অতুলপ্রসাদ সেনের বাণীর ও সুরের মিল আছে, সুরের আভিজাত্যে কোন কোন ক্ষেত্রে অতুলপ্রসাদের গান রবীন্দ্রনাথের গান অপেক্ষা অধিকতর কৌলীন্যের দাবী করিতে পারে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে অতুলপ্রসাদী গান ভারতীয় উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের ধারায় সুর ও তালে নিখুঁত, লোক-সঙ্গীতেরও প্রতিটি বৈচিত্র্যও তাঁহার গানে সুস্পষ্ট। সুর সংযোগ না করিয়াও রবীন্দ্রসঙ্গীত যেমন

সুপাঠ্য, অতুলপ্রসাদের গান তাহা নয়। কাব্যাংশে শ্রীহীন হইলেও সুরে এগুলি মহীয়ান।

দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা গানে প্রথম বিলাতী ভঙ্গীর প্রবর্ত্তন করেন। জাতীয় সঙ্গীতে দেশপ্রেমের বলিষ্ঠ উদ্দীপনাময় সুরের প্রবর্ত্তনায় তিনি রবীন্দ্রনাথের অগ্রগামী। সার্থক হাসির গান এবং তাহার উপযুক্ত চটুল সুরের সৃষ্টি হইয়াছে বাংলা গানে তাঁহার হাতেই। প্রেমের গানেও তাঁহার সুরচাতুর্য্য প্রশংসনীয়।

রজনীকান্ত সেন আজ বাংলা গানের আসরে বিস্মৃত প্রায়। কান্ত কবির গানের ভাগবতী অনুভূতির করুণ সুর আন্তরিকতায় অপূর্ব্ব। ভাগবতী-গীতি-রচয়িতা বলিয়া এক সময় অসামান্য প্রসিদ্ধি লাভ করায় দুঃখের বিষয় তাঁহার সুন্দর হাসির গানগুলি খ্যাতি পায় নাই। রজনী সেনের গান সুরের আভিজাত্যেও খুব উন্নত না হইলেও অবনত নয়।

কাজী নজরুল আমাদের বাংলা ভাষার শেষ গীতিকার কবি। তাঁহার উদ্দীপক ভাবের এবং গজল সুরের গানগুলি অপূর্ব্ব। নজরুলের পরে বাংলা গানে স্বৈরতন্ত্র এবং অরাজকতা সুরু হইয়াছে। সুরের এবং বাণীর সুসঙ্গতি যেন বাংলা গান হইতে বিদায় লইয়াছে।

বর্ত্তমান বাংলা গান অপূর্ব্ব মহিমামণ্ডিত হইয়াছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের হাতে; তাঁহারই কথা তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়া বলি—

"একদিন আমাদের বাংলা গান কেবল একতারা যন্ত্রের মত এক তারে বাধা ছিল, কেবল সহজ সুরে ধর্ম্ম সংকীর্ত্তন করিবার উপযোগী। 'রবীন্দ্রনাথ' স্বহস্তে তাসাতে এক একটি তার চড়াইয়া আজ তাহাকে বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। পূর্ব্বে যাহাতে স্থানীয় গ্রাম্য সুর বাজিত, আজ তাহা বিশ্ব সভায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুপদ অঙ্গের কলাবতী রাগিণী আলাপ করিবার লাস্য হইয়া উঠিয়াছে।"

বাংলার গীতিচর্চা

বাংলা ভাষাকে বলা হয় পৃথিবীর অন্যতম সুমিষ্ট ভাষা। গত শতাব্দীর ভারতীয় সঙ্গীতের প্রথম বিশ্লেষক বিদেশী পণ্ডিত A. H, Foxstrangeways বলিয়াছেন—"Telegu, is the most musical language of the south, as Bengali, of the north" বাংলা ভাষা তাই চিরকালই সহজে সঙ্গীতের যানে আরোহণ করে। বাংলার সাহিত্য সম্পূর্ণ এই সুরের উপর ভর করিয়া এতদিন চলিয়া আসিয়াছে।

বৌদ্ধ সহজিয়াগণের সাধন-সঙ্গীত 'চর্য্যাগান'কে ধরা হয় বাংলা ভাষায় প্রাচীনতম গান বলিয়া; প্রহেলিকাময়ী ভাষায় রচিত এই গানগুলির আবেদন ছিল সাধনপথের পথিকদের কাছে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই গানগুলির রাগ-রাগিণী অতি উচ্চাঙ্গেরই, গাহিবার রীতি মনে হয় অনেকটা বাউল অথবা কীর্ত্তনের প্রাথমিক অবস্থায় যে রকম স্বাভাবিক তেমনই ছিল।

চর্যাগানের আসর হইতেই হয় 'পাঁচালী'র সৃষ্টি। কীর্ত্তনের মতন পাঁচালী বাংলার নিজস্ব বিশিষ্ট গীতরীতি; আমাদের সমস্ত গানই এই পাঁচালীর ভঙ্গীতে আসরে গাওয়া হইত। এ রকম আসরী গানে মূলগায়েন গান করিতেন চামর হাতে, নূপুর পায়ে, দোহাররা সঙ্গে সঙ্গে সুর মিলাইত। চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, শিবায়ন, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যগুলি সমস্তই পাঁচালী গানের মধ্য দিয়া কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে।

তাহার পর আসিল বৈষ্ণব যুগ। দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী

বাংলার গীতিচর্চা সম্পূর্ণ কীর্ত্তনের আশ্রয়েই রহিয়াছে। আধুনিক পণ্ডিতেরা অনুমান করেন কীর্ত্তনের রীতি দক্ষিণ ভারত হইতে আসিয়াছে। কীর্ত্তনের বহু তাল কর্ণাটীয় গানে আজও ব্যবহৃত হয়। শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাঁহার সহচরগণ বহুদিন উড়িষ্যা এবং দক্ষিণাপথে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ঐ সকল তাল সম্ভবতঃ বাংলা গানে আনিয়াছিলেন। বাংলা কীর্ত্তনের অনেক সুর যেমন 'মালব, মুখারী' প্রভৃতি দক্ষিণী বা কর্ণাটীয় গান হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে।

রামপ্রসাদী গান উচ্চাঙ্গ সুরে রচিত, তবে সুরে বৈচিত্র্যহীন। বাউলের মতন প্রথম কলিটি আস্থায়ী, দ্বিতীয় কলি হইতে পরবর্ত্তী অংশ তাহার অন্তরা। এ গানে তান প্রভৃতির বিস্তার অনেকটা একঘেয়ে! রামপ্রসাদের পরবর্ত্তী শ্যামাসঙ্গীতকে 'মালসী' বলে ; সম্ভবতঃ মালবশ্রী বা মালশ্রী ছিল রামপ্রসাদের প্রধান সুর, তাহারই অপভ্রংশে 'মালসী' নাম হইয়াছে। 'মালসী' গানে বাংলার প্রধান দুইটি প্রচলিত গীতিরীতি টপ্পা এবং কীর্ত্তনের সংমিশ্রণ হয়।

ইংরাজ আমলে উত্তর ভারতীয় হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত আমাদের দেশে ধীরে ধীরে প্রবেশ লাভ করে। সিপাহি-বিদ্রোহের পূর্ব্বে লর্ড ডালহৌসী ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌর নবাব 'ওয়াজিদআলি শাহ'কে মেটিয়াবুরুজে নির্বাসিত করেন, তাঁহার পুরলক্ষ্মীর সঙ্গে হিন্দুস্থানী সুরলক্ষ্মী বাংলার ছায়াশীতল অঙ্গনে প্রবেশ লাভ করিল। তিনি নিজে ছিলেন সুররসিক, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার দরবারের গুণী গায়ন অনেকেই কলিকাতায় আশ্রয় পাইলেন। এইভাবে 'লক্ষ্ণৌর ঠুংরী গীতিরীতি' বাংলা গানে প্রবেশ করিল।

বাংলায় টপ্পাগীতিভঙ্গীর বিশেষ আদর হইয়াছিল। টপ্পাও মুসলমানী ঢঙ। পাঞ্জাবের ঝাঙ্গ জেলার একশ্রেণীর লোক-সঙ্গীতকে মার্জ্জিত করিয়া গোলাম নবী টপ্পা গানের ' করেন। অনেকের

মতে গোলাম নবীর গান ছিল টপখেয়াল অঙ্গের, তাঁহার পুত্র 'মিঞা জানী'ই খেয়াল হইতে টপ্পার সৃষ্টি করেন। গোলাম নবীর প্রণয়িনী 'শোরী'র নামেই টপ্পার নূতন নামকরণ। টপ্পা ক্রমে লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের জনপ্রিয় গানে পরিণত হয়। রামনিধি গুপ্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাজে যুক্তপ্রদেশে অনেকদিন বাস করিয়াছিলেন, দেশে আসিবার সময় তিনি টপ্পাকে লইয়া আসেন। ক্রমে শ্যামাসঙ্গীত, কবিসঙ্গীত, উমাসঙ্গীত প্রভৃতিও নিধুবাবুর প্রেমসঙ্গীতের ন্যায় টপ্পায় রচিত হইতে লাগিল।

পাথুরিয়াঘাটার রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ছিলেন সে যুগের সুপ্রসিদ্ধ স্বররসিক। বাংলা ভাষায় প্রথম সঙ্গীতগ্রন্থ রচিত হয় তাঁহারই উৎসাহে। হিন্দুসঙ্গীতের বিদেশে মর্য্যাদা প্রচার করিয়া আমেরিকা হইতেও তিনি 'ডক্টর অব মিউজিক' উপাধি পাইয়াছিলেন (১৮৭৫)। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বলিয়াছেন—"হিন্দু সঙ্গীতের উন্নতির জন্য আমরা শ্রীযুক্ত রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নিকট বিশেষ উপকৃত। ইংরাজরা আমাদের সঙ্গীত বুঝিতে পারেন না বলিয়া তাহার অনাদর করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা বুঝিতে পারেন তাঁহারা অত্যন্ত আদর করিয়া থাকেন। ক্যাপ্তেন উইলার্ড এবং লা মার্টিনিয়রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত আলডিস্ সাহেব ইহার দৃষ্টান্ত।" রেভারেণ্ড পোপ্‌লী এবং অগষ্টস্ উইলার্ড প্রভৃতি সাহেবরা ভারতীয় সঙ্গীতকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সঙ্গীতশাস্ত্র লইয়া আলোচনার পথ উন্মুক্ত করেন। শৌরীন্দ্র-মোহনের উৎসাহে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী 'সঙ্গীতসার' গ্রন্থ রচনা করিয়া Theoretical দিকে আলোচনার প্রথম সূত্রপাত করিলেন। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' সুর সংযোজন ক্ষেত্রমোহনের অন্যতম কৃতিত্ব। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উৎসাহে প্রথম ভারতীয় অর্কেষ্ট্রার প্রচলন হয়। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী এবং যদুনাথ পাল ছিলেন সেই অর্কেষ্ট্রার পরিচালক। যন্ত্র-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অবশ্য এখনও আমরা বিশেষ অগ্রসর হই নাই। এই বিষয়ে A. H. Foxstrangeways সাহেব ঠিকই বলিয়াছেন—

"India is now instrumentally at the same stage as mediaeval Europe with great variety of means of supporting the voice but absolutely no sense of orchestration."

এই শতাব্দীতে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে সঙ্গীতজগতের নবযুগের অপর একজন প্রবর্ত্তক; হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে শৃঙ্খলা আনয়ন তাঁহার বিরাট অবদান।

বাঁকুড়া জেলায় 'বিষ্ণুপুর' ছিল বাংলার গীতিচর্চার কেন্দ্র। বিষ্ণুপুরের মল্লবংশের রাজা রঘুনাথ সিংহ অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে সেনী ঘরোয়ানার 'বাহাদুরসেন'কে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ করিয়া আনেন। বাহাদুরসেনই বাংলাদেশে 'ধ্রুপদ' গানের প্রচলন করেন। 'খেয়ালের' প্রচলন হয় মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে মীরকাসিমের আগ্রহে, তবে বাংলাদেশে কাব্যের প্রাধান্যের জন্য কখনও খেয়ালভঙ্গীর বিশেষ আদর হয় নাই। আজও ধ্রুপদে বাঁকুড়া ও খেয়ালে মুর্শিদাবাদ বাংলার সুর-কেন্দ্র বলিয়া পরিচিত। মুর্শিদাবাদের কাদের বক্সের শিষ্য-গোষ্ঠী এবং বিষ্ণুপুরের ঘরোয়ানা সুপ্রসিদ্ধ। বাংলা ভাষায় ধ্রুপদখেয়াল রচনার রীতি ছিল না। বাঙ্গালী সুরগুরুরাও উচ্চাঙ্গের গান রচনা করিতেন হিন্দী ভাষাতে।

বাংলার সঙ্গীততরঙ্গের অন্যতম কর্ণধার কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত শতাব্দীতে আক্ষেপ করিয়াছেন—"খেয়াল ও ধ্রুপদীয়

সুরে ঈশ্বরবিষয়ক ব্যতীত অন্যান্য উত্তমবিষয়ক বাংলা গান নাই বলিলেও চলে ; এইজন্য এতদিনেও খেয়াল ধ্রুপদ বাঙ্গালীর জাতীয় সঙ্গীত হইতে পারে নাই। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত নিরক্ষর লোকের হাতে পড়াতে হিন্দিগীতের ভাবার্থ প্রায়ই লোপ পাইয়াছে।”

তাহার পর ব্রহ্মসঙ্গীতের যুগে এই শ্রেণীর হিন্দি গানগুলির সুর ভাঙ্গিয়া তাহার আনুরূপ্যে বাংলা গান রচনার সূত্রপাত হইল ; রাজা রামমোহন এবং দেবেন্দ্রনাথ এই ধারার প্রবর্তক। সেই সময়ে ঠাকুর-বাড়ীতে নিয়মিত সঙ্গীতের আসরে আসিতেন—রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজচন্দ্র রায়, যদু ভট্ট, বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী, রাধিকা গোস্বামী শ্যামসুন্দর মিশ্র প্রভৃতি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

“ইহাদের গান ভাঙ্গিয়া, তখন আমি এবং বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ অনেক ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলাম। কি সৌখিন, কি পেশাদার কোনও গায়কের কোন গান ভাল লাগিলেই, অমনি সেটি টুকিয়া লইয়া আমরা ব্রহ্ম-সঙ্গীত রচনা করিতে বসিতাম। এইরূপে ব্রহ্মসঙ্গীতে অনেক বড় বড় ওস্তাদী সুর ও তাল প্রবেশ লাভ করিয়াছে।”

সঙ্গীতচর্চার জন্য সংসদ প্রতিষ্ঠা এবং পত্রিকাপ্রকাশেরও চেষ্টা হইয়াছিল। রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ‘বঙ্গ সঙ্গীত বিদ্যালয়’ (১৮৭১) এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ‘ভারতসঙ্গীত-সমাজে’র প্রতিষ্ঠা করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ডোয়ার্কিন কোম্পানীর ব্যয়ে ‘বীণাবাদিনী’ এবং পরে ‘সঙ্গীত-প্রকাশিকা’ নামক পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

নূতন ধারায় স্বরলিপি প্রবর্ত্তনা করিয়াছিলেন কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। জ্যোতিরিন্দ্রের আকারমাত্রিক স্বরলিপি জন সমাদৃত এবং সুপ্রচারিত হইয়াছে।

ঢাকার নবাব দরবার প্রভৃতিতে সঙ্গীতচর্চার জন্য মুসলমান

গায়কগণ আশ্রয় পাইতেন। ক্রমেই ইসলাম ধর্মের প্রসারের সঙ্গে ইসলামী গজল, কাওয়াল, রেক্তাই, নাত, খাম্‌সা প্রভৃতিরও কিছু কিছু বাংলাতে প্রচলন হইল।

বিলাতী গানের রস এখনও বাঙ্গালী গ্রহণ করিতে পারে নাই। তবে বিলাতী গানের চর্চা বহুদিন হইতে অল্প-সল্প চলিতেছে। ঠাকুরবাড়ী প্রভৃতি অভিজাত ইঙ্গবঙ্গ সমাজে ইংরাজী সুর মহিলাদেরও কেহ কেহ শিখিতেছিলেন। তাঁহাদের আত্মীয় প্রমথ চৌধুরী বলিয়াছেন—"শ্রীমতী প্রতিভা দেবী ছিলেন একরকম হাফ ওস্তাদ এবং নিত্য গান অভ্যাস করতেন। তিনি পিয়ানোর সঙ্গে গান গাওয়া অভ্যাস করেছিলেন, তাই তাঁর গাইবার ঢঙ ছিল একটু কাটাকাটা। তিনি পিয়ানোয় বাজাতেন ওস্তাদি বিলিতী বাজনা।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল হইতে কাজী নজরুল, তাঁহারও পরবর্তী হিমাংশু দত্ত পর্যন্ত সবাই ইংরাজী সুরের নিকট কিছু না কিছু ঋণী। হিমাংশু দত্ত দিলীপকুমারকেও প্রভাবান্বিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বিলিতি ভঙ্গীর বহু গানের সুর হিমাংশু দত্তের প্রদত্ত।

পাথুরিয়াঘাটার শৌরীন্দ্রমোহনের গৃহে বিলাতী গানেরও বেশ চর্চা হইত। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন—"তাঁর বড় ছেলে প্রমোদকুমারও পাকা ইউরোপীয়ান মিউজিশিয়ান। গুরুদাস শৌরীন্দ্রমোহনের দৌহিত্র—সেও চমৎকার পিয়ানো বাজাতে পারতো প্রমোদকুমার, গুরুদাস বৈজ্ঞানিক ভাবে দেশী সুরে বিলিতি সুরে হারমোনাইজ কর্‌বার চেষ্টা করলেন।"

ইউরোপীয় যন্ত্রসঙ্গীত অবশ্য ধীরে ধীরে আমাদের গানের সঙ্গতের স্থান সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতেছে; একমাত্র তব্‌লা ব্যতীত প্রায় কোন দেশী বাজনা আজ আর আমাদের আসরে নাই।

এ শতাব্দীতে সুরচর্চায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন

খেয়ালে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, লালচাঁদ বড়াল এবং ধ্রুপদে অঘোরনাথ চক্রবর্ত্তী এবং জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী।

বাংলার গীতিচর্চায় শেষ বিশিষ্ট অবদান দিলীপকুমারের। কীর্তনের ন্যায় আঁখর সংযোজন এবং উচ্চাঙ্গ রাগসঙ্গীতের ন্যায় স্বর-বিস্তার, সুরবিহার দীর্ঘ তান প্রভৃতির ব্যবহার তাঁহার গানের বৈশিষ্ট্য। দীর্ঘগানে বৈচিত্র্য আনিবার জন্য তিনি একই গানে তাল ফেরতা, সুরপরিবর্তন প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছেন।

বর্তমানে আমাদের সঙ্গীতের প্রগতি বিপর্যস্ত! সঙ্গীত শিখিবার জন্য যে-সাধনার প্রয়োজন ছিল, আজ আর তাহার অবকাশ নাই। রবীন্দ্রনাথের বিরাট সুর অবদানও আজ অনাদরে অবহেলায় ম্লান হইয়া পড়িতেছে। সমজদার শ্রোতার অভাবে শুধু তাঁহার গান নয়, দেশের সকল গানের চর্চাই অনেকটা অবজ্ঞাত হইয়া রহিয়াছে।

কবি তাই দুঃখ করিয়াছেন—

"পঞ্চাশ বছর আগে একদিন ছিল যখন বড় বড় গাইয়ে বাজিয়ে দূরদেশ থেকে কোলকাতা সহরে আস্ত। ধনীদের ঘরে মজলিস্ বস্ত, ঠিক্ সমে মাথা নাড়তে পারে এমন মাথা গুনতিতে নেহাত কম ছিল না। এখন আমাদের সহরে বক্তৃতা সভার অভাব নেই, কিন্তু গানের মজলিস্ বন্ধ হয়ে গেছে। সমস্ত তাল মান লয় সমেত বৈঠকী গান পুরোপুরী বরদাস্ত করতে পারে এত বড় মজবুত লোক এখনকার যুবকদের মধ্যে প্রায় দেখাই যায় না।"

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ

রবীন্দ্রনাথ যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সঙ্গীতের বিশেষতঃ ভারতীয় সঙ্গীতের অনুশীলনের মর্য্যাদা সেখানে পূর্ণমাত্রায় ছিল। সঙ্গীতসাধনার বনিয়াদ রবীন্দ্রনাথ তাই শক্তভাবে গাঁথিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। অন্তর হইতেই কবি কেবল গানরচনার প্রেরণা পাইতেন তাহা নয়, ভক্তজনের ফরমাইশ ছিল, নানা প্রতিষ্ঠান হইতে অবিরত তাগিদ ছিল। সুররচনার নেশায় তিনি ছিলেন তন্ময়। আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রার্থনা-সঙ্গীতের জন্য রবীন্দ্রনাথকে নব নব সুরসৃষ্টির প্রেরণা দিয়াছিল। পরবর্ত্তী জীবনে শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য নব নব উদ্দীপনায় নব নব সুরের জন্ম হইয়াছিল।

ভারতীয় সঙ্গীত তাহার কঠিন নিয়মতান্ত্রিক বন্ধনে কেবল বিশিষ্ট রসিক-সমাজের আয়ত্তে নিজস্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। রস-সুরধুনীর ভগীরথ রবীন্দ্রনাথ সেই সুরধারাকে বাংলার হৃদয়ক্ষেত্রে প্রবাহিত করিয়াছেন। গুণী সঙ্গীতবিদ্ রূপে নয়, কবি রূপেই তিনি সুররচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। সুর তাঁহার গানে অসম্পূর্ণ, কথা ও সুরের নিবিড় মিলনেই তাঁহার গানের জন্ম। "সঙ্গীতের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভাবপ্রকাশ। ভাবের সঙ্গে সুরের মিশ্রণই ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য। গান শুধু সুর নয়, সুরের সঙ্গে কথার মিলনেই তার পূর্ণতা, এর বিচ্ছেদে নয়।" (র)

সুর-সংস্কৃতিচর্চ্চায় রবীন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যোগ ছিল অত্যন্ত গভীর, জ্যোতিবাবুর নাটকে গান লিখিতেন রবীন্দ্রনাথ। ১৮৬৮ খৃঃ এপ্রিলে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেলগাছিয়ায় হিন্দুমেলায় যে গানটি রচনা করিয়াছিলেন—"গাও ভারতের জয়" সে গানেই

রবীন্দ্রনাথের প্রথম সার্থক সুর-সৃষ্টি। গানটি জ্যোতিরিন্দ্রের পুরুবিক্রম (১২৮৬) নাটকের অঙ্গীভূত হয়। সুর খাম্বাজ-আড়াঠেকা। কবিই নিজে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গানটি গাহিয়া শুনাইয়াছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাক্ষ্য অনুসারে কবির রচিত প্রথম গান,—"জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা" (১২৮৬)

ভারতী পত্রিকা প্রকাশের পর ঠাকুরবাড়ীতে রীতিমত গানের ঘরোয়া মজলিস বসিত; সে মজলিসে সদস্য ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সরলা দেবী, স্বর্ণকুমারী এবং অক্ষয় চৌধুরী। ভারতীতে কাব্য-প্রতিভার সঙ্গে কবির সুর-প্রতিভারও উন্মেষ হইতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ১২৮৫ সালে রুদ্রচণ্ড নামে একটি নাটক রচনা করেন, সম্পূর্ণ তাঁহারই সৃষ্ট দুইটি গান এই নাটকে ছিল—মিশ্র গৌড়সারঙে রচিত "তরুতলে ছিন্নবৃন্ত মালতীর ফুল" এবং "বসন্ত প্রভাতে এক মালতীর ফুল।'

১২৮৪ সালে ভানুসিংহঠাকুরের পদাবলীর সাতটি গান ভারতীতে প্রকাশিত হয়।

কৈশোরক পর্য্যায়ে অন্যান্য গানগুলি প্রায় সবই ১২৯২ সালের পূর্ব্বে বিভিন্ন নাটকের জন্য রচিত হইয়াছিল। রবীন্দ্র-সুরের বৈশিষ্ট্য তখন পর্য্যন্ত বিশেষ লক্ষণীয় হয় নাই। এই সময়ে ১২৮৭ খৃষ্টাব্দে 'ভগ্নহৃদয়' নাটকের জন্য রচিত, বেহাগ-খাম্বাজে গাওয়া 'সখি ভাবনা কাহারে বলে' গানটি তাঁহার প্রথম সার্থক মিশ্রসুর রচনা।

তাহার পর ঠাকুরবাড়ীতে গীতিনাট্যের অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথের সুর মর্য্যাদার আসন পাইল। জ্যোতি ঠাকুরের প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ বিদেশী সুরের অনুকরণে নব নব সুরের সৃজনে আগ্রহান্বিত হইলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বিলাতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বিদেশী বীণার সুরকে কণ্ঠে ধরিয়া আনিলেন। এই সময়েরই রচনা 'বাল্মীকি-প্রতিভা' রবীন্দ্র-সঙ্গীতের দ্বিতীয় যুগের সূচনা করিল (১২৯২)। বাল্মীকি-প্রতিভা

আইরিশ মেলডিজের সুর ও গ্রীক্ নাট্যের অভিনয়ের অনুকরণে ভারতীয় আদর্শে রচিত গীতি নাট্য। সঙ্গীতের এক বিরাট অংশ রূপ লাভ করিয়াছে ইহার অভিনয়ে। "বস্তুতঃ বাল্মীকি-প্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, উহা সঙ্গীতের একটি নূতন পরীক্ষা, অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে উহার স্বাদগ্রহণ সম্ভব নহে।" (র) সুরাভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের প্রাচীন কথকতার এবং যাত্রাগানেরও অনুসরণ করিয়াছেন।

কালমৃগয়া গীতিনাট্য পরবর্ত্তী সময়ে বাল্মীকি-প্রতিভার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। বাল্মীকিপ্রতিভা এবং মায়ার খেলার মধ্যবর্ত্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথের যে সকল কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল. তাহাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই তাঁহার সেই সময়ে রচিত গানগুলি স্থান পাইয়াছে ; এই গানগুলির সুর কৈশোরকের অন্যান্য সুরেরই পুনরাবৃত্তিমাত্র। ছবি ও গানের (১২৯০) ২টি, প্রকৃতির প্রতিশোধে (১২৯১) ৬টি. কড়ি ও কোমলে (১২৯৩) ৯টি গান আছে। এই গানগুলির মধ্যে সুর-মর্য্যাদায় "যোগী হে, কে তুমি হৃদি-আসনে", "ওগো শোনো কে বাজায়", এবং "আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে", উল্লেখযোগ্য। রবিচ্ছায়া (১২৯২) কবির সর্বপ্রথম গীতি-চয়নিকা। মায়ার খেলায় (১২৯৫) রবীন্দ্র-গীতিনাট্যের চরম উৎকর্ষ হইল। "বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা" (র)। ১২৯৮-৯৯ সালে মায়ার খেলার স্বরলিপি 'সাধনা'য় প্রকাশিত হয়।

উত্তর ভারতের শোরী মিঞার টপ্পা এবং প্রাচীন বাংলার নিধুবাবুর গানের অনুকরণে 'মায়ার খেলার' সুর ; বিদেশী সুরের প্রভাব মায়ার খেলায় সযত্নে পরিহার করা হইয়াছে। এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্ গানে রবীন্দ্রনাথ দেশ রাগিণীতে সুর সংযোজন করিয়াছিলেন। মায়ার খেলার পরবর্ত্তী নাটক রাজা ও রাণীতে ৮টি (১২৯৬) এবং বিসর্জ্জনে

৫টি (১২৯৭) গান আছে ; প্রায় সকল গানই একই ধারায় রচিত। বিসর্জ্জন নাটকের "আমারে কে নিবি ভাই" রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব বাউলজাতীয় গানের সূচনা করিল। মানসীতে (১২৯৭) প্রকাশিত "এমন দিনে তারে বলা যায়।" (মিশ্র মল্লার ; রূপক) কবিতাতে সুর সংযোজনা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আরও একটি ধারার আদি নিদর্শন।

সোনার তরীতে (১৩০১) ৩টি, চিত্রায় (১৩০২) ৯টি এবং চৈতালী-তে (১৩০৩) ১টি স্বতন্ত্র গান আছে। "বাজিল কাহার বীণা", "কে দিল আবার আঘাত", "পুষ্পবনে পুষ্প নাই", প্রভৃতি চিত্রার গানগুলি ধীরগতির ধ্রুপদজাতীয় স্বরবিন্যাসের অপূর্ব্ব উদাহরণ।

মায়ার খেলার পরবর্ত্তী গীতিসঞ্চয়ন প্রকাশিত হয় ১৩০৩ সালে 'কাব্যগ্রন্থাবলী'তে—গান ও ব্রহ্মসঙ্গীত পর্য্যায়ে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত তখন আপন শ্রেষ্ঠত্বের সীমায় আসিয়াছে ; বিভিন্ন-জাতীয় নব নব সুরে মণ্ডিত সঙ্গীতের জন্ম হইতেছিল কবির কণ্ঠে ও লেখনীতে। ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের কঠোর বাধাবন্ধনের জাল ছিন্ন করিয়া তিনি সুরকে কথার অনুচর করিয়া দিয়াছিলেন ; কথারই ছিল প্রাধান্য, সুর হইয়াছিল বাণীর আভরণমাত্র। ব্রহ্মসঙ্গীত নামে ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য রচিত রবীন্দ্রনাথের ভজনগানগুলির এই প্রথম সংকলন। ভগবদ্ভক্তির গভীরতা হয়ত এইগুলিতে নাই, কিন্তু শান্তরসের মাধুর্য্য ইহার সুরের ছত্রে ছত্রে।

পরবর্ত্তী গীতিরচনা নৈবেদ্য ও কল্পনা কাব্যগ্রন্থে। এই সময়ের সুরের সহজ ও সরল একটি মূর্চ্ছনার লক্ষণ সুস্পষ্ট। কল্পনায় (১৩০৭) ১৬টি এবং নৈবেদ্যের (১৩০৮) ১৭টি গান আছে। গীতাঞ্জলির পূর্ব্বসূচনা হয় নৈবেদ্যের সঙ্গীতে। ১৩১০ সালের কাব্যগ্রন্থের 'গান' অংশে রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বের বৈঠকী গানের

ভাঙ্গা সুরের প্রভাব আবার পাওয়া যায়; একাদশী তালের গান (১১ মাত্রা) "দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া" নব তালের (৯ মাত্রা) 'নিবিড় ঘন আঁধারে' প্রভৃতিতে বহু নূতন নূতন ছন্দ লইয়া রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতেছিলেন। চিরকুমারসভা নাটকে (১৩১১) ৫টি, খেয়া কাব্যে (১৩১৩) ৮টি, প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে (১৩১৪) ১টি নূতন গান আছে।

শারদোৎসবে (১৩১৫) শরতের আগমনী, নিসর্গ-মাধুর্য্যে অপূর্ব্ব উচ্ছল সুরের ধারায় ৯টি গান, শরতের নীল আকাশে সাদা মেঘ আর শিউলি ফুলের উৎসবে আমাদের মনের ভাবচ্ছবি প্রকাশ করিয়াছে।

ষড়্ঋতুর ডোরে প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গীতের পরিণয় হইল। রবীন্দ্র-সঙ্গীত এইবার বিশ্বপ্রকৃতির নবনবায়মান রূপের ও রঙের সঙ্গে সুর মিলাইতে লাগিল।

তাহার পর রাজনৈতিক নব চেতনার অভ্যুদয়ে রবীন্দ্রনাথ দৃপ্ত সুরের গান বাঁধিলেন। 'ভাণ্ডার' নামক মাসিকে স্বদেশী গানগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল; ১৩১৭ সালে 'বাউল' নামে অগ্নিবীণার ঝঙ্কারের গানগুলি সঙ্কলিত হয়। বাউলের সহজ সুরে গাঁথা গানগুলি উদাত্ত গাম্ভীর্য্যের আভাস দেয় না, কিন্তু সতেজ দেশপ্রেম ও আত্মসচেতনতার প্রভাব সঞ্চার করে। সে গানগুলি এই—এবার তোর মরা গাঙে, যদি তোর ডাক শুনে, আজ বাংলাদেশের হৃদয়, মা কি তুই পরের দ্বারে, ছি ছি চোখের জলে, যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, যে তোরে পাগল বলে, ওরে তোরা নাইবা কথা, যদি তোর ভাবনা থাকে, আপনি অবশ হলি, জোনাকি কি সুখে, বাংলার মাটি বাংলার জল, ওদের বাঁধন যতই শক্ত, বিধির বাঁধন কাটবে।

বাংলাদেশের গ্রামের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রাণের যোগ ছিল, গ্রামের বলিষ্ঠ সহজ কণ্ঠের গান তাঁহাকে মোহিত করিয়াছিল; বীরভূম

এবং বর্দ্ধমানের বাউলবৈরাগীদের গান অভিজাত রবীন্দ্র-সুরে মর্য্যাদা পাইয়াছে; ভারতীয় সঙ্গীতদরবারে রবীন্দ্রনাথের যথার্থ সার্থক সৃষ্টির পরিচয় দিয়াছে তাঁহার এই বাউল গান।

'গান' (১৩১৫) গ্রন্থের অধিকাংশ গানই সহজ সুরের—বহু গানেই দেশভক্তির উদ্দীপনা প্রবল। সাধারণ লোকের জন্য সাধারণ সুরই ত সঙ্গত, এগুলির তাহাই বৈশিষ্ট্য। প্রায়শ্চিত্ত (১৩১৬) নাটকে একটি নূতন গান আছে।

ইহার পর গীতাঞ্জলির (১৩১৭) যুগ। গীতাঞ্জলির গানগুলিতে কবিত্বরসের প্লাবনে সুরের অভাব ঢাকিয়া গিয়াছে। বহু গানই আবৃত্তিতে পর্য্যবসিত। গীতিমাল্য (১৩২১) এবং গীতালি (১৩২১) গীতাঞ্জলিরই ধারা রক্ষা করিয়াছে।

রাজা (১৩১৭) ও অচলায়তন (১৩১৮) রূপকনাট্য দুইটির গানগুলির বৈচিত্র্য এই যে—গানের সুরের সঙ্গে নাটকের আঙ্গিকের যোগ আছে। রাজার গানগুলি বসন্ত ঋতুর গান। উৎসর্গ (১৩২১) কাব্য-গ্রন্থের "আমি চঞ্চল হে" গানের পক্ষে আয়াসসাধ্য; অত বড় গানের শেষ পর্য্যন্ত Tempo রাখা কষ্টকর ! গান বইখানিতে নূতন গান (১৩২০) ৫টি, বলাকা কাব্যে (১৩২২) ২টি, গীতলিপিতে নূতন গান (২য়, ১৩১৭—১টি; ৪র্থ, ১৩১৭—১টি; ৫ম—৪টি) এবং গীতলেখায় (১ম, ১৩২৪)-১টি নূতন গান আছে। গীতপঞ্চাশিকার (১৩২৫) ৫০টি গানের প্রায় প্রতিটিই অধুনা সুপরিচিত। কাঁপিছে দেহলতা থর থর (১১ মাত্রা), যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে (৯ মাত্রা), ব্যাকুল বকুলের ফুলে (৯ মাত্রা) প্রভৃতি নব ছন্দে রচিত অনেক গান এখানে আবার পাওয়া গেল। বৈতালিকের (১৩২৫) ৩টি গান রবীন্দ্ররাগসঙ্গীতের চরম নিদর্শন। গীতবীথিকা (১৩২৬), কাব্যগীতি (১৩২৬) গীত-পঞ্চাশিকার অনুসরণ। অরূপরতন (১৩২৬), ঋণশোধ (১৩২৮) ও

মুক্তধারা (১৩২৯) তিনটি রূপকনাট্যে কয়েকটি নাট্যোপযোগী গান আছে। অরূপরতন রাজার এবং ঋণশোধ শারদোৎসবের রূপান্তর।

আরও কয়েকটি ভজনগান লইয়া ধর্ম্মসঙ্গীত (১৩২০); অনেক-গুলি সুরের আভিজাত্যে হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সগোত্র। বেদের একটি সূক্তের অনুবাদ "যদি ঝড়ের মেঘের মতো" এবং জাতীয় সঙ্গীত "জনগণমন" (মিশ্র, ঠুংরি) গান দুইটি ইহাতে আছে।

এই সময় হইতে শান্তিনিকেতনে বর্ষার আবাহনের জন্য বর্ষাগীতের উৎসব হইত; বর্ষার উপযোগী রাগ-রাগিণীতে গাঁথা গানগুলি প্রকৃতির ধারাযন্ত্রের সঙ্গে সুর মিলাইত। প্রথম বর্ষামঙ্গলের (১৩২৯) পর হইতে প্রতিবারই গানগুলি নূতন করিয়া সাজানো হয়, বহু গানে কথায় ও সুরের পরিবর্ত্তন হইত অল্প। নবগীতিকায় (১ম ও ২য়, ১৩২৯) সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গানগুলির সমাবেশ, সুরের বিশেষ বৈচিত্র্য নাই।

ঋতুনাট্য ফাল্গুনী (১৩২২), বসন্ত (১৩৩০), বাসন্তী গানের সঞ্চয়ন; এগুলিতে অভিনয়-ভঙ্গিমা এবং বিদেশী সুরের প্রভাব লক্ষণীয়।

পরবর্ত্তী গীতিসঞ্চয়ন 'প্রবাহিণী' (১৩৩২) সম্পূর্ণ গানের বই, ৭৭টি গান আছে; অধিকাংশ গানই একাধিক সুরের সংমিশ্রণে রচিত। গৃহপ্রবেশ (১৩৩২), শোধবোধ (১৩৩২), চিরকুমার সভার (১৩৩২)-অধিকাংশ গান প্রবাহিণীর ধারার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সুন্দর (১৩৩২)-বসন্তের আগমনী সূচিত করিয়াছে; এই সকল গান সুরবৈচিত্র্য অপেক্ষা ভাবসম্পদে অধিকতর সমৃদ্ধ।

শেষবর্ষণ (১৩৩২) বর্ষামঙ্গলের Counterpart; রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ বর্ষাভিসারের কবি, কিন্তু বর্ষাবিদায়ের বিধুর দীর্ঘশ্বাস এই গীতগুলির ছত্রে ছত্রে। শেষাংশে শরতের আবাহনীগানগুলি নাটকীয় ভাবের সহায়তার সঙ্গে সঙ্গীতের আবেশ-বিহ্বলতার সৃষ্টি করিতেছে।

বৌদ্ধ যুগের একটি কাহিনী অবলম্বনে রচিত নটীর পূজা নামক নৃত্য-সমন্বিত (১৩৩৩) নাটকে ৮টি গান আছে। নটীর গান "আমায় ক্ষমো হে ক্ষমা" Dance-technique অনুসারে রচিত।

রক্তকরবী (১৩৩৩) রূপকনাট্যে ৬টি গান আছে ; এই নাটকের "পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে" Artistic technique-এর অপূর্ব্ব চিত্র। গীতমালিকা (১ম, ১৩৩৩), গীতমালিকা (২য়, ১৩৩৬) স্বরলিপির বই। গীতোৎসবে (১৩৩৮) দক্ষিণী সুরে গাঁথা "নীলাঞ্জন ছায়া, প্রফুল্ল কদম্ব বন" রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিশিষ্ট নিদর্শন। ঋতুরঙ্গ (১৩৩৪) ছয় ঋতুর সৌন্দর্য্যের বন্দনা। প্রকৃতির সঙ্গে মানব-মানসের মধুর মিলনে বিশ্বের আনন্দ-উৎসব পূর্ণতা লাভ করে—ঋতুরঙ্গের ইহাই মূল কথা। প্রতি ঋতুর উপযোগী বাণী ও সুরে গ্রথিত কবি-চিত্তের বন্দনা (নান্দীগান) এই গীতিনাট্যের ভূমিকা।

ইহার পর তিনখানি নাটক—শেষরক্ষা (১৩৩৫) ৯টি, পরিত্রাণ (১৩৩৬) ৮টি এবং তপতী (১৩৩৬) ১১টি গানের সংকলন; 'বসন্ত' ও 'সুন্দরের' মতন 'নবীন' ও (১৩৩৭) গানের পালা, বসন্তের আমন্ত্রণে রচিত গানগুলি নাট্যাকারে গ্রথিত, বিষয়বস্তু সামঞ্জস্যহীন।

শারদোৎসব হইতে 'নবীন' পর্য্যন্ত এই দীর্ঘসময়ে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুরের রূপ প্রায় অপরিবর্ত্তিত, অনেক সময়ে সুরে বৈচিত্র্যহীন পুনরাবৃত্তি আসিয়া পড়িয়াছে। কৌতুকনাট্য—তাসের দেশে (১৩৪০) ২০টি গান আছে ; সুরের বৈচিত্র্যে বহু গান সম্পূর্ণ নূতন ভঙ্গীর, কয়েকটি গান বীরভাবদ্যোতক সুরে অপূর্ব্ব।

কবি পরে মহুয়ার (১৩৩৬) ৭টি কবিতায় এবং ক্ষণিকার ৫টি কবিতায় সুর-সংযোজনা করিয়াছিলেন। গানের দীর্ঘতার জন্য প্রায় পংক্তিতে সুরের পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

বাঁশরী নাট্যে (১৩৪০) ওজোময় এবং বীথিকা (১৩৪২) কাব্যে কারুণ্যময় গান আছে ৫টি করিয়া।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের শেষ অবদান চারিখানি নৃত্যনাট্য—শাপমোচন, চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা এবং চণ্ডালিকা। যবদ্বীপের প্রাচীন নৃত্যনাট্য অনুসরণে এইগুলি রচিত হয়, গান এবং অভিনয়ের অপূর্ণতা নৃত্যকলার অপরূপ ভঙ্গীতে সম্পূর্ণাঙ্গ।

সর্ব্বশেষ দুইশতাধিক গান বিভিন্ন পত্রিকায় স্বরলিপিসমেত প্রকাশিত হইয়াছিল। "যে ছিল আমার স্বপনচারিণী" গানটি রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয় ছিল। "হে নূতন" এবং "সমুখে শান্তিপারাবার" তাঁহার শেষ রচনা।

তাঁহার দুইখানি গানে অপরে সুর-সংযোজনা করিয়াছেন। পঙ্কজ কুমার মল্লিক "দিনের শেষে ঘুমের দেশে" গানটিতে এবং দিলীপকুমার রায় "তোমার বীণা আমার মনোমাঝে" (মিশ্র বেহাগ তিলোক কামোদ, ঝাঁপতাল) এই গানটিতে সুর যোজনার অধিকার পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার গানে কোন অর্ব্বাচীনের অক্ষম সুর-সংযোজনা ক্ষমার অনুপযুক্ত।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশ

সঙ্গীতসৃষ্টির উপযোগী পরিবেশের প্রয়োজন আছে। সঙ্গীতের অনুকূল আবহাওয়া না থাকিলে, দরদী শ্রোতার অভাব হইলে সার্থক সঙ্গীতসৃষ্টি হইতে পারে না। শ্রোতার এবং গায়কের প্রাণ যখন একই সূত্রে বাঁধা পড়িবে তখনই হইবে প্রকৃত সুরের জন্ম :—

"একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে দুইজনে ;
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেক জন গাবে মনে।"

রবীন্দ্রনাথের সৌভাগ্য, তিনি চিরকাল এই সঙ্গীতের সম্পূর্ণ অনুকূল পরিবেশ লাভ করিয়াছিলেন। ছেলেবেলায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে এইরূপ একটি পরিবেষ্টনীতে তিনি লালিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন একজন উৎসাহী সঙ্গীতরসিক।

ব্রাহ্মসমাজের আদিযুগে প্রার্থনা-সঙ্গীতের জন্য প্রতিদিনই নব নব গানের প্রয়োজন হইত। রাজা রামমোহন স্বয়ং "শেষের দিন মন কর রে স্মরণ," "অনিত্য বিষয় কর সর্ব্বদা চিন্তন" প্রভৃতি ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও "কারণ সে যে তাঁর ধ্যান কর" (পরজ) প্রভৃতি গান রচনা করিয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গীতপ্রীতি তাঁহার পরিবারে সঙ্গীতের আবহাওয়া গঠনে উৎসাহিত করিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ভালই বুঝিতেন ও জানিতেন। রবীন্দ্রনাথ উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার এই সঙ্গীতানুরাগ লাভ করিয়াছিলেন। কবি তাঁহার নিকট হইতে সঙ্গীতের আরও একটি বিষয়ে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। মহর্ষি গানের বিশুদ্ধ

সুর সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিতেন, কোন বেসুরই তাঁহার কর্ণ সহ্য করিতে পারিত না।

কবির ভ্রাতারা সবাই উৎসাহী সঙ্গীতরসিক ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আবার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন কবির গীতরচনার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। কবির ভাইপো-ভাইঝি,—ভাগ্‌নে-ভাগনীরাও নানাভাবে তাঁহার সাঙ্গীতিক পরিবেশ গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'তে উল্লেখ করিয়াছেন—"দুই পার্শ্বে অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ কাগজ পেন্সিল লইয়া বসিতেন। আমি যেমনই একটি সুর রচনা করিলাম, অমনি ইঁহারা সুরের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ কথা বসাইয়া গান রচনা করিতে লাগিয়া যাইতেন। একটি সুর তৈরি হইবামাত্র সেটি আরো কয়েকবার বাজাইয়া ইঁহাদিগকে শুনাইতাম। অক্ষয়ের যত শীঘ্র হইত, রবির রচনা তত শীঘ্র হইত না।"

এই উক্তি হইতে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ-রচিত প্রথম জীবনের গানগুলির সুর তাঁহারই দেওয়া। এই সময়ের গান দুই ভ্রাতার মিলিত প্রচেষ্টায় রচিত হয়। এবিষয়ে প্রত্যক্ষসাক্ষিণী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর উক্তি উল্লেখযোগ্য—"আমাদের বাল্যস্মৃতির গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দুই ভাইকে সঙ্গীতক্ষেত্রে আলাদা ক'রে দেখা শক্ত ছিল। হয় ইনি গান বাঁধছেন, উনি তাতে সুর দিচ্ছেন, নয় উনি ঝম্‌ঝম্‌ ক'রে পিয়ানোর গৎ তৈরী করছেন, ইনি তাতে কথা বসাচ্ছেন।"

'জ্যোতি-রবি'র সঙ্গে আরও একটি নামের উল্লেখ করিতে হয়, তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বন্ধু অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতে তাঁহার প্রভাব অল্প নয়। অক্ষয়চন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-জীবনের প্রথম দরদী শ্রোতা, কবির গানের বনিয়াদ গাঁথিবার কার্যে তাঁহার অংশ কম ছিল না। তাঁহার প্রথম সঙ্গীত-জীবনের

সতীর্থরূপে অক্ষয়চন্দ্র অক্ষয় হইয়া থাকিবেন। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতিনাট্যের সুর-সংযোজনে অক্ষয়চন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতা করিয়াছিলেন। গীতিনাট্যের "রাঙা পদ-পদ্মযুগে প্রণমি" গানটির কথা ও সুর তাঁহারই।

কবির পিতৃবন্ধু গীতরসিক শ্রীকণ্ঠ সিংহের গানের উৎসাহ রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়াছেন—"তিনি তো গান শেখাতেন না, গান তিনি দিতেন, কখন তুলে নিতুম জানতে পারতুম না। ফূর্তি যখন রাখতে পারতেন না, দাঁড়িয়ে উঠতেন, নেচেনেচে বাজাতে থাকতেন সেতার, হাসিতে বড়ো বড়ো চোখ জল্‌জ্বল্ করত, গান ধরতেন—'ময় ছোড়োঁ ব্রজকী বাসরী'; সঙ্গে সঙ্গে আমিও না গাইলে ছাড়তেন না।"

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ভিত্তিতে ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা দেবী এবং অভিজ্ঞা দেবীর প্রভাব কম নয়। তাঁহাদের বিলাতী সঙ্গীত শিক্ষাদানের জন্য গৃহে অভিজ্ঞ শিক্ষক আসিতেন। কবি অনেক সময় আবার তাঁহাদের কণ্ঠের সহিত সুর মিলাইতেন। সঙ্গীতে প্রতিভা দেবীর বিশেষ উৎসাহ ছিল। কবির 'কাল মৃগয়া'র স্বরলিপি তিনিই সম্পাদনা করিয়াছিলেন।

আদিব্রাহ্মসমাজের সুপ্রসিদ্ধ গায়ক বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন কবির গৃহের সঙ্গীত-শিক্ষক। তাঁহার নিকটেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম ভারতীয় সঙ্গীতে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। "বিষ্ণু ছিলেন ধ্রুপদী গানে বিখ্যাত গায়ক। প্রত্যহ শুনেছি সকাল-সন্ধ্যায় উৎসবে-আমোদে উপাসনা-মন্দিরে তাঁর গান।" (র) বিষ্ণুচন্দ্র একজন শ্রেষ্ঠ গুণী ছিলেন, তাঁহার ধ্রুপদ-খেয়ালের সুন্দর প্রকাশ-বৈচিত্র্যই রবীন্দ্রনাথকে প্রথম জীবন হইতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একনিষ্ঠ অনুরাগী করিয়াছিল।

বিষ্ণুচন্দ্রের পর মহর্ষি ত্রিপুরারাজার সভাগায়ক বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত যদু ভট্টকে বাড়ীতে স্থান দিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে

রবীন্দ্রনাথের অভিমত—"তারপরে যখন আমার কিছু বয়স হয়েছে তখন বাড়ীতে খুব বড়ো ওস্তাদ এসে বসলেন—যদু ভট্ট। একটা মস্ত ভুল করলেন, জেদ ধরলেন আমাকে গান শেখাবেনই, সেই জন্যে গান শেখাই হোলো না। কিছু কিছু সংগ্রহ করেছিলুম লুকিয়ে-চুরিয়ে,—ভালো লাগ্‌ল কাফি সুরে 'রুমঝুম বরখে আজু বাদরওয়া', রয়ে গেল আজ পর্যন্ত আমার বর্ষার গানের সঙ্গে দল বেঁধে।" যদু ভট্টও ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ ধ্রুপদী, যে হিন্দীরাগসঙ্গীত অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ পরবর্ত্তী জীবনে অসংখ্য গান রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলির অধিকাংশ মূলগান এই যদু ভট্টের নিকটই প্রথম শুনিয়াছিলেন। যদু ভট্টের স্বরচিত অসংখ্য হিন্দী গানও রবীন্দ্রনাথ পরে ভাঙ্গিয়াছিলেন। মৌলাবক্স নামক একজন গুণীর নিকট রবীন্দ্রনাথের তাল সম্বন্ধে শিক্ষাগ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত-পরিবেশে আরও একজনের নাম সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করিতে হয়। তিনি রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদ গায়ক। যে রাবীন্দ্রিক গায়নী পদ্ধতি ধীরে ধীরে রূপ পাইতেছিল, রাধিকা গোঁসাই মহাশয়ের সহযোগিতায় তাহা পূর্ণতা লাভ করিল। "যাঁদের কাছে তাঁর পরিচয় ছিল তাঁরা সকলেই জানেন রাধিকা গোস্বামীর কেবল যে গানের সংগ্রহ ও রাগিণীর রূপ জ্ঞান ছিল তা' নয়, তিনি গানের মধ্যে বিশেষ একটি রসসঞ্চার কর্‌তে পার্‌তেন। সেটা ছিল ওস্তাদির চেয়ে কিছু বেশী।" (র)

গোস্বামীজীর পর ব্রাহ্মসমাজের গায়ক শ্যামসুন্দর মিশ্র ঠাকুরবাড়ীতে আশ্রয় পাইলেন। কবির সঙ্গীতপরিবেশে তাঁহার প্রভাবও অল্প নয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত বিদ্বজ্জনসমাগম, সঞ্জীবনী সভা, সারস্বত সম্মিলনী, ভারতসঙ্গীত-সমাজ প্রভৃতি নানা সাঙ্গীতিক

এবং সাংস্কৃতিক সংসদের সঙ্গে কবি সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং সেগুলি হইতে গান রচনার প্রেরণা পাইয়াছিলেন।

পরবর্ত্তী জীবনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মারাঠী সঙ্গীতবিদ ভীমরাও শাস্ত্রী এবং বিদেশী সুররসিক ডাঃ আর্ণল্ড বাকে তাঁহার বিশেষ অন্তরঙ্গ ছিলেন।

এ ছাড়া রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করিয়াছে রমাদেবী, দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির সাহচর্য্য এবং সর্ব্বোপরি শান্তিনিকেতনের রসভূয়িষ্ঠ শুচিসুন্দর প্রাকৃতিক আবেষ্টনী এবং ভক্তজনের আগ্রহ।

গ্রাম্য বাউল, ভাটিয়ালী, কীর্ত্তন, সারি গানের সুর রবীন্দ্র-সঙ্গীতে আশ্রয় পাইয়াছে। বিদেশের পাশ্চাত্য সঙ্গীতের বহু বিচিত্র সুর-ভঙ্গিমা রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে নানাভাবে সমৃদ্ধতর করিয়াছে।

বাল্য বয়স হইতেই তাঁহার কবিমন সুরের মোহিনী মায়ার নিবিড় এবং অচ্ছেদ্য বাঁধনে এমনভাবে বাঁধা পড়িয়াছিল যে শেষবয়সে আসিয়া তিনি তাই বলিতে পারিয়াছেন—"কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না। মনে আছে বাল্যকালে গাঁদাফুল দিয়া ঘর সাজাইয়া মাঘোৎসবের অনুকরণে আমরা খেলা করিতাম। সে খেলায় অনুকরণের আর সমস্ত অঙ্গ একেবারেই অর্থহীন, কিন্তু গানটা ফাঁকি ছিল না। চিরকালই গানের সুর আমার মনে একটা অনির্ব্বচনীয় আবেগ উপস্থিত করে। এখনো কাজকর্ম্মের মাঝখানে হঠাৎ একটা গান শুনিলে আমার কাছে একমুহূর্ত্তেই সমস্ত সংসারের ভাবান্তর হইয়া যায়। এই সমস্ত চোখে-দেখার রাজ্য গানে-শোনার মধ্য দিয়া হঠাৎ একটা কি নূতন অর্থলাভ করে।"

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রেরণা

রবীন্দ্রনাথের গান তাঁহাদের পারিবারিক গীতিচর্চ্চারই পরিণতি। এই গানের ডালিতে তাঁহার সঙ্গে তাঁহার সমগ্র পরিবারগোষ্ঠীর শ্রীহস্ত রহিয়াছে। গত শতাব্দীতে তাঁহাদের জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে বাংলা গানের, বিশেষতঃ সুসংস্কৃত রাগপ্রধান গানের যে নব জন্ম হইয়াছিল, দেবেন্দ্রনাথ এবং তাঁহার পুত্রকন্যাদের যত্নে যাহার পূর্ণাঙ্গতা, রবীন্দ্রনাথ তাহারই শেষ ধারারক্ষক ও ধুরন্ধর।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথই গানের সকলক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পথপ্রদর্শক। ইংরাজী সুরকে প্রথম বাংলা গানে ব্যবহার, গীতিনাট্যের সৃষ্টি, হিন্দী সুরের অনুরূপে বাংলা বাণী সংযোজন, নূতন ধারায় নূতন পদ্ধতিতে স্বরলিপিপ্রবর্ত্তন, নূতন ছন্দের সৃষ্টি, গীতিমাসিকের প্রবর্ত্তনা প্রভৃতি বহু বিষয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথই প্রথম হাত দিয়াছিলেন, কবিকে উৎসাহ দিয়াছিলেন, তাঁহার সুর সংশোধন করিয়াছিলেন, তাঁহার গানে সুর যোজনা করিয়া দিয়াছিলেন—এক কথায় রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ভিত্তি স্থাপনই করিয়াছিলেন দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

কবি স্বয়ং তাঁহার সুর-গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছেন "তখন আমার অল্প বয়স, গান গাহিতে আমার কণ্ঠের ক্লান্তি বা বাধামাত্র ছিল না, তখন বাড়ীতে দিনের পর দিন, প্রহরের পর প্রহর সঙ্গীতের অবিরল বিগলিত ঝরনা ঝরিয়া তাহার শীকরবর্ষণে মনের মধ্যে সুরের রামধনুকের রঙ ছড়াইয়া দিতেছে; তখন নব যৌবনে নব নব উদ্যম নূতন নূতন কৌতূহলের পথ ধরিয়া ধাবিত হইতেছে⋯ ⋯আমার সেই কুড়ি বছরের বয়সটাতে এমনি করিয়া

পদক্ষেপ করিয়াছি। সেদিন এই যে আমার সমস্ত শক্তিকে এমন দুর্দ্দম উৎসাহে দৌড় করাইয়াছিলেন, তাহার সারথি ছিলেন জ্যোতিদাদা।"

তাঁহাদের পারিবারিক সঙ্গীত-সংস্কৃতি এবং সুরচর্চ্চার আবেষ্টনীতে কবি লালিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের গৃহে দেশবিদেশের সুর-গুরুগণ আমন্ত্রিত হইতেন, ব্রাহ্মসমাজের দৈনন্দিন প্রার্থনা সভার জন্য গান রচনার বিশেষ তাগিদ ছিল! গণেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথ. স্বর্ণকুমারী প্রভৃতি সকলেই ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিতেন, এই গুলির অধিকাংশের সুর তাঁহাদের সঙ্গীতশিক্ষক বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং যদুভট্ট কর্ত্তৃক যোজিত। বাড়ীতে গানের একটি আবহাওয়া বিরাজ করিত। কবি বলিতেছেন—"আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গানচর্চ্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমার পক্ষে তাহার একটা সুবিধা এই হইয়াছিল, অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার অসুবিধাও ছিল। চেষ্টা করিয়া গান আয়ত্ত করিবার উপযুক্ত অভ্যাস না হওয়াতে শিক্ষা পাকা হয় নাই। সঙ্গীতবিদ্যা বলিতে যাহা বোঝায় তাহার মধ্যে কোনো অধিকার লাভ করিতে পারি নাই।"

সত্যই রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই গান শেখেন নাই, শৈশবে সামান্য যেটুকু তালিম বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী, যদু ভট্টের নিকট গ্রহণ করিয়াছিলেন, সমগ্রভাবে তাহার বিশেষ কোন মূল্য বোধ হয় নাই। তাঁহার সুরজ্ঞতা সম্পূর্ণই প্রতিভাবলে প্রাপ্ত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহে তাহার পূর্ণ পরিণতি। কবি স্বীকার করিয়াছেন, "বাল্যকালে স্বভাবদোষে আমি যথারীতি গান শিখিনি বটে, কিন্তু ভাগ্যক্রমে গানের রসে আমার মন রসিয়ে উঠেছিল। তখন আমাদের বাড়ীতে গানের চর্চার বিরাম ছিল না। বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী ছিলেন সঙ্গীতের আচার্য্য,

হিন্দুস্থানী সঙ্গীত কলার তিনি ওস্তাদ ছিলেন। অতএব ছেলেবেলায় যে সব গান আমার শোনা অভ্যাস ছিল সে সখের দলের গান নয়, তাই আমার মনে কালোয়াতি গানের একটা ঠাট আপনা আপনি জমে উঠেছিল।"

প্রতিভা দেবী, সরলা দেবী, এবং শ্রীইন্দিরা দেবীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় কবি বহুভাবে তাঁহার সুরসৃষ্টির প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। কবির প্রথম যুগের গানের বিস্মৃত সুরকে সরলাদেবী তাঁহার শতগানে সংরক্ষিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত পরিবেশে তাঁহারা বাস করিতেন, প্রায় এক সঙ্গেই তাঁহারাও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিকট সুরদীক্ষা গ্রহণ করেন।

তাঁহাদের সুর জ্ঞান সম্বন্ধে আগ্রহেরও অন্ত ছিল না। রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গীত-সৃষ্টির প্রেরণা যোগাইয়াছিলেন তাঁহারা বহু ভাবেই। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর কথায়, "তবে মনে পড়ে যে সরলা দিদিও আমার মত এক সময়ে লোরেটো ইস্কুলে যেতেন, কিন্তু কেবল বাজনা শেখবার জন্য, লেখাপড়ার জন্য নয়। আর ফিরে এসে এক একবার দুজনেই তেতালায় ছুটতুম (যে অংশে রবীন্দ্রনাথ থাকতেন) পিয়ানোর কাছে কে আগে পৌঁছবে, কে আগে টুলে ব'সে বাজাবে, সেই চেষ্টায়।"

তাঁহাদের উভয়ের যুগ্ম-প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের গান অভিজাত সমাজে প্রথম পরিচয় লাভ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের সুর-বৈচিত্র্যে তাঁহাদের দানেরও তুলনা নাই; বহু গানের মূল সুরটি তাঁহারা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন; যেমন—'আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে,' 'বিশ্ববীণা-রবে', 'একী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ', 'কোথা আছ প্রভু' প্রভৃতি উচ্চাঙ্গ সুরের গান, বাউল এবং কীর্ত্তনের বহু গান যেমন' যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে', এবং 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে' প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী বলিতেছেন—"যেখানে বেড়াতে যেতুম, সেখান

থেকে সেই সেই দেশের নতুন সুর আহরণ ক'রে রবিকাকাকে এনে দেওয়া, এও ছিল আমাদের আর এক কাজ। তার থেকে যে ভাল ভাল গান ভেঙেছেন, তা হয়ত অনেকেই শুনেছেন। কিন্তু তার উৎপত্তির খবর বেশি লোকে রাখে না।" যে সব ইংরেজী গানের বাড়ীতে চর্চা হইত ইন্দিরা দেবী সে গুলিরও নাম করিয়াছেন।

কবির প্রথম যুগের যে গানগুলি সুরমর্য্যাদায় উচ্চাঙ্গের, তাহাদের অধিকাংশই প্রচলিত হিন্দীগানের সুর ও ছন্দ অবলম্বনে রচিত! এইগুলির সৃষ্টির প্রেরণা ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনাসভায় গাহিবার আমন্ত্রণ।

এই ব্রহ্মসঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কৃতিত্ব বিশেষ ছিল না। কারণ, সুরগুলি তাঁহার সৃষ্ট নয়। কিন্তু তাঁহার গানের সুরের ভিত্তি স্থাপন হয় এই হিন্দুস্থানী সুরগুলির অনুরূপ গীতিচর্চায়। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অবশ্য তিনি চিরকালই অনুরাগী শ্রোতা ছিলেন; এই শ্রোতা হইবার জন্যও সাধনার প্রয়োজন হয়। বাল্য বয়স হইতেই এই শ্রেণীর গান শুনিবার অনেক সুযোগ তিনি লাভ করেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীদিলীপকুমার পরিণত বয়সের 'শ্রোতা রবীন্দ্রনাথে'রও উল্লেখ করিয়াছেন—
"রবীন্দ্রনাথ তখন কাশীতে রাজা কিশোরীলাল গোস্বামীর বাড়ীতে অতিথি। সেখানে কাশীর বিখ্যাত বাই হুস্‌নাজান তাঁকে গান শোনাতে এসেছিলেন। সেদিন বৃদ্ধা হুস্‌না তার দুর্বল জরাজীর্ণ কণ্ঠেও যে অপূর্ব সুরের জাল বুনেছিল তা বাস্তবিকই এক শ্রেষ্ঠ গুণীর পক্ষেই সম্ভব। কবীন্দ্র স্তব্ধ হয়ে গান শুনলেন।"

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীতের কালোয়াতীর প্রতি তেমন শ্রদ্ধাবান ছিলেন না। এমন কি জটিল সুরকৌশল যে উচ্চ-শ্রেণীর Art তাহাও বিশ্বাস করিতেন না, তাঁহার মতে গানের মধ্যে কাব্যভাবই কাম্যতর, কাব্যকে সুপ্রকাশের জন্যই সুরের প্রয়োজন। "সঙ্গীতের সুর সম্বন্ধে আমি নিজেকে সুরাচার্য্য ব'লে অভিমান করিনে। কিন্তু আমার

মতে গানটা উচ্চ অঙ্গের বিদ্যা নয়। ভাষার অভাবে মানুষ যখন বোবা ছিল, তখনই গানের উৎপত্তি, তখন মানুষ চিন্তা করতে পারত না ব'লে চীৎকার করত।" কবির এই উক্তিতে তাঁহার মতের সমর্থন মিলে।

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও কবির গানের একসময়ে সঙ্গী ছিলেন। অবনীন্দ্রের ভাষায় বলি—"বাড়িতে অনেকদিন অবধি সঙ্গীতচর্চা করেছি। রাধিকা গোঁসাই নিয়মমত আসত। শ্যামসুন্দরও এসে যোগ দিলে। রোজ জলসা হ'ত বাড়িতে; রবিকাকা গান করতেন, আমি তাঁর স'ঙ্গে তখন ব'সে তাঁর গানের সুর মিলিয়ে এসরাজ বাজাতুম।"

পরিণত জীবনে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তাঁহার গীত-তরণীর কর্ণধার। কবি তাঁহাকে বলিতেন "আমার সকল গানের ভাণ্ডারী"—তাঁহার উপরেই ছিল রবীন্দ্রসুরের প্রচার দায়িত্ব।

রবীন্দ্রসংগীতের সুর-শব্দের তালছন্দের মূল প্রেরণা আসিয়াছে হিন্দী রাগসঙ্গীতের বিশাল সমুদ্র হইতে এবং তাহাতে ফুৎকার দিয়াছে সেই যুগের বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ। এই সামাজিক পরিবেশ রূপায়িত হইয়া উঠিতেছিল সেদিনকার ঠাকুরপরিবার ও ব্রাহ্মসমাজকে কেন্দ্র করিয়া।

———

রবীন্দ্র-সঙ্গীতে বাণীর প্রাধান্য

রবীন্দ্র-সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের কথা এবং সুরের নিবিড় মিলনে সৃষ্ট। রবীন্দ্র-সঙ্গীত বাণীপ্রধান, সুর কথারই দোসরমাত্র, বাণীকেই সালঙ্কারে ভাবমানসপদ্মে ফুটাইয়া রাখাই তাঁহার গানে সুরের কাজ। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে কবি, কাব্যেই তাঁহার আসল পরিচয়, সুর সেই কাব্যকুসুমগুলিকে সূত্ররূপে গাঁথিয়াছে, সুরকে প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহার বাণীর আমন্ত্রণ হয় নাই ; কাব্যকে ওজস্বী ও মর্ম্মস্পর্শী করিবার জন্যই তাঁহার সুরের প্রয়োজন হইয়াছিল।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে কথার বিশেষ ঠাঁই নাই, সেখানে কবিতা সুরের ভারস্বরূপ, সৌন্দর্য্যের হানিকর। পাশ্চাত্য সঙ্গীতেও কাব্যাংশের প্রাধান্য নাই, কেবল কতকগুলি অস্ফুট অসজ্জিত বাণী অপ্রধান অংশ গ্রহণ করে। আর কথাই মুখ্যাংশ— আধুনিক ভারতীয় সঙ্গীতে।

কবি রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে গানে সুরের ভার লাঘব করিয়া কথার মুক্তা সুরের মালায় গাঁথিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের বিভিন্ন ভাবেরই প্রকাশক এই সুর। "সঙ্গীত সুরের রাগ-রাগিণী নহে, সঙ্গীত ভাবের রাগ-রাগিণী। আমাদের কথা এই যে, কবিতা যেমন ভাবের ভাষা, সঙ্গীতও তেমনি ভাবের ভাষা।" (রবীন্দ্রনাথ)।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁহার সঙ্গীতের এই কাব্যবাণীর আতিশয্যের চমৎকার কারণ দেখাইয়াছেন। সঙ্গীত মনের অব্যক্ত ভাবের ব্যক্ততা, যে কথাটি আর কোন ভাবে বলা যায় নাই, তাহাকেই সুরের আভরণে প্রকাশ করাই সঙ্গীতের কাজ, অধিক সুরভারে হৃদয়াবেগ হয় পীড়িত, সুরের আড়ালে ভাবই যাইবে হারাইয়া।

কবি বলিয়াছেন "আমাদের ভাবপ্রকাশের দুটি উপকরণ আছে—কথা ও সুর। কথাও যতখানি ভাবপ্রকাশ করে, সুরও প্রায় ততখানি ভাবপ্রকাশ করে। এমন কি, সুরের উপরেই কথার ভাব নির্ভর করে। একই কথা নানা সুরে নানা অর্থ প্রকাশ করে। সুরের ভাষা ও কথার ভাষা উভয় ভাষায় মিশিয়া আমাদের ভাবের ভাষা নির্ম্মাণ করে। কবিতায় আমরা কথার ভাষাকে প্রাধান্য দিই।" সঙ্গীতে সুরই অধিরাজ, তাহারই আদেশে চলে বাণী; সুরের প্রাধান্য না থাকিলে গান তো আবৃত্তির প্রকারভেদে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বাণীরই অভিষেক করিয়াছেন। তাই মতান্তরে রবীন্দ্র-সঙ্গীত যেন আবৃত্তিরই সুরমিশ্রিত রূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কবি বলিয়াছেন—

"কবিতায় যেমন বাছা বাছা সুন্দর কথায় ভাব প্রকাশ করে, সঙ্গীতেও তেমনি বাছা বাছা সুন্দর সুরে ভাবপ্রকাশ করে। যুক্তির ভাষায় প্রচলিত কথোপকথনের সুর ব্যতীত আর কিছু আবশ্যক করে না। কিন্তু যুক্তির অতীত আবেগের ভাষায় সঙ্গীতের সুর আবশ্যক করে। এ বিষয়েও সঙ্গীত অবিকল কবিতার ন্যায়।"

সুবাচক অথবা সুবক্তা কেবল কতকগুলি যুক্তিপূর্ণ বাক্যজালে শ্রোতৃগণকে স্তম্ভিত করেন, কিন্তু যখন ঐ যুক্তিপূর্ণ কথাগুলির প্রাণে 'পসারণ' করিবার প্রয়োজন, যখন বিষয়বস্তু অপেক্ষা বলিবার ভঙ্গীই শ্রোতৃগণকে মুগ্ধ করে, তখন সুকবির প্রয়োজন। আর যখন আবেগই সব, বলিবার কথা সামান্যই তখনই সঙ্গীতের সৃষ্টি।

কবির উক্তি—"সঙ্গীতেও ছন্দ আছে, তালে তালে তাহার সুরের লীলা নিয়মিত হইতেছে। কথোপকথনের সুরে ভাষায় সুশৃঙ্খল ছন্দ নাই, কবিতায় ছন্দ আছে, তেমনি কথোপকথনের সুরে সুশৃঙ্খল তাল নাই, সঙ্গীতে তাল আছে। সঙ্গীত ও কবিতা উভয়ে ভাবপ্রকাশের দুইটি অঙ্গ ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথ সেই উভয় অঙ্গের একত্রে সমাবেশ করিতে পারিয়াছেন তাঁহার গানে।

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ ধ্রুপদ সঙ্গীতে স্বরধ্বনি ছাড়া কথার ঠাঁই প্রায় ছিল না। ঠুংরি গানে অল্প কথা প্রবেশ করিল। কেবল তানবিস্তারের জন্য খেয়ালে কথার প্রয়োজন হয় না। টপ্পায় কথা অর্থাৎ ভাবজল্পনা সুরের সঙ্গে অনেকটা একস্তরে স্থান পাইল; আর লৌকিক সঙ্গীতে (বাউল, কীর্ত্তন, ভাটিয়ালী) কথারই প্রয়োজনে সুরের আয়োজন।

কবি বলেন—"ভাবের চর্চ্চা করিতে হইয়াছে, সেই নিমিত্তই কবিতার এমন উন্নতি ও সঙ্গীতের এমন অবনতি। এই জন্য ভাবের অভাব হইলেও একটা ইন্দ্রিয়সুখ তাহা হইতে পাওয়া যায়। এই নিমিত্ত সঙ্গীতে ভাবের প্রতি তেমন মনোযোগ দেওয়া হয় নাই।"

কিন্তু সুর ক্রমশঃই আবেগ হারাইয়াছে, নূতন সুরেরও সৃষ্টি হয় নাই, ভাবের অভাবে সঙ্গীতের ভাষা ক্রমেই মূক মূঢ় হইয়া গিয়াছে, কথা অনাদরে অবহেলায় সঙ্গীতের আসরের বাহিরে পড়িয়া রহিয়াছে। কবি আক্ষেপ করিয়াছেন—"উত্তরোত্তর আস্কারা পাইয়া সুর বিদ্রোহী হইয়া ভাবের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। এককালে যে দাস ছিল, আরএককালে সে-ই প্রভু হইয়াছে।" কবিতায় ভাবপ্রকাশ করা যায় অনেক, সেখানে ভাবের লাঘবের জন্য কড়াকড়ি নাই; কিন্তু সঙ্গীতে সুরের অংশটিই প্রধান, তাই ভাবের বাহুল্যের অবসর নাই। রবীন্দ্রনাথই বাণীর দ্বারা গানের ভাব সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছেন।

কথার বাণী ছাড়া আর কিছু দিবার নাই, কিন্তু সুরের আছে; কথার কাজ যেখানে স্তব্ধ, সুর সেখানেই করে আধিপত্য। সঙ্গীত কেবল হৃদয়ের একটিমাত্র অতি সুকুমার আবেগেরই প্রকাশ করে। "মনের একটিমাত্র স্থায়ী ভাব বাছিয়া লওয়া, ভাবশৃঙ্খলের একটিমাত্র

অংশের উপর অবস্থান করিয়া থাকা সঙ্গীতের কাজ। মনে কর, আমি বলিলাম "হায়"! কথাটা ঐখানেই ফুরাইল, কথায় উহার অপেক্ষা আর অধিক প্রকাশ করিতে পারে না। আমার হৃদয়ের একটি অবস্থাবিশেষ ঐ একটিমাত্র ক্ষুদ্র কথায় প্রকাশ হইয়া অবসান হইল। সঙ্গীত সেই "হায়" শব্দটি লইয়া তাহাকে বিস্তার করিতে থাকে; "হায়" শব্দের হৃদয় উদ্ঘাটন করিতে থাকে; "হায়" শব্দটির হৃদয়ের মধ্যে যে গভীর দুঃখ, যে অতৃপ্ত বাসনা, যে আশার জলাঞ্জলি প্রচ্ছন্ন আছে, সঙ্গীত তাহাই টানিয়া টানিয়া বাহির করিতে থাকে, "হায়" শব্দের প্রাণের মধ্য যতটা কথা ছিল সবটা তাহাকে দিয়া বলাইয়া লয়।" (রবীন্দ্রনাথ)

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁহার সঙ্গীত সম্বন্ধে এ শ্রেণীর নানা মন্তব্য করিয়া তাঁহার কবিপ্রতিভাকে তাঁহার সঙ্গীতস্রষ্টার উপরে আসন দিয়াছিলেন। রবীন্দ্র-সঙ্গীত অনুভূতির গান, হৃদয়স্পর্শী তাহার আবেদন; বহুজনের আসরে বা গুণিসমাজে ঘটা করিয়া প্রকাশ করিবার বস্তু নয়। যে নিগূঢ় রস রবীন্দ্র-সঙ্গীতে উচ্ছ্বলিত হয়, তাহা উপভোগ করে রসিক গায়ক এবং দরদী শ্রোতা কেবল দুই জনই মাত্র।

যে সঙ্গীত-আবেষ্টনীতে তাঁহার সুরবত্তার উন্মেষ হয়, সেদিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়—চিরকালই তাঁহার কবিসত্তারই প্রভুত্ব। সুরের ওস্তাদ বাণীর সাধকের কাছে নতি স্বীকার করিয়াছে; সুর কোথাও কাব্যকৌশলকে ছাড়াইয়া যায় নাই। শৈশবে বেদ-উপনিষদের সূক্ত-মন্ত্রাদির সাত্ত্বিক প্রভাবে ব্রহ্ম-উপাসনার সঙ্গীতরচনায়, মধ্য-জীবনে কবি-প্রতিভার চরম উৎকর্ষের স্তরে অতীন্দ্রিয়-লোকের ভাব-সাধনায়, শেষ জীবনে সঙ্গীতে উদাস বৈরাগ্য সাধনায়—সব সময়েই তাঁহার আত্মসমর্থনের যুক্তি—"কারুখচিত বাণী সমগ্র গানকে যদি শোভন ক'রে তোলে তা হ'লে

কোনো দিক থেকে মূল্যের কিছু হ্রাস হতে পারে ব'লে তো মনে করি নে।"

রবীন্দ্র-সঙ্গীতে ধ্রুবপদ্ধতিতে রচিত চারটি সম্পূর্ণ বিভাগ—অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ। সুর এই চারিটি স্তরেই সীমাবদ্ধ, তান-বিস্তার বা তানকর্ত্তপের অবকাশ নাই। এ গানে ওস্তাদী সঙ্গীতের মতন কেবলমাত্র সুরকৌশলের উপর নির্ভর করিয়া ভাবাবেগ প্রকাশের উপায় নাই। কাজেই কবির সঙ্গীতের বৈচিত্র্য যাহা কিছু সবই বাণীতে। তবে কবি কোথাও সুরকে অবহেলাও করেন নাই; তাই বলিয়াছেন "গানে বাণীকেও সুরের খাতিরে কিছু আপোষ করতে হয়, তাকে সুরের উপযোগী হ'তে হয়। আমার নিজের কবিত্বের ইতিহাসে দেখতে পাই গান রচনা অর্থাৎ সঙ্গীতের সঙ্গে বাণীর মিলন সাধনাই এখন আমার প্রধান সাধনা হ'য়ে উঠেছে।"

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বিশ্বাস করিতেন—উত্তরকালে রসিকসমাজে তাঁহার গানই সশ্রদ্ধ আসন পাইবে; তাঁহার গানই ভবিষ্যতে তাঁহার আসল পরিচয় হইবে। ডাঃ টমসনের নিকট লেখা একটি পত্রে কবিগুরু তাঁহার সঙ্গীত সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"I have composed 500 new tunes, perhaps more. This is a parallel growth to my poetry. Any how, I love this aspect of my activity. I get lost in my songs and then my poetry is forgotten. My songs will live with my countrymen and have a permanent place. All the same, I know the artistic value of my songs. They have a great beauty. Though they will not be known outside my province and much of my work will gradually be lost, I leave them as a legacy."

কবির শেষ অনুযোগ সত্য নয়, তাঁহার গান কেবল বাংলায় নয় ভারতের সর্ব্বত্র তাঁহার আসল পরিচয় আজ ঘোষণা করিতেছে। বহু অবাঙ্গালী গায়ক-গায়িকা আজ তাঁহার গানেরই প্রসাদে শিল্পিসমাজে স্থান পাইয়াছেন। সুদূর ইউরোপে বাকে সাহেবের মত রসিকও তাঁহার গানের সুর ঝঙ্কারে মুগ্ধ। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে 'কথা'র মূল্য অশেষ। রবীন্দ্র-কাব্য এবং রবীন্দ্র-সুর উভয়ই এমনভাবে যুগনদ্ধ যে তাঁহার সঙ্গীত মূর্ত্তিকে অর্দ্ধনারীশ্বর বলা যায়! তাই বিশ্বকবির গান বিশ্বজনের মনোহরণ করিয়াছে; বাংলা কথার মর্মবোধে ও ধ্বনিমাধুর্য্যের উপভোগে রসিকজনের অসুবিধা হয় নাই।

তিনি স্বীকারও করিয়াছেন যে স্বেচ্ছায় তিনি সঙ্গীতের আভিজাত্য নষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে সঙ্গীতের পক্ষপুটে আর কোন কবি এত কাব্যবাণীভার সমারোপ করেন নাই। কবিই একদিন বলিয়াছিলেন—

"কলাবিদ্যা যেখানে একেশ্বরী, সেইখানেই তাহার পূর্ণ গৌরব। সতীনের সঙ্গে ঘর করিতে গেলে তাহাকে খাটো হইতে হয়, বিশেষতঃ সতীন যদি প্রবল হয়। যাহা উচ্চদরের কাব্য তাহা আপনার সঙ্গীত আপনার নিয়মেই যোগাইয়া থাকে, বাহিরের সঙ্গীতের সাহায্য অবজ্ঞার সহিত উপেক্ষা করে। যাহা উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীত তাহা আপনার কথা আপনার নিয়মেই বলে—তাহা কথার জন্য কবির মুখাপেক্ষা করে না—তাহা নিতান্ত তুচ্ছ তোম-তানা-নানা লইয়াই চমৎকার কাজ চালাইয়া দেয়।"

সঙ্গীত-কলাকে তিনি একেশ্বরী থাকিতে দেন নাই। আভিজাত্যের গৌরবটা তিনি সুরলক্ষ্মী ও কাব্যসরস্বতীর মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছেন। বরং সরস্বতী একটু মুখরা বলিয়া লক্ষ্মীকে একটু খাটোই হইতে হইয়াছে। লক্ষ্মীর ভাগে গৌরবটা একটু কমই পড়িয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের সুর

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের গীতিরস আমরা সমগ্রভাবে অন্তর দিয়া উপলব্ধি করি, বিভিন্ন সুরের ধারায় ভাগ করিয়া পৃথক পৃথক গীতিভঙ্গীতে কোনদিন তাহাকে বিচার করি না। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মহাসাগরে ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি, টপ্পা, বাউল, কীর্ত্তন, Jazz, Dance Tune—Church music, সকল ধারাই এক দেহে লীন হইয়াছে, সবাই নিজস্ব স্বতন্ত্র সত্ত্বা হারাইয়াছে। পঞ্জাবী, গুজরাতী, মারাঠী, কানাড়ী, মান্দ্রাজী ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষাগীতের মহাভারতীয় সম্মিলন ঘটিয়াছে তাঁহার সুরোৎসবে।

পরিবেশের প্রভাবে প্রথম-জীবনে কবি ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পাজাতীয় গানের অধিকতর অনুশীলন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মসঙ্গীত এবং মায়ার খেলার গানগুলিতে হিন্দী রাগসঙ্গীতের যথাসম্ভব অনুকরণ রহিয়াছে।

কবিজীবনের দ্বিতীয় পর্য্যায়ে ভারতীয় সঙ্গীতজগতে যুগ-পরিবর্ত্তনের আভাস বহন করিয়া আসিয়াছে তাঁহার গান। তিনি দেখাইলেন, তাঁহার কবি-প্রতিভায় গানে সুরকে পশ্চাতে রাখিয়া বাণীর প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব। সাধারণ গানগুলিতে তিনি ধ্রুপদের ন্যায় সঞ্চারী ও আভোগের ব্যবহার করিয়া গতানুগতিকতা হইতে সঙ্গীতকে মুক্তি দিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ গান ধ্রুপদ অঙ্গের মিশ্র রাগিণীর আশ্রয়ে ধীর গতি বিশিষ্ট।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত বাণীপ্রধান। কাজেই খেয়াল অথবা ঠুংরির প্রভাব তাঁহার গানে বিশেষ নাই।

তৃতীয় পর্য্যায়ে তাঁহার গানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বহির্ভূত

সুরের প্রচলন হইল। দেশীয় গ্রাম্য বাউল কীর্ত্তনের ঢঙে গাঁথা গানগুলি এ ধারায় তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা। সুরের বিহারক্ষেত্র এখানে অসীম, কবি অল্প কথায় তাহার সীমা টানিয়া লইয়াছেন।

চতুর্থ পর্য্যায়ে তাঁহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গানেরই অবাধ সৃষ্টি হয়। এই সময়ে রাগরাগিণীসম্মত কোন একটি বিশিষ্ট ধারা তিনি যথাসম্ভব এড়াইয়া গিয়াছেন। বিভিন্ন সুরের সমবায়ে মিশ্র একটি বিচিত্র ভঙ্গী এই পর্য্যায়ের সমস্ত গানে প্রকাশ পাইতেছে। এই পর্য্যায়ে তাঁহার বিশিষ্ট অবদান সুরে নাট্যরীতির অবতারণা। সুরের মধ্য দিয়া মনোভাবের নানা রঙ্গ তিনি প্রকাশ করিয়াছেন; সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি সুরজগৎ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

প্রথম যুগে রাগ সঙ্গীতের প্রচলিত হিন্দী বিষ্ণুপুরী গানগুলির তিনি অনুকরণ করিয়াছিলেন, এমনকি হিন্দী গানের কোন কোন অংশের ভাব এবং কথারও অনুসরণ করিয়াছিলেন, যেমন (বাহার, তেওড়ায়) আজি বহিছে বসন্ত পবন সুমন্দ হে, (আজু বহত সুগন্ধ পবন সুমন্দ।) হিন্দী গানের সুরকে প্রকাশ করিবার জন্য অনেক অবোধ্য, দুর্ব্বোধ এবং অর্থহীন কথার আশ্রয় লওয়া হইত, রবীন্দ্রনাথ সেখানে সুন্দর সুমিষ্ট ভাবময় বাণীসংযোগে গানকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। প্রচলিত সুর ও তালের সহযোগেই তিনি গানগুলিকে কাব্যভাবের মধ্য দিয়া সুশ্রাব্য করিয়াছেন, হিন্দী সুর ও ছন্দে গঠিত তাঁহার হৃদয়ভাবের গান নব নবরূপে দেখা দিয়াছে, ধার-করা সুর হইলেও গানগুলি এইভাবেই তাঁহার নিজস্ব সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে।

ধ্রুপদের শক্ত কাঠামোর গানে তিনি স্বেচ্ছামত সুরবিহার করিতে পারেন নাই। তাই কাব্যবাণীই তাহাতে নব নব সুরসজ্জায় রূপলাভ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজে স্বীকার করিয়াছেন—"প্রথম বয়সে আমি

হৃদয়ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি গানে, আশা করি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে। পরিণত বয়সের গান, ভাব বাংলাবার জন্যে নয়, রূপ দেবার জন্যে। তৎসংশ্লিষ্ট কাব্যগুলিরও অধিকাংশই রূপের বাহন।”

ধ্রুপদ—তাঁহার অধিকাংশ গান ধ্রুপদ রীতিতে রচিত। কবির এই সব ভাগবতী গানে রীতি, কথা, সুর, ছন্দ, সবই গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি এবং গীতাঞ্জলির গান অধিকাংশই ধ্রুপদধারায় রচিত। ভারতীয় ধ্রুপদ-গানের দুইটি পৃথক ভঙ্গী আছে—মৃদুগতির গওহরবাণী এবং দ্রুতগতির খাণ্ডারবাণী; রবীন্দ্রনাথের গান প্রধানতঃ প্রথম ধারার অনুশীলন; ধ্রুপদে দ্রুত ছন্দ তাহার গম্ভীর ভাবকে ব্যাহত করে; কিন্তু বহুস্থলে তিনি খাণ্ডারবাণীর দ্রুততাও অজানিতেই অবলম্বন করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতে সঞ্চারীর বৈচিত্র্য অপূর্ব্ব, মনে হয় এই সঞ্চারীর সৌন্দর্য্যের জন্যই রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদের অনুশীলন করিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত গানের মূল সুররস মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে সঞ্চারীতেই।

তাঁহার রাগসঙ্গীতে পরবর্ত্তী কালে কোন একটি মাত্র রাগে স্থায়ী না হইয়া রাগান্তরে গমনাগমন করিবার স্বাধীনতা প্রাচীনশাস্ত্রীয় সঙ্গীতরীতির বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বিদ্রোহ। একাধিক রাগে তাঁহার মিশ্রগান সঙ্কর হয় নাই, হইয়াছে সুললিত। বৈঠকী গানকে তিনি সুরের ললিতমধুর স্বচ্ছন্দরূপেই প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ওস্তাদীরূপ তিনি স্বীকার করিতেন না। তাঁহার কথায়—“এই জন্যে ভারতের বৈঠকী সঙ্গীত কালক্রমে সুরসভা ছাড়িয়া অসুরের কুস্তির আখড়ায় নামিয়াছে। সেখানে তানমান লয়ের তাণ্ডবটাই প্রবল হইয়া উঠে, আসল গানটা ঝাপসা হইয়া থাকে।” আসল গানটি অর্থাৎ তাহার ভাবটি যাহাতে স্বচ্ছন্দে রূপায়িত হয় সেটাই ছিল তাঁহার একমাত্র

লক্ষ্য। এ প্রচেষ্টা সার্থক করিতেই তাঁহার নিজস্ব মিশ্র সুরের জন্ম।

ভারতীয় সঙ্গীতের শাস্ত্রানুসারে রাগ-রাগিণীর সময়ানুবর্ত্তী এবং রসবিভাবের যে পুরাতন বিধিবিধান ছিল, তাহা তিনি যথাসম্ভব অনুসরণ করিয়াছেন; কিন্তু অনেকস্থলে তিনি নিয়ম ভাঙ্গিয়াছেন, ধ্বংসের জন্য নয়, নবতন সৃষ্টির প্রয়াসে; সেখানেও রুচি অবিশুদ্ধ হয় নাই। করুণরসের ভৈরবীতে বীররসের 'শ্রী' প্রকাশ পাইয়াছে, বর্ষার গানে মল্লারের পরিবর্ত্তে ইমনের সুর বাদলধারাই ধ্বনিত করিয়াছে।

রাগের যে ঋতুকালীন বিভাগ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে প্রচলিত আছে রবীন্দ্রনাথ তাহার ব্যতিক্রম করেন নাই; গ্রীষ্মঋতুতে পঞ্চম, বর্ষায় মেঘ, শরতে ভৈরব, হেমন্তে শ্রী, শীতে নটনারায়ণ এবং বসন্তে বসন্তরাগই তাঁহার ঋতু-গানে প্রাধান্য পাইয়াছে। ঋতুরঙ্গের গানগুলি আমাদের মনোজগতের ঋতুপরিবর্ত্তনের সুরে বাঁধা, তাই নটরাজের নৃত্যের তালে গাঁথা যে অনুভূতিগম্য সুররস তাহারই প্রভাব-পাত হইয়াছে তাঁহার গানে। এই সূত্রে তাঁহার শ্রেষ্ঠ ঋতু-মঙ্গলের গান আলোচনা করিলে তাহার সমর্থন পাওয়া যায়—গ্রীষ্ম (হে তাপস, তব শুষ্ক কঠোর রূপের), বর্ষা (আজি বর্ষা রাতের শেষে) শরৎ (আজি শরৎ তপনে প্রভাত স্বপনে), হেমন্ত (হেমন্তে কোন বসন্তেরি বাণী), শীত (শীতের বনে কোন সে কঠিন) এবং বসন্ত (আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে)। তাঁহার অধিকাংশ বর্ষা ও বসন্তের গানেই মল্লার এবং বাহারের প্রভাব আছে, তবে পরে অনেক গানে নব রীতিতে মিশ্রণ এবং প্রাচীন রীতির লঙ্ঘন করিয়াছেন।

এ সমস্ত গানে সুরের অপেক্ষা ভাবেরই প্রভুত্ব বেশী, তাহা সত্ত্বেও কোথাও সুরের শাসন লঙ্ঘন করা হয় নাই।

ধ্রুপদের রীতিতে রবীন্দ্র-সঙ্গীত স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ চারিটি বিশিষ্ট তুকে গঠিত—ধ্রুপদ-গানের উপযোগী ঝট্‌কা, গীড়, আশ, ছন্দগমক্, উপজ প্রভৃতি রবীন্দ্র-সঙ্গীতেও কিছুটা লক্ষিত হয়। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে দ্রুত গিট্‌কিরী ও দীর্ঘ তানের ব্যবহার নাই। তানের অবশ্য বিশেষ প্রয়োজনও নাই। কারণ, রবীন্দ্র-গীতিতে সুর অপেক্ষা 'কথার তান' বা আঁখর প্রাধান্য পাইয়াছে। প্রচলিত রীতিতে ধ্রুপদে এক সঙ্গে দুইটি লয়ই ব্যবহৃত হয়—প্রথমে বিলম্বিত লয়ে, শেষে দ্রুত লয়ে। কবি তাঁহার প্রায় সব গানেই বিলম্বিত, না হয় মধ্যলয় ব্যবহার করিয়াছেন। 'অমল ধবল পালে' 'শরতে আজ কোন অতিথি' 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' প্রভৃতি তাঁহার মধ্যলয়ের গান।

ধ্রুপদের বিশিষ্ট দীর্ঘতাল চৌতাল, রূপক ধামার, তেওড়া, ঝাঁপতাল, সুরফাক্তা প্রভৃতি তিনি তাঁহার এসকল গানে সর্বত্র ব্যবহার করিয়াছেন। ধ্রুপদের বিশিষ্ট গতি ধীর লয় এবং শান্ত গম্ভীর ভাব তিনি বজায় রাখিয়াছেন।

টপ্পা—ধ্রুপদের মতো টপ্পাও কবির প্রিয় রীতি। রবীন্দ্রনাথ টপ্পা-গানে উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ সুরজ্ঞ শোরি মিঞার পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। টপ্পাগানে খেয়ালের ন্যায় মধ্যে মধ্যে তান ও দ্রুত গিট্‌কিরী, মূর্চ্ছনা ব্যবহৃত হয়। রবীন্দ্রনাথের আদিযুগের অনেক গানে, বিশেষতঃ 'মায়ার খেলা'য় টপ্পার এই প্রভাব দেখা যায়।

প্রচলিত হিন্দী টপ্পা গানের সুর অনুরূপে তাঁহার গান (১) কে বসিলে আজি (বে পরিয়া তাঁডে, সিন্ধু) (২) হৃদয় বাসনা মম (মিয়া বে মাহুলে, ঝিঁঝিট) (৩) নিশিদিন চাহরে (আজু মনভাবন, যোগিয়া) প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথের টপ্পা-গানের আধুনিক নিদর্শন—আমি রূপে

তোমায় ভোলাব না, তোমায় নতুন করে পাবো বলে, আজি যে রজনী যায়, আরো আঘাতে সইবে, সার্থক জনম মাগো, রূপসাগরে ডুব দিয়েছি' (খাম্বাজ), 'আমি তোমার প্রেমে হব' (ভৈরবী)—প্রথম যুগের টপ্পা হইতে স্বতন্ত্র। স্বল্পকথা ও অল্পপরিমাণে টপ্পার বিশিষ্ট তানবিস্তার, বোলতানের ব্যবহার, স্থায়ী এবং অন্তরায় স্বতন্ত্র স্বর-ক্ষেপণ এবং স্বাভাবিক মৃদু গতি কবি তাঁহার এ শ্রেণীর গানে বজায় রাখিয়াছেন। তাঁহার অধিকাংশ টপ্পাই কাফী, ঝিঁঝিট, সিন্ধু, ভৈরবী, খাম্বাজ, প্রভৃতি রাগিণী এবং মধ্যমান, আড়াঠেকা প্রভৃতি তালে রচিত।

ঠুংরি—ঠুংরি রীতি রবীন্দ্রনাথ যথাসম্ভব অল্প ব্যবহার করিয়াছেন। ঠুংরিতে কাব্যবাণীর অল্প মূল্য আছে, অন্ততঃ খেয়ালের তুলনায় তানের প্রাধান্য কিছু কম।

ধ্রুপদভঙ্গীতেও তিনি ঠুংরী ও টপ্পার কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণ করিয়াছিলেন, ঠুংরীর বিশেষ স্বর-বিন্যাস রবীন্দ্র-সঙ্গীতে বহুস্থানেই রহিয়াছে।

'তুমি কিছু দিয়ে যাও মোর প্রাণে' 'খেলার সাথী বিদায় দ্বার খোলা' উভয় গানই লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের বিশিষ্ট ঠুংরি রীতিতে রচিত। প্রথমটির মূল গান 'কৈ কছু কহরে 'এবং শেষেরটির মূলগান' মহারাজা কেবড়িয়া'।

খেয়াল—রবীন্দ্রনাথের খেয়ালের ধারায় গান বিশেষ নাই। খেয়াল হইতেছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কৌশলের গান—এখানে কথার সামান্যতম মূল্যও অস্বীকার করা হয়।

মধ্যযুগের স্বল্পাক্ষরবিশিষ্ট তাঁহার দুই-একটি গানে খেয়ালের ন্যায় তানবিস্তারের প্রভাব দেখা যায় মাত্র। রবীন্দ্রসঙ্গীতে খেয়াল অঙ্গের নিজস্ব গানগুলির মধ্যে—'সীমার মাঝে অসীম তুমি' (কেদারা—

ছায়ানট), 'মন্দিরে মম কে আসিলে' (আড়ানা), 'অমল ধবল পালে লেগেছে' (ভৈরবী) প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আধুনিক যুগের 'বন্ধু রহো রহো সাথে' 'অশ্রুভরা বেদনা,' 'এসো শরতের অমল মহিমা;' 'কার বাঁশী নিশিভোরে' প্রভৃতি গানের অধিকাংশই টপ্‌খেয়ালের পর্য্যায়ের অর্থাৎ টপ্পা এবং খেয়াল উভয় রীতির সম্মিলনে রচিত।

আদিযুগে ধ্রুপদের মতো হিন্দী বিষ্ণুপুরীখেয়াল গানের অনুরূপেও গান রচিত হয় (১) ডাকে বার বার (মোহে কৈসে নিকি লাগি, কেদারা) (২) আজি মম জীবনে (অব মোরি পায়েলা, আড়ানা) (৩) নয়ান ভাসিল জলে (পাপীহা বোলে রে, শ্যাম,) (৪) দাও হে হৃদয় ভরে (প্যালা মুঝে ভরি, রামকেলি,) (৫) কোথা হতে বাজে (বাজরহী আঁখিয়ারে, সুরট) এবং (৬) শীতল তব পদছায়া (বাঙ্গুরী মোরি মুরগই, ইমন)।

তেলেনা—উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে চতুরঙ্গ, তেলেনা নামে আর একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর রাগভঙ্গিমার গান আছে; হিন্দীতে সেগুলির অধিকাংশই 'না দেরে দ্রিম্ তা না না' প্রভৃতি অর্থহীন কথার সমষ্টি। রবীন্দ্রনাথ তাহার সুরভঙ্গি অবলম্বন করিয়াছেন এ সকলগানে-'স্বপ্নহীন নিশিদিন (নটমল্লার,) ঐ পোহাইল তিমির রাত্তি (আলেয়া), চরাচর সকলি মিছে মায়া (বেহাগ) এই বেলা সবে মিলে (ইমন কল্যাণ), অহো আস্পর্দ্ধা একি (বেহাগ), প্রভৃতি। এসকল গানের গতি দ্রুত লয়।

এই পর্য্যন্ত যাহাকে মার্গসঙ্গীতের আদর্শে গঠিত গান বলা যাইতে পারে, রবীন্দ্রনাথের সেই শ্রেণীর গান। আর লোকসঙ্গীতের অনুকরণে গাঁথা তাঁহার বাউল, কীর্ত্তন, রামপ্রসাদী, সারিগান সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের পরিচয় প্রকাশ করিয়াছে।

কীর্ত্তন—বাংলার লোকসঙ্গীতের প্রতি ধারায় রবীন্দ্রনাথ নব নব সৃষ্টি করিয়াছেন, বাংলার নিজস্ব সম্পদ্ কীর্ত্তনও তাহা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। তাঁহার কীর্ত্তনগানগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(১) অনুসৃত, এবং (২) প্রবর্ত্তিত। কীর্ত্তনের সুর ও ছন্দ সব সময়ে ভাবকে অনুসরণ করে, ভাবের প্রয়োজন অনুসারে তাহার বদল হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বাউল এবং কীর্ত্তনের আগাগোড়াই সমসুরেই রাখিয়াছেন। তাঁহার কীর্ত্তনের সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে প্রচলিত কীর্ত্তনের অতিপরিচিত ধরণের "আঁখর" তাঁহার গানে নাই। আর এক শ্রেণীর কীর্ত্তন বাউল-গানেরই ভিন্ন রূপ। প্রচলিত কীর্ত্তনের সুরের মতো বিরোধী ঠাটের মিশ্রণ তাঁহার গানে নাই। তাঁহার অন্যান্য গানের ন্যায় বাউলে ও কীর্ত্তনে চারিটি সুরভাগ বা তুক্ আছে।

রামপ্রসাদী গানের সুরে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গান আছে। বাল্মীকিপ্রতিভায় এবং স্বদেশী গানের যুগে এই গানগুলি রচিত হয়। এইগুলি প্রচলিত রামপ্রসাদী সুরের হুবহু অনুকরণমাত্র। (১) একবার তোরা মা বলিয়া ডাক, (ঝিঁঝিট) (২) শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা, (৩) আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে (৪) আমিই শুধু রইনু বাকি প্রভৃতি।

বাউল—রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বাউলের সুরে। শিলাইদহের ভাটিয়ালী এবং সারিসুরের গান হইতেই তাঁহার বাউল-গানের উৎস। রবীন্দ্রনাথের বাউল-গানে কথাই প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছে, সুর কেবল কথাগুলিকে গাঁথিতেছে মাত্র। তাঁহার স্বদেশী গানগুলিকে তিনি সমগ্রভাবে 'বাউল' আখ্যা দিয়াছিলেন। অনেক গান রাগিণী-সমাশ্রিত হইলেও সুরের কৌশল ও বক্রগতিকে যথাসম্ভব এড়ানো হইয়াছে। হিন্দুস্থানী রাগ-

রাগিণী এবং ছন্দের সঙ্গে বাংলাবাউলের নিজস্ব রীতির মিশ্রণে কবি নব সুরধারা প্রবাহিত করিয়াছেন। সারি-বাউল বা মাঝির গানের সুর রবীন্দ্র-সঙ্গীতে আরো কয়েকটি অপূর্ব্ব রত্ন আনয়ন করিয়াছে।

তাঁহার এ শ্রেণীর গানের ফসল সম্পূর্ণভাবে বাংলার পলিমাটিতেই জন্মিয়াছে। কবি বলিতেছেন, "একবার যদি আমাদের বাউলের সুরগুলি আলোচনা করিয়া দেখি তবে দেখিতে পাইব যে, তাহাতে আমাদের সঙ্গীতের মূল আদর্শটাও বজায় আছে, অথচ সেই সুরগুলা স্বাধীন। এ সুরগুলিকে কোনো রাগ-কৌলীন্যের জাতের কোঠায় ফেলা যায় না বটে, তবু এদের জাতির পরিচয় সম্বন্ধে ভুল হয় না—স্পষ্ট বোঝা যায় এ আমাদের দেশেরই সুর, বিলাতী সুর নয়।"

রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় শ্রেণীর গানগুলি আধুনিকতর গান, মিশ্ররাগের সম্মিলনে সৃষ্ট হইলেও ইহাদের বিদেশী ভঙ্গীটি স্পষ্টই ধরা পড়ে। তাঁহার কাব্যগীতিগুলিই অবশ্য কবির গানের সুন্দরতর পরিচয় সূচনা করে।

রবীন্দ্রনাথ বিলাতী সুরটিকে দেশী পোষাকে সাজাইয়াছিলেন। প্রথমজীবনে Irish Melodies অনুকরণে তিনি বিলাতী ঢঙটি পরীক্ষা করিয়াছিলেন 'বাল্মীকিপ্রতিভা এবং কালমৃগয়ায়'। পরবর্ত্তী জীবনে বিলাতী সুরে দেশী গান রচনা করিয়া সঙ্গীতের আন্তর্জাতিকতার সৃষ্টি করিয়াছেন। বিলাতী সুরের সূক্ষ্ম 'শ্রুতি'গুলিকে বাংলা গানের বিভিন্নস্থলে প্রয়োগ করিয়া গানগুলিতে বৈদেশিক চটুলতাও সঞ্চার করিয়াছেন।

বিলাতী গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভাগবত গানের (Church Music) অনুকরণে রচিত গানে রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব্ব তন্ময়তারও সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন।

বিলাতী সুরের অনুকরণে রবীন্দ্র-সঙ্গীতে আর-এক শ্রেণীর গান আছে ; সেগুলি বীররসের উদ্দীপনার এবং হাসির গান। অবশ্য কবি হাস্যরসের গান বিশেষ রচনা করেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে বলিয়াছেন—"য়ুরোপের প্রত্যেক গান একটি বিশেষ ব্যক্তি সে আপনার মধ্যে প্রধানতঃ আত্মমর্য্যাদাই প্রকাশ করে। ভারতে প্রত্যেক গান একটি বিশেষ জাতীয়, সে আপনার মধ্যে জাতিমর্য্যাদাই প্রকাশ করে।"

উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে দক্ষিণী সুরের পার্থক্য অনেক, তাহাদের সংমিশ্রণও নিষিদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণী সুরের অনুকরণে বাংলা গানে সুর-সংযোজন করিলেন—এ বিষয়ে তাঁহার পরিবারের অনেকেই তাঁহার পূর্বসূরির কাজ করিয়াছেন। অন্য ভারতীয় ভাষায় রচিত কয়েকটি গানেরও সুরের অনুরূপে রবীন্দ্রনাথ বাংলা গান রচনা করিয়াছিলেন।

ছন্দের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি সম্পূর্ণ নূতন পরীক্ষা করিয়া সফলকাম হইয়াছিলেন। কবিতার ছন্দকে গানে বজায় রাখিয়াছিলেন—হৃদয় আমার নাচেরে, নীল নব ঘনে প্রভৃতি গানে। তাঁহার নব সৃষ্ট তালগুলির মধ্যে—**একাদশী তাল** (১১ মাত্রা)—কাঁপিছে দেহলতা থর থর, দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া। **নবতাল** (৯ মাত্রা)—ব্যাকুল বকুলের ফুলে, যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে ; প্রেমে প্রাণে গন্ধে, নিবিড় ঘন আঁধারে, দুয়ার মোর পথপাশে। **রূপকড়া** (৮ মাত্রা)—জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে, গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে, কতো অজানারে জানাইলে তুমি, জীবনে যতো পূজা, আমারে তুমি অশেষ, ঐ রে তরী দিল খুলে প্রভৃতি।

নবপঞ্চতাল (১৮ মাত্রা)—জননি, তোমার করুণ চরণখানি। **ঝম্পক** (৫মাত্রা) আমারে যদি জাগালে, পেয়েছি ছুটি বিদায়

দেহ, বিপদে মোরে রক্ষা করো, আবার এরা ঘিরেছে, শ্রাবণ ঘন গহন মোহে, কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো, ধায় যেন মোর, যেতে যেতে একলা পথে প্রভৃতি। **ষষ্ঠী** (৬ মাত্রা)—শ্যামল ছায়া নাই বা গেলে, আমার জ্বলেনি আলো, নিদ্রাহারা রাতের এ গান, আমার ভুবনতো আজ হলো কাঙাল, বিদায় নিয়ে গিয়েছিলাম প্রভৃতি।

এগুলির মাত্রা ভাগ ২+৪, তাহাকে উল্টাইয়া পৃথক ভাগের (৪+২) গান—হৃদয় আমার প্রকাশ হোলো। এই সমস্ত তালই রবীন্দ্রনাথের 'ব্রহ্মসঙ্গীত' এবং গীতাঞ্জলি রচনার সময় প্রথম রচিত হয়। অনেক গানে প্রথম অক্ষর ছাড়িয়া দ্বিতীয় অক্ষরে Stress দিয়া ছন্দোবৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন—(১) তুমি তো সেই যাবেই চলে, (২) আবার যদি ইচ্ছা করো, (৩) পূর্ণ চাঁদের মায়ায়, (৪) দখিন হাওয়া জাগো প্রভৃতি।

বাংলা গানে দুই প্রকার সঙ্গত সম্ভব—বিষ্ণুপুরী ঠেকা এবং ঢাকাই ঠেকা। রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গ সুরের আদর্শে রচিত গানগুলিতে প্রচলিত বিষ্ণুপুরী ঠেকাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহার মৃদুগতির নবতন গীতিভঙ্গীর উপযোগী সুরসঙ্গত তাহার দ্বারা সম্ভব নয়; সেজন্য—রবীন্দ্র-সঙ্গীত সঙ্গতের জন্য একটি বিশেষ তারের যন্ত্রের প্রয়োজন হয়।

সঙ্গীতের বন্ধন ও মুক্তি

আমাদের প্রাচীন সঙ্গীতের কতকগুলি নিয়মপ্রথা কবির মনোগত ছিল, আবার অনেকগুলির ব্যতিক্রম করিয়া তিনি সঙ্গীতের মুক্তিদানে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে তিনি তাঁহার গানের সংকলনের ভূমিকা স্বরূপ অনেক কথাই বলিয়াছিলেন। পূর্ব প্রবন্ধেই এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে।

সময়ানুবর্ত্তিতা—ভারতীয় সঙ্গীতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য তাহার সময়ানুরাগ। প্রতি রাগরাগিণীর গাহিবার এবং শুনিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সময় নির্দিষ্ট আছে। তাহার নির্দিষ্ট কালের বাহিরে সেই রাগিণীর চর্চা ভারতীয় সঙ্গীতে নিষিদ্ধ! প্রথমে সূচনায় ঋতু এবং সময়ের অনুবর্ত্তী করিয়া তাহাদের সৃষ্টি হয়, তাহার পর tradition অনুসারে আমাদের মন সেই রীতি স্বীকার করিয়া লইয়াছে। দরবারী আমলে যখন হিন্দু সঙ্গীত সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া নবরূপ লাভ করে—তখনও সেই কালানুযায়ী রাগিণীনির্দেশ বজায় থাকে। আমাদের বৈচিত্র্য-পিপাসী মন ষড়ঋতুর রূপপরিবর্ত্তনেও সারাদিনের নানা সময়ে নানা ভাবে আবিষ্ট হয়। সকালবেলায় শান্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে সুর মনে ভালো লাগিবে, সন্ধ্যার ম্লান নীরবতায় সে অনুভূতির হয় বদল। কবির উক্তি—"আমাদের গুণীরা ভৈরোঁতে টোড়িতে সুর বাঁধিয়া বলিলেন, ইহা সকালবেলার গান। কিন্তু তাহার মধ্যে সকালবেলার নবজাগ্রত সংসারের নানাবিধ ধ্বনির কি কোনো নকল দেখিতে পাওয়া যায়? কিছুমাত্র না। তবে ভৈঁরোকে টোড়িকে সকালবেলার রাগিণী বলিবার কী মানে হইল?

তাহার মানে এই, সকালবেলাকার সমস্ত শব্দ ও নিঃশব্দতার অন্তরতর সঙ্গীতটিকে গুণীরা তাঁহাদের অন্তঃকরণ দিয়া শুনিয়াছেন। সকাল-বেলাকার কোনো বহিরঙ্গের সঙ্গে এই সংগীতকে মিলাইবার চেষ্টা করিতে গেলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে।"

আমাদের শাস্ত্রমতে ভোরবেলা হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত প্রতি দণ্ড অনুসারে রাগরাগিণীর কালনির্দেশ এই রকম—(১) উষা (ভোর ৪টা হইতে সাড়ে ৫টা), সোহিনী, মালকোষ। (২) প্রভাত (সকাল সাড়ে ৫টা হইতে ৬টা)—ললিত (সাড়ে ৫টা হইতে সাড়ে ৬টা) ভৈঁরো, (৩) পূর্ব্বাহ্ণ (৬টা হইতে ৮টা) ভৈরবী, রামকেলী, (সকাল ৮টা হইতে ১০টা) বিভাস, দেবগিরি, কুকভ. আলেয়া, সরফরর্দা, (সকাল ১০টা হইতে ১২টা) সিন্ধু, কাফি, তোড়ি, আসোয়ারী, সিন্ধুরা, (৪) মধ্যাহ্ন (বেলা ১২টা হইতে ১টা) সারঙ্গ, গৌড়সারং ও সামন্তসারঙ্গ (বেলা ১টা হইতে ২টা) মূলতান, মূলতানী।

(৫) অপরাহ্ণ (বেলা ২টা হইতে ৪টা) বারোঁয়া, পিলু (বিকাল ৪টা হইতে ৬টা) পুরবী, গৌরী (৬) সন্ধ্যার রাগিণী পূরবীর সময় বর্দ্ধিত করা যায়; সায়াহ্ন (সন্ধ্যা ৬টা হইতে ১০টা) কল্যাণ, ইমণকল্যাণ, জয়-জয়ন্তী অহং, ভূপালী, ইমনভূপালী, হাম্বীর, শ্যাম, কেদারা।

(৭) রাত্রি (১০টা হইতে ১২টা) কানেড়া, বাগেশ্রী, সাহানা, পাহাড়ী, খাম্বাজ, ঝিঁঝিট, পরজ, বাহার, (৮) নিশীথ (রাত্রি ১২টা হইতে ৪টা) বেহাগ, শঙ্করা, বসন্ত, মেঘ, মেঘ-মল্লার, সুরট, সুরটমল্লার, দেশ, বসন্ত! (৯) সারাদিনমান—গৌড়মল্লার, বাউল সুর, কীর্ত্তন সুর।

কবিগুরু বলিয়াছেন:—

"আমাদের দেশের সংগীতের এই বিশেষত্বটি আমার কাছে বড়ো ভালো লাগে। আমাদের দেশে প্রভাত মধ্যাহ্ন অপরাহ্ণ সায়াহ্ন অর্ধ-রাত্রি ও বর্ষাবসন্তের রাগিণী রচিত হইয়াছে। সে রাগিণীর সবগুলি

সকলের কাছে ঠিক লাগিবে কিনা জানি না। তা হউক, কিন্তু বিশ্বেশ্বরের খাসমহলের গোপন নহবত খানায় যে কালে কালে ঋতুতে ঋতুতে নব নব রাগিণী বাজিতেছে, আমাদের গুণীদের অন্তঃকর্ণে তাহা প্রবেশ করিয়াছে। বাহিরের অন্তরালে যে একটি গভীরতর অন্তরের প্রকাশ আছে আমাদের দেশের টোড়ি-কানাড়া তাহাই জানাইতেছে।"

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ অংশটি এই নানা ঋতুর নানা বেলার গানেই বিরাজমান। রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর গানের নামকরণ করা যায়—**'ঋতুমঙ্গলের গান'**। প্রতি ঋতুতে তাহার প্রাকৃতিক পরিবেশে আমাদের মনে স্বতন্ত্র ও নূতন ভাবের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। প্রাচীন হিন্দুসঙ্গীতেও এই ঋতু অনুযায়ী রাগিণী নির্দেশ করা হইয়াছিল—

(১) গ্রীষ্ম—দীপক বা পঞ্চম রাগ এবং ললিতা, শোভিনী, কামোদী, কেদারী, কল্যাণী, ও ভূপালী রাগিণী (২) বর্ষা—মেঘ রাগ এবং মল্লারী, সৌরটী দেশাক্ষী, সারঙ্গী, মধুমাধবী ও বড়হংসিকা রাগিণী (৩) শরৎ—ভৈরব এবং ভৈরবী, রামকেলী, বঙ্গালী, কলিঙ্গা, মঙ্গলিকা ও সিন্ধু।

(৪) হেমন্ত—মালকোষ ও কৌশিকী, টঙ্কা, মুদ্রাকী, বাগীশ্বরী, নাটিকা ও গুর্জরী, (৫) শীত—শ্রীরাগ ও ধনাশ্রী ত্রিবণী, মালবী, গৌরী, জয়তশ্রী, মালবশ্রী (৬) বসন্ত—হিন্দোল ও পূরিয়া, জয়ন্তী, দেবগিরি, ককুভা, বেলাবলী প্রভৃতি। কবিও সাধ্যমত এই রীতি বজায় রাখিয়াছেন।

ভাবানুবর্ত্তিতা—গান হৃদয়াবেগের বহিঃপ্রকাশ! আমাদের অন্তরের ভাবোচ্ছ্বাসকে প্রকাশ করি কখনও কাব্যের মাধ্যমে, কখনও শিল্পকলার মাধ্যমে; কিন্তু সংগীতের মধ্য দিয়া তাহার প্রকাশ সর্ব্বাপেক্ষা আবেগাত্মক। আমাদের হৃদয়ভাবের বৈচিত্র্য আছে, সুতরাং একই সুরের মাধ্যমে তাহার নানারঙ্গ প্রকাশ সম্ভব নয়। বিভিন্ন সুর বিভিন্ন

মনোভাবকে প্রকাশ করে ; কিন্তু ভাষায় প্রকাশ অপেক্ষা অনেক গভীরতর প্রকাশ হয় সুরের সহায়তায়, সুরের ভাষায়। কবিগুরু বলিয়াছেন—

"কিন্তু সংগীতে তো আমরা তেমন করিয়া বাহিরের দিক দিয়া দেখিতে চাই না। প্রেমিক ঠিক্‌টি কেমন করিয়া অনুভব করিতেছে তাহা তো আমার জানিবার বিষয় নহে। সেই অনুভূতির অন্তরে অন্তরে যে-সংগীতটি বাজিতেছে তাহাই আমরা গানে জানিতে চাই।"

এই ভাষাতীত সুরের শক্তি অতি প্রবল, Abstract-কে concrete-এ পরিণত করিবার ক্ষমতা একমাত্র সুরেরই আছে। রস বস্তুর অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় সুরও সহজ ভাবে সোজাসুজি তাহার বক্তব্যকে প্রকাশ করে না ; যতটুকু বলে তাহার চেয়ে অনেক অংশই বলে না, সেইটুকুই কল্পনা করিয়া লইতে হয়, ভাষাতীত ভাবব্যঞ্জনাতেই তাহার সার্থকতা। কবির কথায়—

"আমাদের হৃদয়োচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই আমাদের কণ্ঠস্বরের বেগ কখনো মৃদু কখনো প্রবল হইয়া উঠে। কিন্তু, গান তো স্বভাবের নকল নহে ; কেন না, গান আর অভিনয় তো এক জিনিষ নয়। অভিনয়কে যদি গানের সঙ্গে মিলিত করি তবে গানের বিশুদ্ধ শক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া দেওয়া হয়।"

গানে হৃদয়ভাবকে সুরেরই সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে প্রকাশ করাই বিধেয় ; অভিনয় বা action-এর সাহায্য গ্রহণ করা রবীন্দ্রনাথের মতে কলা-লক্ষ্মীর অপমান, তাঁহার কার্য্যের গণ্ডীতে অন্য রসের অনধিকার প্রবেশ—

"আমরা অশ্রুবর্ষণ করিয়া কাঁদি ও হাস্য করিয়া আনন্দ করি, ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু, দুঃখের গানে গায়ক যদি সেই অশ্রুপাতের ও সুখের গানে হাস্যধ্বনির সহায়তা গ্রহণ করে, তবে তাহাতে সংগীতের সরস্বতীর অবমাননা করা হয় সন্দেহ নাই।"

কিন্তু তাহা স্বাভাবিক নয় ; সুর কেবল শ্রোতার উপভোগের জন্য নয়, গায়কেরও ভাব প্রকাশের পথ। আমাদের কীর্তনগানের বিরহের সুর কেবল শ্রোতাদের নয়, চিরকাল গায়ককেও সমানে কাঁদাইয়া আসিতেছে। বিলাতী হাসির গানে গায়ককে শ্রোতাদের সঙ্গে হাসিতে যোগদান করিতে হয়। গীতিনাট্য বা যাত্রার বেলায় হৃদয় ভাবের সুর-সহযোগে শুধু নয়, সুরে এম্ফেসিস দিয়া প্রকাশই প্রধান অবলম্বন। কবি তাহার প্রতিবাদ করেন—

"কিন্তু সুরে ও কণ্ঠে জোর দিয়া, ঝোঁক দিয়া, হৃদয়াবেগের নকল করিতে গেলে সংগীতের সেই গভীরতাকে বাধা দেওয়া হয়। সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটার মতো সংগীতের নিজের একটা উঠানামা আছে, কিন্তু সে তাহার নিজেরই জিনিষ, কবিতার ছন্দের মতো সে তাহার সৌন্দর্য্যনৃত্যের পদবিক্ষেপ, তাহা আমাদের হৃদয়াবেগের পুতুলনাচের খেলা নহে।"

কবির 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র সকল সুরের সৃষ্টিই কিন্তু এইভাবে। সুরের এই শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন ভাবপ্রকাশের অধিকার আমাদের শাস্ত্রে স্বীকার না করা হইলেও কবি তাঁহার গানে সুরকে নানারসের প্রকাশে কিছুটা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সংগীতের এ শ্রেণীর বন্ধনডোরের সন্ধান পাইয়াছিলেন কবি বিলিতি সংগীতের বিস্তৃত লীলাক্ষেত্র হইতে। পাশ্চাত্ত্য জগতের সকল সুরেই অভিনয়প্রবণতাই প্রধান সহায়! আমাদের দেশের সংগীতের বহিরঙ্গের আনন্দ-উৎসবের সঙ্গে সুরের ব্যবহারিক যোগ প্রায়ই নাই বলিলেই চলে। কারণ আমাদের গানের সুর সম্পূর্ণ বিষাদের। কবিও সেই কথাই বলেন—

"আমাদের সংগীত মানুষের জীবনলীলার ভিতর হইতে উঠে না, তাহার বাহির হইতে বহিয়া আসে। আমাদের বিবাহের রাত্রে

রশনচৌকিতে 'সাহানা' বাজে। কিন্তু, সেই সাহানার তানের মধ্যে যৌবনের চাঞ্চল্য কিছুমাত্র নাই; তাহা গম্ভীর, তাহার মীড়ের ভাঁজে ভাঁজে করুণা।"

ভাগবত মহিমাপ্রচারই আমাদের সঙ্গীতের একমাত্র উপজীব্য ছিল, উচ্চাঙ্গের হিন্দুস্থানী প্রাচীন ধ্রুপদ গান হইতে সুরু করিয়া পল্লীপ্রান্তের বাউল এবং কীর্ত্তন—সমস্ত গানেরই বিষয়বস্তু ছিল একই।

পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সঙ্গে পার্থক্যটি আরও দুস্তর। আমাদের সংগীতের বাহ্যরূপটি খুব বড় নয় অর্থাৎ তাহার কৌশলটাই একমাত্র অবলম্বন নয়; তাহার হৃদয়-ভাবের প্রকাশ-বৈচিত্র্যটাই প্রধান বিষয়। তবে অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে তাহার পার্থক্য কোথায়? গান কি আবৃত্তি করিলেও চলিতে পারে? কিন্তু গানের আয়োজনে আছে বহু বৈচিত্র্য,—তাহার সুররূপ, তাহার ছন্দোবৈচিত্র্য ও গতি, তাহার সুরভাষার স্বতন্ত্র অনুভূতি। পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতে আকৃতিগত লীলা-বৈচিত্র্যের অবকাশ নাই; তাহার Harmonyর চাপে বহিরঙ্গের রূপটি যান্ত্রিক; অন্তরঙ্গের রূপও অস্বচ্ছ। কবি বলেন, "আমার মনে হয়, বৃহৎ ব্যূহবদ্ধ সৈন্যদল যেমন করিয়া চলে এই সংগীতের গতি সেইরূপ; ইহাতে শক্তি আছে, কিন্তু লীলা নাই। কিন্তু, তাই বলিয়া সমস্ত য়ুরোপীয় সংগীত-পদার্থটাই যে এইশ্রেণীর, তাহা বলিলে সত্য বলা হইবে না। অর্থাৎ য়ুরোপীয় সংগীতে আকারের নৈপুণ্যই প্রধান, ভাবের রস প্রধান নহে, একথা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।"

কবি অবশ্য পাশ্চাত্য গানের নিগূঢ় রসের কথা ভোলেন নাই। তাহাদের গানের আবেদন তাহাদের দৈনন্দিন কর্ম্মজীবনের প্রতিচ্ছবি, আমাদের দেশের গানের আবেদনের মতন অপার্থিব, অপ্রাকৃত নয়। আমাদের গানের সঙ্গে জীবনের কর্ম্মচাঞ্চল্যের যোগ নাই, প্রয়োজনের

তাগিদ নাই; তাহার আবেদন সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনের আনন্দ। তাহাকে প্রতিদিনের নানা কাজে ব্যবহার করিতে গেলে তাহার স্বধর্ম্মচ্যুতি ঘটিবে। কবি বলেন—

"য়ুরোপের সংগীত যেন মানুষের বাস্তব জীবনের সঙ্গে বিচিত্রভাবে জড়িত। তাই দেখিতে পাই সকল রকমেরই ঘটনা ও বর্ণনা আশ্রয় করিয়া য়ুরোপে গানের সুর খাটানো চলে; আমাদের দিশি সুরে যদি সেরূপ করিতে যাই তবে অদ্‌ভুত হইয়া পড়ে, তাহাতে রস থাকে না। আমাদের গান যেন জীবনের প্রতিদিনের বেষ্টন অতিক্রম করিয়া যায়, এইজন্য তাহার মধ্যে এত করুণা এবং বৈরাগ্য; সেই রহস্যলোক বড়ো নিভৃত নির্জন গভীর—সেখানে ভোগীর আরামকুঞ্জ ও ভক্তের তপোবন রচিত আছে, কিন্তু সেখানে কর্মনিরত সংসারীর জন্য কোনো প্রকার সুব্যবস্থা নাই।"

এই কারণেই আমাদের শাস্ত্রানুগ গান কোনদিনই প্রাকৃত উপভোগের বস্তু হয় নাই, তাহাকে কাজের প্রয়োজনে লাগানো সম্ভব নয়। আর লৌকিক গান অর্থাৎ কীর্ত্তন, বাউল, ভাটিয়ালী প্রভৃতি গানেও সাংসারিক মূল্যের কোন সন্ধান মিলিবে না; তাহাতেও বৈরাগ্যেরই প্রতিচ্ছবি!

আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত—কবি চেষ্টা করিয়াছিলেন, সুরকে কাজে লাগাইতে, তাঁহার অনেক গানেরই ব্যবহারিক মূল্য আছে। কাজের গান, খেলার গান, চাষ করার গান, ফুল তুলিবার গান, জল আনিবার, গান, নাচের গান, উৎসবের গান প্রভৃতি নানা রঙ্গের গানের নাম এই প্রসঙ্গে করিতে হয়।

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবনের নানা উপলক্ষকে স্মরণীয় ও রোচনীয় করিবার জন্য তাঁহার বহু আনুষ্ঠানিক গান আছে। (১) হে নূতন দেখা দিক্ (২) হে চির নূতন—প্রভৃতি তাঁহার জন্মদিনের গান।

(১) সমুখে শান্তি পারাবার (২) মরণ সাগর পারে (৩) কে যায় অমৃতপথযাত্রী (৪) কেন রে এই দুয়ারটুকু (৫) ঐ মরণের সাগরপারে (৬) আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু—প্রভৃতি তাঁহার শোকদিবসের গান। নববর্ষ, বর্ষশেষ প্রভৃতি উপলক্ষে মাঙ্গলিক গান—এসো হে বৈশাখ, বর্ষ গেল বৃথা, বর্ষ ওই গেল চলে প্রভৃতি।

শিশুদের আশীর্ব্বাদে তাঁহার গান 'ইহাদের করো আশীর্ব্বাদ' (ঝিঁঝিট)।

চাষের গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—আমরা চাষ করি আনন্দে। আয় রে মোরা ফসল কাটি। ফিরে চল মাটির টানে।

যেমন— আমরা চাষ করি আনন্দে।
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধ্যে।
রৌদ্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে, বাঁশের বনে পাতা নড়ে,
বাতাস ওঠে ভ'রে ভ'রে চষা মাটির গন্ধে॥

১৩৩৬ সালের বর্ষামঙ্গলে বৃক্ষরোপণের গান—মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে, আয় আমাদের অঙ্গনে অতিথি বালক তরুর দল প্রভৃতি।

শুভ-বিবাহের উপলক্ষে ফরমাইশী গান অনেক—(১) জগতের পুরোহিত তুমি (খাম্বাজ), (২) তুমি হে প্রেমের রবি (জয়জয়ন্তী), (৩) দুই হৃদয়ের নদী ও শুভদিনে শুভক্ষণে (সাহানা), (৪) দুটি প্রাণ এক ঠাঁই (মিশ্র ছায়ানট), (৫) শুভদিনে এসেছে দোঁহে (বেহাগ) (৬) সুখে থাক আর সুখী কর (ইমন ভূপালী), (৭) যে তরণীখানি ভাসালে দুজনে (ভূপালী), (৮) দুজনে এক হ'য়ে যাও, (৯) তাঁহার অসীম মঙ্গললোক হ'তে, (১০) নবজীবনের যাত্রাপথে দাও (১১) প্রেমের মিলন দিনে সত্যসাক্ষী (১২) সুমঙ্গলী বধূ এবং (১৩) আজি এ সন্তান দুটি মিলিছে তোমার (জয়জয়ন্তী)।

অভিনন্দনের জন্য গান রচনা করিয়াছিলেন—'রাজ অধিরাজ তব ভালে' এবং 'বঙ্গজননী মন্দিরাঙ্গন মঙ্গলোজ্জ্বল আজ হে'। অতিথি জনের আমন্ত্রণে 'সবারে করি আহ্বান' দুর্ভিক্ষের ভিক্ষার জন্য 'আজি কাঁদে কারা ওই শুনা যায়,' অন্ধদের সাহায্যার্থে গীতোৎসবে রচনা করেন 'আলোকের পথে প্রভু'। বুদ্ধদেবের জন্মউৎসবে 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' এবং যীশুখৃষ্টের জন্মদিনে তাঁহার শ্রদ্ধাঞ্জলি 'একদিন যারা মেরেছিল তোমা গিয়ে এবং 'ওই মহামানব আসে' (ভৈরোঁ)।

এই শ্রেণীর কাজের গানের সৃষ্টি য়ুরোপীয় ভাবস্পর্শে। কবি বলেন—"আমার বিশ্বাস, সংগীতেও আমাদের সেই বাহিরের সংস্রব প্রয়োজনহইয়াছে। য়ুরোপীয় সংগীতের সঙ্গ ভালো করিয়া পরিচয় হইলে তবেই আমাদের সংগীতকে আমরা সত্য করিয়া বড়ো করিয় ব্যবহার করিতে শিখিব।"

ভানুসিংহ ঠাকুরের গান

রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্রমবিকাশের ধারায় ভানুসিংহঠাকুরের পদাবলী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবধারার অনুসরণে বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীতে কাব্য ও সঙ্গীতরচনার নবপ্রয়াস দেখা গিয়াছিল; শ্রীমধুসূদন শুধু ভাবের অনুকরণ করিয়াছিলেন 'ব্রজাঙ্গনা" কাব্যে, ভানুসিংহ ভাবে ও ভাষায় পদাবলী-সঙ্গীত-সাহিত্যকে নবজীবন দান করিয়াছিলেন।

সংখ্যায় যদিও অল্প, কিন্তু সুরলালিত্যে বিশেষতঃ কলঝঙ্কারে ভানুসিংহের কয়টি গান চিরকাল রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক।

কিশোর রবীন্দ্রনাথকে রসাবিষ্ট করিয়াছিল মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব কবিতার বিচিত্র ভাষা। বিদ্যাপতি ঠাকুরের মৈথিলী ভাষার পদ এবং পরবর্তী কবিগণের অনুসৃত ব্রজবুলিতে রচিত কীর্তনাঙ্গপদগুলির ভাষা, শব্দালঙ্কার, ভঙ্গীবৈচিত্র্য, সুরলালিত্য রবীন্দ্রনাথকে ব্রজভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

কবি এ সময়েই শ্রীশ মজুমদারের সহযোগিতায় 'পদরত্নাবলী' নামে বৈষ্ণবগানগুলির সংগ্রহ এবং সম্পাদনাও করিয়াছিলেন (১২৯২)।

বৈষ্ণব কবিগণের রসসাধনা ও তাঁহাদের পরমাত্মার প্রতি প্রেমার্তি প্রকাশ পাইয়াছিল পদাবলীতে। "গান দিয়ে যে তাঁহার চরণ ছোঁওয়া যায়"—এই সত্য অনুসরণ করিয়া এই মহাজনগণ সারা জীবন তপস্যা করিয়াছিলেন। ভানুসিংহের গানে কেবলমাত্র অন্ধ অনুকরণ ছাড়া কোন সাধনা নাই, আন্তরিকতাও নাই; মৌলিকতা ত নাই-ই। বৈষ্ণব পদাবলী ভক্ত কবিদের সাধন পথের পাথেয়; এগুলি

তাঁহাদের উপাস্যের উদ্দেশে গীতাঞ্জলিপ্রদান। বৈষ্ণব গীতির রচনায় ও উপভোগে তাই কেবলমাত্র ভক্তজনেরই অধিকার।

ভানুসিংহ ছদ্ম-প্রেমিক মাত্র, ভক্ত তো মোটেই নহেন। কাজেই একমাত্র শব্দচয়ন ও সেগুলির অনবদ্য বয়ন ব্যতীত ভানুসিংহের পদাবলী মহাজন পদাবলীর ধারারক্ষণের যোগ্যতা অর্জন করে নাই। সাহিত্যের দিক হইতে এই রচনাগুলির যে মূল্যই থাকুক, সঙ্গীতের দিক হইতে ইহার মূল্য যথেষ্ট। কীর্ত্তনের সুরে উদ্গীত না হইলেও পদাবলীর সুরের প্রতিধ্বনি আমাদের মুগ্ধ করে।

একটি বিষয়ে ভানুসিংহ বেশ বৈচিত্র্য আনিয়াছেন, মরণকে দয়িতরূপে কল্পনা করিয়া। ভানুসিংহের পদাবলীর প্রায় সবই বিরহের গান; এ রকম বিরহের হা-হুতাশ মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কবির একপ্রকার বিলাস মাত্র। তাহারই চরম অভিব্যক্তি 'মরণকে শ্যামরূপে আহ্বান'। ইহাও আসিয়াছে ইংরাজ রোমান্টিক কবিদের প্রভাবে।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদগুলি বৈষ্ণবপদাবলীর মতই কেবল পড়িয়া রস গ্রহণের জন্য নয়, যেন গাহিবার জন্যই রচিত; তাই গানের তালই ব্যবহৃত হইতেছে কবিতার ছন্দে, সুর আপনি রূপ পাইতেছে আবৃত্তিতেই!

মসৃণ চিক্কণ কথার আতিশয্যের জন্য অনেক সময় সুর ব্যাহত হইয়াছে। ভানু-সিংহের গানে ইহা একটি দোষ! পরবর্তীসময়ে যখন রবীন্দ্রনাথ ক্ষণিকা ও মহুয়ার বড় কবিতাগুলিতে সুরসংযোজন করিয়াছিলেন, তখন এইরূপ কথার বাহুল্যের জন্য গানের মধ্যবর্ত্তী সুরেরই নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ভানুসিংহের গানে রবীন্দ্রনাথ তাহা করেন নাই, কাজেই কয়েকটি গানে সুর ক্লান্তিতে নামিয়াছে।

কবি চ্যাটারটন 'T Rowlie' ছদ্মনামে মধ্যযুগীয় Romance অবলম্বনে কবিতা লিখিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহারই মত

'ভানুসিংহ' ছদ্মনামে Romantic বৈষ্ণব জগতে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। গানগুলির সেই Romantic Background মনে রাখিলে গানগুলিতে আরোপিত রসমাধুর্য্যের সন্ধান মিলিবে।

কথিত আছে, এই পদগুলি যখন প্রকাশিত হয় (১২৯২) তখন রসিকসমাজ এইগুলিকে কোন বিস্মৃত প্রাচীন কবির রচনা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'তে এই বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন—

"ভানুসিংহ যখন ভারতীতে বাহির হইতেছিল, ডাঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় তখন জার্মানীতে ছিলেন। তিনি য়ুরোপীয় সাহিত্যের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের দেশের গীতিকাব্য সম্বন্ধে একখানি চটি বই লিখিয়াছিলেন। তাহাতে ভানুসিংহকে তিনি প্রাচীন পদকর্তা-রূপে প্রচুর সম্মান দিয়াছিলেন।"

ভানুসিংহঠাকুরের গানের ভাবধারা বৈষ্ণব কবিগণের সম-গোত্রীয় নয় বলিয়া রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁহার 'ভানুসিংহ পদাবলী'র সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ ছিলেন। তাঁহার নিজের কথায়—

"ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কষিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে। তাহাতে আমাদের দেশি নহবতের প্রাণগলানো ঢালা সুর নাই, তাহা আজকালকার সস্তা আর্গিনের বিলাতী টুং টাং মাত্র।"

কবিতারূপে এগুলি হয়ত অনুকরণ মাত্র, কিন্তু সুরে এইগুলি সার্থক সৃষ্টি। সুরের জন্যই পদাবলীর পদগুলি কোনদিনই বিস্মৃত হইবে না—সুরই ভানুসিংহ কবির পদগুলির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিবে। সুরে যদিও রবীন্দ্রনাথের এমন কোনো চাতুর্য্য প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু সহজ সরল বলিয়াই তাহারা সার্থক হইয়াছে। ইহার আধা পরিচিত ভাষা সুরকে মিষ্টিক না করুক, রোমান্টিক করিয়া তুলিয়াছে।

ভানু-পদাবলীর সুর ভাবে ভাষায় পরবর্তী অনেক গানকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে।

এই পদাবলীর সুর যোজনা হইয়াছে রচনার অনেক পরে, ১৩১০ সালের কিছু পূর্বে ১০টি গানে সুর সংযুক্ত হইয়াছিল। অন্য গানগুলির সুরও হয়ত প্রচলিত ছিল, কিন্তু এখন তাহার সন্ধান মিলে না।

(১) শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা (স্বরলিপি—কেতকী); সুর—মল্লার। সাধারণ কীর্তনের ন্যায় "সজনী গো" বলিয়া গানটির একটি আঁখর আছে—স্বরলিপিতে তাহা বাদ দেওয়া হইয়াছে। মধ্যবর্তী স্বরভঙ্গ, অন্তরায় স্বরচ্ছেদ বহু স্থলে কীর্তনের কথা স্মরণে আনে। সুরের দ্রুত লয় এবং বর্ষার উপযোগী রিম্-ঝিম্ শব্দ বরষার জলধারার প্রতিধ্বনি জাগায়।

(২) মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান সুর—ভৈরবী; তাল—একতালা। পূর্বে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র গানটিতে সুর যোজিত করিয়াছিলেন। পরবর্তী সময়ে মধ্যে মধ্যে বিরতি সংস্থান করিয়া গানটির ভাবের ক্ষতি করিয়াছেন। (৩) কো তুঁহু বোলবি মোয়—গানের সুর ইমন কল্যাণ; একতালা। মরণ রে তুঁহু মম এবং এ গানের রীতি প্রায় একই।

(৪) শুনলো শুনলো বালিকা (স্বরলিপি—সরলাদেবী সম্পাদিত শত গান); সুর—ভৈরবী। তাল খেম্‌টা। ভৈরবী সুরে গানটিতে প্রভাতকালীন বিরহবেদনা মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে, মাঝে মাঝে সুরের মূর্চ্ছনায় যেন দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে স্বরের মাত্রা মূর্ত্ত হইতেছে।

(৫) সজনি সজনি রাধিকা লো (স্বরলিপি—শত গান) ইহার সুর—মাজ, তাল—কাওয়ালী। (৪+৪=৮ মাত্রা)। এই রাগে কবির আর কোন গান নাই।

(৬) গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে (স্বরলিপি গীতিমালা) গানটি

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "অশ্রুমতী" নাটকে ব্যবহৃত হয়। সুর— ঝিঁঝিট, কাওয়ালী।

(৭) আজু সখি মুহু মুহু (স্বরলিপি গীতিমালা) সুর বেহাগ, তাল কাওয়ালী। গানটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গীতিনাট্য "ধ্যানভঙ্গে" ব্যবহৃত হয় এবং সেই সময়ে তিনি সুরটি পরিমার্জিত করিয়াছিলেন।

(৮) "বসন্ত আওল রে ! মধুকর গুণ গুণ, অমুয়া মঞ্জরী"—গানটিরও সুর অপ্রচলিত, সুর—বাহার। (৯) সতিমির রজনী, সচকিত সজনী (মিশ্র জয়জয়ন্তী) এবং (১০) বজাওরে মোহন বাঁশী (মুলতান) প্রভৃতি গানের সুর বিশিষ্টতা অর্জন না করিলেও সুমধুর।

হৃদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে (ললিত), বাদল বরখন নীরদ গরজন (মল্লার) প্রভৃতি ভানুসিংহের অন্যগানগুলির সুর সম্ভবতঃ কবির প্রদত্ত নয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রচিত নয়, এমন আরও দুইটি ব্রজবুলি গানে সুর যোজনা করিয়াছিলেন। একটী বিদ্যাপতির প্রসিদ্ধ পদ—"এ সখি হমারি দুখের নাহি ওর," এবং অপরটী গোবিন্দ দাসের :—

সুন্দরী রাধে আওব বনি। ব্রজ-রমণীগণ মুকুট মণি ॥

বিদ্যাপতির পদটীর কথা রবীন্দ্রমানসে অক্ষয় হইয়া ছিল, বহুবার নানাসূত্রে তাহা স্মরণ করিয়াছেন। সুরসংযোজনের কথায় কবি উল্লেখ করিতেছেন—"কখনো বা ঘনঘোর বর্ষার দিনে হার্মোনিয়ম-যন্ত্রযোগে বিদ্যাপতির "ভরা বাদর মাহ ভাদর" পদটীতে মনের মতো সুর বসাইয়া বর্ষার রাগিণী গাহিতে গাহিতে বৃষ্টিপাত-মুখরিত জলধারাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন ক্ষ্যাপার মতো কাটাইয়া দিতাম।" বৈষ্ণব মহাজনদের যোজিত বিদ্যাপতির পদটীর প্রচলিত সুর—জয়জয়ন্তী মল্লার, একতালা। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার গানে মল্লারকেই ব্যবহার করিয়াছেন ; তাল রূপক।

অপর গানটি গোবিন্দ দাসের রচনা ; কিন্তু প্রচলিত পদাবলীতে ব্যবহৃত কবিতা বা পদটির সুর তিনি ল'ন নাই, রবীন্দ্রনাথের সুর-যোজিত পদটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "বসন্তলীলা" নাটকে আছে। প্রচলিত মহাজনী সুর ছিল ধীর লয় বেলোয়ার, তেওড়া ; ভানু-সিংহের সুর ভৈরবী, কাওয়ালী।

রবীন্দ্রনাথের এই গানগুলি কীর্ত্তনাঙ্গের গান নয়, বাংলার কীর্ত্তনের যে সকল ধারা প্রচলিত আছে তাহাদের কোনটির সঙ্গে এগুলির মিল নাই। কীর্ত্তনের আঁখর তাঁহার এসব গানে নাই।

বোধ হয়, ইচ্ছা করিয়াই রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহের গানগুলিকে কীর্ত্তনের সুরলয়ে রাখেন নাই ; রাখিলে গানগুলির বিশেষত্ব থাকিত না। গানগুলি ভারতীয় রাগসঙ্গীতের শুদ্ধধারায় রচিত, বিলাতী অথবা অশাস্ত্রীয় সুরের কোনই প্রভাব এইগুলিতে নাই।

ভানুসিংহের গান রবীন্দ্রনাথের অপরাপর সমস্ত গান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের নিজস্ব ধারার উদ্ভবের পূর্বে রচিত বলিয়া অথবা সুরের অনুকূল পদবিন্যাসের জন্য অথবা ভাষার বিজাতীয়তার জন্য, যে কারণেই হোক্, এগুলি বিশিষ্টতা অর্জন করিয়া রহিয়াছে।

কৈশোরকের গান

রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য সঙ্গীতপ্রতিভার পূর্ণবিকাশের পূর্ব্বেই নানাভাবে তাহার সূচনা দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। ভানুসিংহ ঠাকুরের গান ও বাল্মীকিপ্রতিভার পূর্বের যুগটি তাঁহার গানের উদ্যোগপর্ব (preparatory stage), কবি এ সময়ের নামকরণ করিয়াছিলেন—"কৈশোরকের যুগ।" কবিরূপে তখনও তিনি অপরিচিত, রবীন্দ্র সঙ্গীতের তখনও সুরখ্যাতি লাভ হয় নাই।

ঠাকুরবাড়ীর সুরলোকের সঙ্গীতপরিবেশে একটি কিশোর তখন সবেমাত্র যোগ দিয়াছেন, বাড়ীর সর্বত্র তখন সুরের হাওয়া বহিতেছে; দাদারা, দিদিরা আর আত্মীয়পরিজন সবাই সুরের চর্চায় রত। 'প্রভাত রবি' তাহার মধ্যে স্থান পাইতে ব্যগ্র হইলেন। দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সাগ্রহে সযত্নে হাত ধরিয়া তাঁহাকে দলে টানিয়া লইলেন।

সাগরেদের মত ওস্তাদের কাছে যাহাকে গান শেখা বলে, সেরূপ একনিষ্ঠভাবে গীতিচর্চা কবির ভাগ্যে কিন্তু কোনদিনই হয় নাই; বাড়ীর আদুরে ছোট ছেলে কোনদিনই শাসন শৃঙ্খলা বা বাধাবন্ধনের মধ্যে ধরা দেন নাই, পরিবেশের প্রভাব যথেষ্ট থাকিলেও সুরদীক্ষা তাঁহার জন্মগত। কবি বলিয়াছিলেন, তিনি বাল্যকালে চুরি করিয়া গান শিখিয়াছেন। শিখিবার মতো করিয়া গান তিনি কোনদিনই শিখিবার সুবিধা পান নাই, তাই কতকগুলি প্রাথমিক সুর-ভ্রান্তি তাঁহার গানে চিরকালই রহিয়া গেলো।

জ্যোতিরিন্দ্র কবির কণ্ঠে বীণাবাদিনীর আসনখানি দেখিয়াছিলেন'।

তিনিই কবির কণ্ঠে সুরলক্ষ্মীরও প্রতিষ্ঠা করিলেন, রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রথম যুগের গুরু দায়িত্ব ছিল সম্পূর্ণ তাঁহারই।

কথা রবীন্দ্রনাথের রচিত এবং সুর সম্পূর্ণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরিকল্পিত এমন গানও অনেক আছে; মিশ্র বাগেশ্রী, খেমটাতে এই রকম একটি গান—কে যেতেছিস্ আয়রে হেথা হৃদয়খানি যা' না দিয়ে।

(১) মা একবার দাঁড়াগো হেরি চন্দ্রানন (ভৈরবী, মধ্যমান) (২) খুলে দে তরণী (বাহার) (৩) সখা সাধিতে সাধাতে কত সুখ তাহা বুঝিলে না (গৌড় সারঙ, খেমটা) (৪) সেই তো বসন্ত ফিরে এল হৃদয়ের বসন্ত কোথায় (বাহার) (৫), প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন (আড়ানা) প্রভৃতি এই শ্রেণীর জ্যোতি-রবির মিলন-সঙ্গীত।

হিন্দী গান হইতে ভাঙ্গিয়া এই ধারায় দুই ভাইয়ে মিলিয়া প্রথম গান রচনা করিলেন—মোতিয়া ষাঙ্গা দে—ম্লানমুখে কেন বল প্রিয়ে (সুরট, তেওট)। জয়জয়ন্তী রাগিণীতে (কাওয়ালি) "ভাসিয়ে দে তরী তবে নীল সাগর'পরি"—গানটিও তাঁহাদের সম্মিলিত রচনা।

কবি নিজের সুরজ্ঞানের সম্বন্ধে চিরকালই কেমন যেন সন্দিগ্ধ ছিলেন। সঙ্গীতসঙ্ঘের বার্ষিক উৎসবের অভিভাষণে তিনি ভয়ে ভয়ে বলিয়াছেন—"তারপরে সহসা যখন সংবাদপত্রে দেখলেম, এ সভায় সর্বসাধারণের নিমন্ত্রণ আছে এবং আমার বক্তৃতার বিষয়টি হবে ভারতীয় সঙ্গীত,—তখন আমি বুঝিলেম মনে—এ আমার পক্ষে একটা সঙ্কট। বাল্যকাল থেকে আমি সকল বিদ্যালয়েরই পলাতক ছাত্র, সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের আবার হাজিরা বই দেখলে দেখা যাবে আমি অধিকাংশ কালই গরহাজির ছিলেম।" তাঁহার গান-সৃষ্টির ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই, বাহির হইতে তাগিদেই তিনি উৎসাহ পাইয়াছিলেন, বাড়ীতে গীতি অভিনয়ের জন্য, সঙ্গীত

পত্রিকার জন্য, দাদাদের নাটকের জন্য তাঁহার গানের ফরমাইস হইত। কথাগুলিই তিনি রচনা করিতেন এবং সুরটা কি ভাবে আসে কৌতূহলের সহিত তাহাই লক্ষ্য করিতেন। ছেলেবেলা হইতেই কবির সৌন্দর্য্যের জন্য খ্যাতি ছিল, মহিলামণ্ডলীর আসরে তাঁহার আমন্ত্রণ হইত। তিনি বলিয়াছেন—"আমি দুই-একটা গান গাহিলাম। তখন আমার বয়স অল্প, কণ্ঠস্বরও সিংহগর্জনের মতো সুগম্ভীর ছিল না। অনেকেই মাথা নাড়িয়া বলিলেন—তাইতো, ভারি মিষ্টি গলা!"

ডোয়র্কিন কোম্পানীর সঙ্গে ঠাকুরবাড়ীর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাহাদের ব্যয়ে 'বীণাবাদিনী' নামে একটি সঙ্গীত-পত্রিকা সম্পাদনা করিতেন, বাংলাদেশে তাহাই প্রথম সঙ্গীত-পত্রিকা। তাঁহাদের প্রথম জীবনের অধিকাংশ গানই এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেই গানগুলিই ১৩০৪ সালে 'স্বরলিপি গীতি-মালা'য় সঙ্কলিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী, অক্ষয় চৌধুরী এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৮টি গানের স্বরলিপি এইগুলিতে আছে; সব গানগুলির স্বরলিপিই জ্যোতিরিন্দ্রই করিয়াছিলেন। ভূমিকায় সম্পাদক বলিয়াছেন—"রবীন্দ্রনাথের লৌকিক প্রেমাদি-বিষয়ক ৬৮টি গানের অতি সহজ স্বরলিপি আছে।"

'বীণাবাদিনী'তে কেবলমাত্র তাঁহাদের বাড়ীর গানই বাহির হইত তাহা নয়, সেকালের সকল প্রসিদ্ধ গানেরই স্বরলিপি প্রকাশিত হইত; অতুলপ্রসাদ সেনেরও অনেক গানের স্বরলিপি শ্রীমতী সরলা দেবী এই পত্রিকায় করিয়াছিলেন।

বীণাবাদিনীর পর আর একটি সঙ্গীত মাসিক 'আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা' প্রতিভা দেবী প্রকাশ করেন (১৩২০ শ্রাবণ)। রবীন্দ্রনাথ নিজে স্বরলিপি করিতে জানিতেন না। (সম্প্রতি 'একি সত্য' গানের তাঁহার স্বকৃত একটি স্বরলিপি অবশ্য পাওয়া গিয়াছে।)

কিশোরী চাটুয্যের পাঁচালীগান হইতেই কবি প্রেরণা পাইয়াছিলেন তাঁহার 'কালমৃগয়া' এবং 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র। কবি বলিয়াছেন— "আমার পিতার অনুচর কিশোরী চাটুয্যে এককালে পাঁচালীর দলের গায়ক ছিল। সে আমাকে পাহাড়ে থাকিতে প্রায় বলিত— আহা দাদাজি, তোমাকে যদি দলে পাইতাম তবে পাঁচালীর দল এমন জমাইতে পারিতাম, সে আর কি বলিব। শুনিয়া আমার ভারি লোভ হইত—পাঁচালীর দলে ভিড়িয়া দেশ-দেশান্তরে গান গাহিয়া বেড়ানোটা মহা একটা সৌভাগ্য বলিয়া বোধ হইত। সেই কিশোরীর কাছে কতকগুলি পাঁচালীর গান শিখিয়াছিলাম, 'ওরে ভাই, জানকীরে দিয়ে এসো বন', 'প্রাণ তো অন্ত হল আমার কমল আঁখি,' 'ভাবো শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে নিতান্ত কৃতান্ত-ভয়ান্ত হবে তবে।"—

কবির স্মৃতির সেই পাঁচালী গানগুলির অধিকাংশই 'দাশরথি রায়ে'র রচনা; দাশু রায়ের গ্রাম্য সুরের সঙ্গে বিশ্বকবির সম্বন্ধ সেইখানেই। সেইরূপ দুটি গান—

সুরট—কাওয়ালী

ওরে ভাই, জানকীরে দিয়ে এস বন।
যে লক্ষণ করি নিরীক্ষণ, রে লক্ষ্মণ! বিপদ ঘটিল বিলক্ষণ!

আলিয়া—একতালা

প্রাণ তো অন্ত হ'লো আজি আমার কমল আঁখি।
একবার হৃদয় কমলে দাঁড়াও দেখি॥

রবীন্দ্রনাথের রচিত প্রথম গান সরোজিনী (১৮৭৫) নাটকের 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা'। ইহার সুরটি (অহং একতালা) জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই সংযোজিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলিতেছেন—"রাজপুতমহিলাদের চিতা-প্রবেশের যে একটি দৃশ্য আছে, তাহাতে পূর্বে আমি গদ্যে একটা বক্তৃতা রচনা করিয়া দিয়াছিলাম। গদ্য রচনাটি এখানে

একেবারেই খাপ খায় নাই বুঝিয়া কিশোর রবি আমার ঘরে আসিয়া হাজির। রবীন্দ্রনাথ সেই বক্তৃতাটির পরিবর্ত্তে একটা গান রচনা করিয়া দিবার ভার লইলেন এবং তখনই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা' গানটি রচনা করিয়া আনিয়া আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' নাটকে রবীন্দ্রনাথের আরও একটি আদিম গান সংকলন করা হইয়াছিল, এইটিরও স্থর সংযোজনা জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই (খাম্বাজ একতালা)। পাঞ্জাবের পুরু রাজার সৈন্যগণের সমর গান—

একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন। এক কার্য্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।

দেশপ্রেমের উদ্দীপনা কবি অল্প বয়স হইতে গানে প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। প্রথম যুগে হিন্দুমেলা এবং অন্যান্য জাতীয় আন্দোলনের জন্য রচিত তাঁহার বহু স্বদেশী গান আজ বিস্মৃত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে (১) ভারত রে তোর কলঙ্কিত (ভৈরবী), (২) অয়ি বিষাদিনী বীণা (বাহার), (৩) শোনো শোনো আমাদের ব্যথা (দেশখাম্বাজ), (৬) একী অন্ধকারে এ ভারতভূমি, (৫) ঢাকো রে মুখচন্দ্রমা (গৌড়মল্লার), (৬) দেশে দেশে ভ্রমি তব (বাহার), (৭) কেন চেয়ে আছ গো মা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

কৈশোরের আর একটি গান "শুন নলিনী, খোলো গো আঁখি" (ললিত খেমটা) সাবলীলগতি' প্রভাত-সঙ্গীতে'র কবিতার ধারায় রচিত—

শুন নলিনী খোলো গো আঁখি, ঘুম এখনো ভাঙিল না কি,
দেখো, তোমারি দুয়ার-পরে, সখি, এসেছে তোমারি রবি।

ঠিক্ এই ভঙ্গীতেই রচনা তাঁহার একটি অপ্রচলিত গান গৌরী রাগিণী, কাওয়ালিতে—

আমি স্বপনে রয়েছি ভোর, সখি, আমারে জাগায়ো না।

আমার সাধের পাখী—যারে নয়নে নয়নে রাখি।

'ছয়' মাত্রার 'খেমটা'ই ছিল কবির কৈশোরকের অতিপ্রচলিত তাল: আরও একটি এই তালের 'কালাংড়া' রাগিণীর গান আজ অপরিচিত রহিয়া গিয়াছে—

ভালবাসিলে যদি সে ভাল না বাসে কেন সে দেখা দিল।

বিহারীলাল চক্রবর্তীকে বলা হয় রবীন্দ্রনাথের কবিগুরু! কবিও সে কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্বীকার করিয়াছেন, Romantic ভাবময় কাব্যসঙ্গীত-লোকের সৃষ্টি প্রথম এই দেশে বিহারীলালেরই প্রতিভায়। কবির কৈশোরের সুরে তাঁহার প্রভাব আছে। কবির উক্তি—"তিনি ভাবে ভোর হইয়া কবিতা শুনাইতেন, গানও গাহিতেন। গলায় যে তাঁহার খুব বেশী সুর ছিল তাহা নহে, একেবারে বেসুরাও তিনি ছিলেন না—যে সুরটা তিনি গাহিতেছেন তাহার একটা আন্দাজ পাওয়া যাইত। তাঁহার কণ্ঠের সেই গানগুলি এখনো মনে পড়ে—'বালা খেলা করে চাঁদের কিরণে', 'কেরে বালা কিরণময়ী ব্রহ্মরন্ধ্রে বিহরে।' তাঁহার গানে সুর বসাইয়া আমিও তাঁহাকে কখনো কখনো শুনাইয়া যাইতাম।"

বিহারীলালের যে গানটির কথা কবি স্মরণ করিয়াছেন সেটি—

বালা, খেলা করে চাঁদের কিরণে, ধরে না হাসিরাশি আননে।

ঝুরু ঝুরু মৃদু বায় কুন্তল উড়িয়ে যায়,

চাঁদা আয় আয়, আয় চায়—গগনে। (কালাংড়া,—খেম্‌টা)

'বাল্মীকি-প্রতিভা'র কোনো কোনো গানে 'সারদামঙ্গলে'র ভাব ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে।

মেজ দাদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমেদাবাদে কবি কিছুদিন ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত গানের যুগের সূচনা হয়; কবি বলেন—

"শুক্লপক্ষের গভীর রাত্রে সেই নদীর দিকের প্রকাণ্ড ছাদটাতে একলা ঘুরিয়া বেড়ানো আমার একটা উপসর্গ ছিল। এই ছাদের উপর নিশাচর্য করিবার সময়ই আমার নিজের সুর দেওয়া সর্বপ্রথম গানগুলি রচনা করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে, 'বলি ও আমার গোলাপ বালা' গানটি এখনো আমার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আসন রাখিয়াছে।" সেই গানটি—'বলি ও আমার গোলাপবালা' বেহাগ, খেমটায় রচিত।

ছোট বেলায় কেন জানি না, 'গোলাপ ফুলটি' কবির গানে বিশেষ আদর পাইয়াছে! আরো দুটি গোলাপের গান—বল গোলাপ মোরে বল (পিলু) এবং গোলাপ হোথা ফুটিয়ে আছে (পিলু)।

কবি বলিতেছেন—"এইরূপ একটা রাত্রে আমি যেমন-খুশি ভাঙ্গা ছন্দে একটা গান তৈরী করিয়াছিলাম—তাহার প্রথম লাইন উদ্ধৃত করিতেছি—নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়, ধীরে ধীরে অতি ধীরে গাও গো। ইহার বাকি অংশ পরে ভদ্র ছন্দে বাঁধিয়া পরিবর্ত্তিত করিয়া তখনকার গানের বহিতে ছাপাইয়াছিলাম" ।—

'নীরব রজনী দেখো' গানটির সুর (মিশ্র আড়াঠেকা) জ্যোতিরিন্দ্র-নাথেরই সংযোজিত। 'বলি ও আমার গোলাপবালা'—রবীন্দ্রনাথের কথা ও সংযোজিত সুরের প্রথম গান।

কবির সঙ্গীত-প্রতিভার পরিচয় প্রথম দেশবাসীকে দিয়াছিলেন 'সঙ্গীত মুক্তাবলী'তে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার ভবিষ্যৎ বাণী আজ সফল হইয়াছে—"ইহার সঙ্গীতে অনেক রকম নূতন সুর ও নূতন ভাব সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। কত যে সুন্দর জিনিস ইহা হইতে বাহির হইয়াছে এবং আরো কত যে বাহির হইবে কে বলিতে পারে ?"

রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য

প্রতিভা-স্পর্শে বহু তুচ্ছ গ্রাম্য বস্তুও সুন্দর হইয়া উঠিতে পারে! বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতি রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের স্পর্শে অপূর্ব রূপ পাইয়াছে। যাত্রা, কথকতা, পাঁচালী রবীন্দ্রনাথের হাতে এই যুগে নবজন্ম লাভ করিয়াছে। তাঁহার গীতিনাট্য এবং পালাগানগুলি আমাদের পুরাতন লৌকিক উৎসবাঙ্গেরই মার্জিত রূপ। তাঁহার নৃত্যনাট্যগুলিও বাংলার সেই পুরাতন গানের আসরের স্মৃতিই বহন করিতেছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ রূপটি প্রকাশ পাইয়াছে কাব্যে ও নাটকে। তাঁহার সঙ্গীত এই কাব্যেরই অন্তর্গত! কাব্য তাঁহাকে বিশ্বজয়ী করিয়াছে, সঙ্গীত তাঁহাকে জনবল্লভ করিয়াছে। নাটক তাঁহার মিষ্টিক সাধকতা ও আধ্যাত্মিক মনোভাবের পরিচয় দিয়াছে। গীতিনাট্যে তাঁহার প্রতিভার বিভিন্নদিকের শুভসম্মিলন ঘটিয়াছে; তাঁহার নাটকের মধ্যে গীতিনাট্যগুলিই চিরকাল জন-বল্লভতা অর্জ্জন করিয়াছে। প্রথম যৌবনের একটি গীতিনাট্যে তাঁহার যে প্রতিভার বিকাশ হয়, শেষজীবনে অন্য একটি গীতিনাট্যে সেই প্রতিভার পূর্ণপরিণতি দেখা যায়। 'বাল্মীকিপ্রতিভা' এবং 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা'র মধ্যবর্ত্তী সময়ে ফুটনোন্মুখ পদ্মের এক একটি দলের মত তাঁহার বিভিন্ন পালাগানগুলি বিকশিত হইয়াছে।

প্রাচীনকাল হইতে আমাদের দেশে যে যাত্রাগানের পালার প্রচলন ছিল, তাহাকেই আধুনিক রঙ্গালয়ের নাট্যাভিনয়ের প্রাথমিক রূপ মনে করা হয়। প্রাচীনতম যাত্রার পালা 'কৃষ্ণযাত্রা' বা 'কৃষ্ণ ধামালী',—বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' এই ধারারই নিদর্শন।

শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং এই যাত্রাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করিতেন। পরে বাংলার যাত্রার পালা তাঁহারই জীবন ও শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা অবলম্বনে রচিত হইতে লাগিল। বৈষ্ণবধর্ম্মের মহাসমারোহের যুগে বৃন্দাবনের রঙ্গলীলা বা 'কালীয়দমন' এবং 'নিমাই সন্ন্যাস' ছিল যাত্রার সর্বজনপ্রিয় অভিনয়; দর্শকগণ ধর্ম্মের আবরণে আনন্দই উপভোগ করিত। ইংরাজ আমলের প্রথম যুগে যাত্রগানের প্রধান পালা হইল প্রাকৃত প্রেমের 'বিদ্যাসুন্দর'—তাহার পর ক্রমেই নাট্যাভিনয়, যাত্রাভিনয়ের স্থান গ্রহণ করিল।

অপর একশ্রেণীর আসরের গানের প্রচলন ছিল, তাহাতে অভিনয় মুখ্য না হইয়া গল্পকাহিনীর সূত্রে গাঁথা গীতাবলীই প্রধান লক্ষ্য হইয়াছিল। এইগুলিকে বলা যায় 'পালাগান'! পাঁচালী, পালাকীর্ত্তন প্রভৃতি এই ধারার অন্তর্গত। মঙ্গলগানগুলি (চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল) এই পালাগানের প্রাচীনতম নিদর্শন; মনসামঙ্গল, পূর্ব্ববঙ্গে 'মনসার ভাসান' নামে আজও প্রচলিত। এই পালাগানগুলিতে মূল গায়ন থাকিত একজনই; যাত্রার মতন ঘটনাসংস্থানের মধ্য দিয়া ঐগুলি রূপায়িত হইত না, গায়ক নিজেই পাঁচালীগানে নানাবেশে আসরে যাতায়াত করিতেন। অঙ্গচালনার দ্বারা রূপাভিনয় (Action) পাঁচালী গানের বিশেষত্ব। কীর্ত্তনের পালার আসরে সাধারণতঃ অভিনয়কে যথাসম্ভব এড়াইয়া যাওয়া হইত। কীর্ত্তনের পালার কাহিনীও আগাগোড়া সুরেই সংগ্রথিত।

পাঁচালীগান হইতেই তর্জা-আর্য্যা এবং কবির গানের উদ্ভব। সুরে প্রশ্নোত্তর ও বাদানুবাদ তর্জা-গানের বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন চর্য্যাগানের রহস্যময় ইঙ্গিতকেই আর্য্যা গান বহন করিয়া আনিতেছে, তর্জাগানের আধ্যাত্মিক রহস্যময়তা নাই, আছে কেবল প্রহেলিকার চঙটা।

থিয়েটারের যুগে যাত্রা অপাংক্তেয় হইয়া গেল, তখনই উদ্ভব

হইল গীতাভিনয়ের। গীতাভিনয়ের নাট্যে অর্থাৎ গীতিনাট্যে প্রাচীন বাংলার গানের সকল ধারারই অনুবর্ত্তন হইয়াছে। য়ুরোপীয় অপেরার (Opera) অনুকরণে সেই সময়ে গীতাভিনয় সৃষ্টি হইত। হোরেসিয়ম লবেডফ নামে একজন রুশ বাংলা নাট্যাভিনয়ের সূত্রপাত করেন। সেই সময়ে 'সহুরের যাত্রা'রও প্রচলন হইয়াছে, নূতন নূতন যাত্রার পালার সৃষ্টি হইতেছে, এইগুলির মধ্যে গীতিনাট্য 'কমলেকামিনী', 'নলদময়ন্তী', 'দক্ষযজ্ঞ' প্রভৃতি জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছিল। হরিমোহন রায় ছিলেন সেইযুগের শ্রেষ্ঠ অপেরা-রচয়িতা; তাঁহার নিজের কথায়—"অপেরা অর্থাৎ বিশুদ্ধ গীতিকা, এ পর্য্যন্ত কেহই প্রণয়ন করেন নাই। বহু দিবস হইল, আমি জানকীবিলাপ নামে একখানি গীতিকা রচনা করি। স্বর্গীয় বাবু শ্যামাচরণ মল্লিক মহাশয় নিজ ব্যয়ে সমধিক উৎসাহের সহিত উক্ত গীতিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন। ফলতঃ তৎকালে জানকী-বিলাপখানি কথঞ্চিৎ অপেরার আদর্শস্বরূপ হইয়াছিল।"

রাজকৃষ্ণ রায় গীতিনাট্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যুগ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরই আধুনিক গীতিনাট্যের প্রবর্ত্তক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রায় সকল বিষয়েই রবীন্দ্রনাথের অগ্রগামী এবং পথপ্রদর্শক, তাঁহার গীতিনাট্যের অনুকরণেই কবির অনুপ্রেরণা। 'ভারত সঙ্গীত সমাজ' নামে একটি গীতিসংসদের অভিনয় উপলক্ষে তাঁহার রচিত তিনটি পূর্ণাঙ্গ গীতিনাট্য সুবিখ্যাত—পুনর্বসন্ত (১৮৯৯), বসন্তলীলা ও ধ্যানভঙ্গ (১৯০০)। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য—বাল্মীকিপ্রতিভা (১৮৮১) এবং কালমৃগয়া (১৮৮২) তাহার পূর্ব্বেই রচিত—এই দুইটিতেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার কথা কবি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রের পুনর্বসন্ত, ধ্যানভঙ্গ এবং বসন্তলীলার আর

রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের গীতিনাট্যের Technique, গতিপ্রকৃতি এবং সুর-প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ একই রীতির, গানের সূত্রে গাঁথা হইত নাট্যের মালা, নাটকের জন্যই হইত গানের আয়োজন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পিয়ানোর সুরে এই নাটক দুইটির গানের সৃষ্টি, তাঁহার কথায় "এই সময়ে পিয়ানো বাজাইয়া নানাবিধ সুর রচনা করিতাম। সুরের অনুরূপ গান তৈরী হইত। সাহিত্য এবং সঙ্গীতচর্চায় আমাদের তেতলা মহলের আবহাওয়া তখন দিবারাত্রি সমভাবে পূর্ণ হইয়া থাকিত। রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বপ্রথম রচনা কালমৃগয়া গীতিনাট্য এবং তাঁহার দ্বিতীয় রচনা বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্যেও উক্তরূপে রচিত সুরের অনেক গান দেওয়া হইয়াছিল।"

হৃদয়ভাবকে সুরে প্রকাশ এই গীতিনাট্যগুলির বিশেষত্ব! নানাশ্রেণীর সুরের সাহায্যে, নানারাগরাগিণী এবং ছন্দ অবলম্বনে বিভিন্নপ্রকার মনোভাবের প্রকাশ করা হইয়াছে; আক্ষেপ, বিদ্বেষ ঘৃণা, অনুরাগ, উল্লাস প্রভৃতি সকল শ্রেণীর মনোভাব বিভিন্ন সুরের সাহায্যে প্রকাশ করা হইয়াছে!

কবির উক্তি "যাঁহারা এই গীতিনাট্যের অভিনয় করিয়াছেন, তাঁহারা আশা করি একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সঙ্গীতকে এইরূপেই নাট্যকার্য্যে নিযুক্ত করাটা অসঙ্গত বা নিস্ফল হয় নাই। বাল্মীকি প্রতিভা গীতিনাট্যের ইহাই বিশেষত্ব। য়ুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে বাল্মীকি প্রতিভা তাহা নহে। ইহা সুরে নাটিকা অর্থাৎ সঙ্গীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্য বিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র। স্বতন্ত্র সঙ্গীতের মাধুর্য্য ইহার অতি অল্পস্থলেই আছে।" এই নাটক হইতেই কবির জয়যাত্রার সূত্রপাত।

মায়ার খেলা সম্পূর্ণরূপে কবির নিজস্ব সুরের ধারানুবর্ত্তী। মায়ার খেলার নাট্য-বিষয় অসংবদ্ধ, সুরেই তাহার পরিপূর্ণ সার্থকতা! "ইহার অনেক কাল পরে মায়ার খেলা বলিয়া আর একটা গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম, কিন্তু সেটা ভিন্নজাতের জিনিষ। তাহাতে নাট্য মুখ্য নহে, গৎই মুখ্য। বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ। বস্তুতঃ মায়ার খেলা যখন লিখিয়াছিলাম তখন গানের রসেই সমস্ত মন অভিষিক্ত হইয়া ছিল।" (রবীন্দ্রনাথ)

মায়ার খেলার গানগুলি বিচ্ছিন্নভাবেই সুন্দর, কিন্তু সমগ্র নাটকটি এমন একটা মেয়েলী ন্যাকামিভরা, যে অভিনয়ে স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব অনুভূত হয়। অবশ্য নাটকটি মেয়েদের জন্যই রচিত, 'সখী-সমিতি' নামে একটি মহিলাসংসদের অভিনয়ের জন্যই মায়ার খেলা রচিত হয়। এইরকম মেয়েলি ঢঙের সখীনাট্য ঠাকুরবাড়ীতে পূর্ব্বে আরও রচিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে একটি স্বর্ণকুমারী দেবীর 'বসন্ত উৎসব' (১৮৮০), অন্যটি জ্যোতিরিন্দ্রের 'মানময়ী'। বসন্ত উৎসবের কাহিনী 'মায়ার খেলারই' ধরণের, দুই সখী এবং দুই সখার প্রণয়ের ও মিলনবিরহের কাহিনী। সরলাদেবী এই গীতিনাট্যের অভিনয়ের উল্লেখ করিতেছেন—"রবীন্দ্রনাথের বিলেত নিবাসকালেই আমার মায়ের রচিত বসন্ত উৎসব গীতিনাট্যের অভিনয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অধ্যক্ষতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল।" তাঁহাদের বাড়ীর গীতিঅভিনয় পরিচালনা করিতেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। দ্বিতীয়টির সম্বন্ধে তাঁহারই জীবনস্মৃতিতে বলা হইয়াছে (পৃঃ ১৫৭)—"জ্যোতিবাবু সুর রচনা করিতেছিলেন ও অক্ষয়বাবু ক্রমান্বয়ে তাহার সঙ্গে একটির পর একটি গান বাঁধিয়া যাইতেছিলেন।

এই একদিনকার রচিত গানগুলি হইতেই, পরে মানময়ী নামে একখানি গীতিনাট্য প্রস্তুত হইয়াছিল।” মানময়ীরই মার্জিত রূপ পুনর্বসন্ত। ‘বিবাহ উৎসব’ নামে আর একটি কবিভ্রাতৃদ্বয়ের রচিত গীতিনাট্যের কথা ইন্দিরা দেবী উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের এসব নাটকের অধিকাংশই জ্যোতিরিন্দ্র-প্রবর্তিত সংসদগুলিতে অভিনীত হইয়াছিল।

জ্যোতিরিন্দ্রের গীতিনাট্যগুলিতেও কবির রচিত বহু গান আছে।

মায়ার খেলার সঙ্গে রবীন্দ্র-গীতিনাট্যের প্রথম যুগের অবসান; তাহার পর বহু দিন পরে শেষজীবনে কবি পূর্ণাঙ্গ তিনখানি গীতিনাট্য রচনা করেন—কিন্তু এইগুলির পরিচয় ‘নৃত্য-নাট্যের’ নামে! কিন্তু কবি নিজে নাচিতে জানিতেন না এবং নৃত্য সম্বন্ধে তাঁহার ধারণাও স্পষ্ট ছিল না। সেই কারণে এইগুলিকে ‘‘নৃত্যনাট্য’ না বলিয়া গীতিনাট্য বলিলে অন্যায় হইবে না। তবে চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা, এবং চণ্ডালিকার গানের সুর এবং ছন্দ নৃত্যের লীলাগতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

‘নটীর পূজা’ এবং নৃত্যনাট্য তিনটির কাহিনীতে বেশ বৈচিত্র্য আছে, প্রতিটিই নাটকরূপে সার্থক! ‘নটীর পূজা’ এবং ‘ফাল্গুনী’কেও তাঁহার পূর্ণাঙ্গ গীতিনাট্যের মধ্যে ধরা যায়। কবির সমস্ত নাটকই গীতিপুষ্প সুরভিত। অনেক নাটকেই গীতিবাহুল্য নাট্যরসের কিছুটা অন্তরায় সৃষ্টি করে, বিশেষতঃ রূপকনাট্য (Symbolical) গুলিতে গীতিবাহুল্য অন্তর্নিহিত তত্ত্বের বাধাস্বরূপ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সামাজিক নাটকগুলিতে অনেক সময় আবার গানের সুরে ভাবপ্রকাশের সহায়তাও হইয়াছে।

বিদেশী নাটকের কোরাস দলের অনুকরণে কবির প্রায় সকল নাটকেই একটি করিয়া গানের দল আছে; এই দলের অধিনায়ক রূপে আসিয়াছে কখনও ‘দাঠাকুর’, কখনও বা ‘ঠাকুরদাদা’, কখনও

বা 'ধনঞ্জয় বৈরাগী'। বাল্মীকিপ্রতিভা এবং কালমৃগয়া গীতিনাট্যে এই গানের দলের অংশ গ্রহণ করিয়াছে বনদেবীগণ, মায়ার খেলায় মায়াকুমারীগণ আর রূপক নাট্যগুলিতে ঠাকুরদাদার চেলার দল।

আর একটি ভিন্ন শ্রেণীর গানের পালা রবীন্দ্রনাথের আছে—এইগুলির নাট্যবিষয়টি অত্যন্ত ক্ষীণ—গানগুলি সূক্ষ্ম বাচনরীতিতে গাঁথা হইয়াছে, সূত্রধারের বা গ্রন্থিকের সুরবিহীন ভাষণই সম্বল; এইগুলিকে গীতিনাট্য না বলিয়া 'গানের পালা' বলাই ভালো। এই শ্রেণীর গানের পালা—নবীন, শ্রাবণ গাথা, বর্ষামঙ্গল, শেষবর্ষণ, বসন্ত, সুন্দর, গীতোৎসব প্রভৃতি। এইগুলির মধ্যে 'শাপমোচন' একটু বিচিত্র ভঙ্গীর, রীতিতে 'নবীন' প্রভৃতির সমশ্রেণীর হইলেও ইহার গানগুলির বৈশিষ্ট্য নৃত্যরঙ্গে। কবি বলিয়াছেন—"ভাবটা এই, মনের নানা গভীর আকাঙ্ক্ষা কাহিনীতে রূপকে গানে রূপ নেয় ছন্দে বন্ধে, সঙ্গ রচনা করে কল্পনায়, বস্তুজগৎ থেকে ক্ষণকালের ছুটি নিয়ে কল্পজগতে করে লীলা।" এই পালাগুলিকে বলা যায় তাঁহার গানের চয়নিকা! পূর্ব্বরচিত বিভিন্ন সময়ের এবং অন্যান্য গীতিনাটিকা হইতেই কবি গানের সংকলন করিয়াছিলেন। 'নটরাজের ঋতুরঙ্গশালা' এবং 'ঋতুরঙ্গ' এই পালাগানগুলির মধ্যে বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়াছে, ষড়ঋতুর লীলা-বৈচিত্র্য সুরে ছন্দে রূপায়িত হইয়াছে। কবি বলিয়াছেন—"নটরাজের তাণ্ডবে তাঁহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্ত্তিত হইয়া প্রকাশ পায়, তাঁহার অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হইতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়। নটরাজ পালাগানের এই মর্ম্ম।"

রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর পালাগানের তিনটি অঙ্গ—নৃত্য, গীত

এবং আবৃত্তি। তাঁহার প্রায় সকল ঋতু-গানই এই পালাগুলির অন্তর্গত। রাজা, শারদোৎসব, ঋণশোধ, রক্তকরবীকেও তাঁহার এই ঋতুরঙ্গের গানের পালার পর্য্যায়ে ধরা যায়, কিন্তু এইগুলির রূপকের আবরণে গভীর তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন আছে। রাজা বসন্তের, রক্তকরবী হেমন্তের এবং ঋণশোধ ও শারদোৎসব শরতের গানের সঞ্চয়িতা।

পালাগানগুলি তাঁহার নানা ঢঙের রঙ্গলীলার প্রকাশক, এই গুলিতে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি ঋতুউৎসবে যোগদান করিয়াছে, যেমন রাজা, কবিশেখর, অর্থসচিব আছেন, সেই সঙ্গে নটরাজ ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ, বেণুবন, আম্রকুঞ্জ, শালবীথি, দখিন হাওয়া, বকুল, পারুল, মাধবী, পূর্ণিমাচাঁদ, মালতী, অশোক, পলাশ রঙ্গক্ষেত্রে ভীড় করিয়া আছে। ঋতুনিসর্গ কখনও রুদ্রতাপসের ভূমিকায়, কখনও বাদল বাউলের ভূমিকায়, কখনও শারদলক্ষ্মীর রূপে, হেমন্ত সন্ধ্যায় অবগুণ্ঠিত বদনে, শীতে কৃপণের বেশে, বসন্তে রাজার ভূমিকায় আসাযাওয়া করিতেছে। পালাগানের শেষে নটরাজ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলেন—"তারপরে, প্রশ্নের উত্তর নেই, সব চুপ। এই তো সৃষ্টির লীলা। এতো কৃপণের পুঁজি নয়, এ যে আনন্দের অমিতব্যয়। মুকুল ধরেও যেমন ঝরেও তেমনি। বাঁশীতে যদি গান বেজে থাকে সেই তো চরম। তার পরে ? কেউ চুপ ক'রে শোনে, কেউ গলা ছেড়ে তর্ক করে। কেউ মনে রাখে, কেউ ভোলে, কেউ ব্যঙ্গ করে। তাতে কী আসে যায় ?

গান আমার যায় ভেসে যায়। চাস্‌নে ফিরে দে তারে বিদায়॥"

রবীন্দ্রনাথের রাগসঙ্গীত

সঙ্গীতের মূল আধিপত্য কথার নয়—সুরের; সুরের বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্যের দ্বারাই গানের মূল্য নিরূপণ হয়। রবীন্দ্রনাথের গান সুমিষ্ট বাণীর জন্য অপূর্ব্ব হইলেও, তাহার সুরের আভিজাত্যও কম নয়।

ভারতীয় রাগসঙ্গীতের পক্ষে তাহার সুরের গণ্ডীর বাহিরে যাওয়া চলেনা, নির্দিষ্ট নিয়মের ব্যতিক্রম করা রীতিমতো অসম্ভব ব্যাপার। ওস্তাদ হিন্দুস্থানী গায়করা সুরকৌশল দেখাইতেন, সুরকে খেলাইতে পারিতেন; কিন্তু তাহার কৌলীন্যে হস্তক্ষেপ করার অধিকার তাঁহাদের ছিল না। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত তাই সকলের উপভোগের বস্তু হইয়া উঠিতে পারে নাই, সম্ভ্রমের পাত্র হইয়াই রহিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"উপমা যদি দেওয়া চলে তাহলে বলতে হবে ঐ সঙ্গীতে আছে একটি একটি রত্নের কৌটা। ওস্তাদ জহুরী ঘটা করে প্যাঁচ দিয়ে দিয়ে তার ঢাকা খোলে। আলোর ছটায় ছটায় তাক লাগিয়ে দিকে দিকে তাকে ঘুরিয়ে দেখায়।"

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তাই সুরবিপ্লবের সম্ভাবনা ছিল কম। হৃদয়-ভাবকে সুরে প্রকাশ করিবার জন্য সুর ছাড়া আর কোন আয়োজনই ছিল না; সেই কারণে সুরে বৈচিত্র্যও ছিল না—হিন্দুস্থানী গানের কালোয়াতরা নিজেদের অন্তরাত্মাকে গানের সঙ্গে যুক্ত করিতে পারিতেন না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গানে কণ্ঠের সঙ্গে অন্তরাত্মার যোগ-সাধন করিয়াছেন। তাঁহার গান এই ভাবেই নবতম সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে; প্রচলিত সুর-কাঠামোকে গ্রহণ করিয়া তাহাকে নবকলেবরে রূপায়িত করিয়াছেন, নানা বর্ণে সুসজ্জিত করিয়াছেন, নব নব

রাগিণীর মিশ্রণ ঘটাইয়াছেন, নব নব ছন্দে, নব নব ভঙ্গীতে, নব নব রীতির প্রবর্ত্তনে সঙ্গীতকলাকে সমৃদ্ধতর করিয়াছেন। তাঁহার গানের অপূর্ব্ব কাব্যবাণী অবশ্য এই বৈচিত্র্যের প্রধান সহায়ক, কিন্তু তাই বলিয়া সুরের সঙ্গে যে বাণীর রাজযোটক হয়না সে বাণী তিনি সংযোগ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—

"আমার গানের কবিতাগুলিতে বাক্যের আসুরিকতাকে আমি প্রশ্রয় দিইনি, অর্থাৎ সেই সব ভাব, সেই সব কথা ব্যবহার করেছি সুরের সঙ্গে যারা সমানভাবে আসন ভাগ ক'রে বসবার জন্যেই প্রতীক্ষা করে।"

তাঁহার অধিকাংশ গানে কাব্যবাণীর প্রাধান্য সত্বেও বহু গানেই সুরই মুখ্য, বিশুদ্ধ সুরকে সেগুলি সুন্দর প্রকাশ দান করিয়াছে। বিশুদ্ধ সুরে রচিত কবির উচ্চাঙ্গের রাগসঙ্গীতের নিদর্শন স্বরূপ উল্লেখ করা যায়—(১) অমৃতের সাগরে (কামোদ, ধামার) (২) আনন্দধারা বহিছে ভুবনে (মালকোষ) (৩) আবার এরা ঘিরেছে (টোড়ি: ঝম্পক) (৪) ঐ দেখা যায় আনন্দধাম (সিন্ধু বিজয়) (৫) কামনা করি একান্তে (দেশকার), (৬) কেন বাণী তব নাহি শুনি (ভৈঁরো), (৭) কেরে ওই ডাকিছে (আলাহিয়া), (৮) জয় তব বিচিত্র আনন্দ (বৃন্দাবনী সারঙ), (৯) জীবনে আমার যত আনন্দ (নায়কী কানাড়া) (১০) নূতন প্রাণ দাও (নাচারী টোড়ি) (১১) বিমল আনন্দে জাগো (বাহাদুরী টোড়ি) (১২) ভুবন হইতে ভুবন বাসী এবং তাঁরে আরতি করে (বড়হংস সারঙ) (১৩) যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি (কানাড়া) (১৪) রাজপুরীতে বাজায় বাঁশী (মূলতান) (১৫) এসো হে গৃহদেবতা (আনন্দ ভৈরবী) (১৬) দিন যদি হলো অবসান; আবার এরা ঘিরেছে (বৈরাগী টোড়ি) (১৭) জননি, তোমার করুণ চরণ

খানি (গুণকেলি) (১৮) মনে যে আশা লয়ে (মেঘাবলী) প্রভৃতি। এসব গানে কবির সুরপ্রচেষ্টা প্রশংসনীয় হইলেও কৃতিত্ব বিশেষ নাই।

রাগসঙ্গীতের সৌষ্ঠব নির্ভর করে কণ্ঠের সৌকুমার্য্যের উপরই। দুর্লভ কবিশক্তির মতন অপূর্ব্ব সৌকণ্ঠ্যেরও তিনি অধিকারী ছিলেন। প্রথম বয়সে যে কোন উচ্চাঙ্গের সুরকে তিনি অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিতেন, তাঁহার কণ্ঠে উদ্গীত হইয়া সকল সুরই আপনা হইতে বৈচিত্র্য অর্জন করিত। সে যুগের সাক্ষিণী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর ভাষায়—"প্রথম বয়সে তিনি মধ্যমে বা পঞ্চমে ছাড়া কখনও গান ধরতেন না, এবং অবলীলাক্রমে তারা সপ্তকের 'নি' পর্য্যন্ত গলা চড়াতে পারতেন, যদিও সাধারণতঃ আমাদের গানে দেড় সপ্তকের বেশী লাগে না।"

কবির কণ্ঠের সম্বন্ধে নিজেরও একটি প্রচ্ছন্ন গর্ব্ববোধ ছিল; বহু সময়ে তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন—"আমার অল্পবয়সের সে-গলা আর নাই, তোমাদের এখন আর কী শোনাব? পেয়েছিলুম বটে একটা গলার মত গলা! কিন্তু ভগবান দিয়ে কেড়ে নিয়েছেন, এখন কি আর গাইতে ইচ্ছে করে? × × × তখন মধ্যমে ধরে ছেড়ে দিতুম সুর, পাখীর মত সে উড়ে চলত সুরের ধাপে ধাপে পর্দায় পর্দায়। এখন কী আর গলার সে অবাধ গতি আছে যে গাইতে ইচ্ছে করবে?"

ঠাকুরবাড়ীতে যে সকল নানা শ্রেণীর গুণী সঙ্গীতজ্ঞরা আসিতেন, তাঁহাদের দ্বারাই প্রথম তিনি গীতিরসে অনুপ্রাণিত হ'ন।

উচ্চাঙ্গের হিন্দুস্থানী ধ্রুপদের সুর ও ছন্দ অবলম্বনে ব্রাহ্মসমাজে প্রার্থনার জন্য সেই সময়ে বহু ব্রহ্মসঙ্গীত রচিত হয়। রবীন্দ্রনাথও প্রথম বয়সে প্রচলিত ধারায় এই শ্রেণীর ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন;

তবে এইগুলিতে তাঁহার নিজস্ব সুরকৃতিত্ব খুব বেশী প্রকাশ পায় নাই। অনুচিকীর্ষা কাটাইয়া উঠিবার তাগিদ তখনও পা'ন নাই।

পরবর্ত্তী কালে নব সৃষ্টির উদ্দীপনায় প্রচলিত প্রাচীন সুরকে ভাঙ্গিয়া, নানা রাগিণী মিশ্রণ করিয়া, নবনব তালের প্রচলন করিয়া সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তিনি এক বিপ্লব আনিয়া ফেলিলেন। হিন্দুস্থানী সুরের ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়াই অবশ্য তাঁহার এ সঙ্গীতের শস্য ফলান; সে কথা তিনি কখনও অস্বীকার করেন নাই—"হিন্দুস্থানী গানের সুরকে ত আমরা ছাড়িয়ে যেতে পারি-ই না। আমাকেও নিজের গানের সুরের জন্যে তার কাছেই হাত পাততে হয়েছে। আর এতে দোষের কিছুই নেই। কাজেকাজেই হিন্দুস্থানী গান ভাল করে শিখলে তার প্রভাবে যে বাংলা সঙ্গীতে আরও নতুন সৌন্দর্য্য আসবে এটাই ত আশা করা স্বাভাবিক।"

হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ পদ্ধতির সুরকে বাংলা কাব্যসঙ্গীতে প্রথম প্রয়োগ করেন রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু)। সঙ্গীত জগতে এই শ্রেণীর গানের নাম 'শোরী মিঞার টপ্পা'। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'মায়ার খেলার' সুর সৃষ্টির সময় আগাগোড়া এই রকম শোরী মিঞা এবং নিধুবাবুর টপ্পার সুরের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শোরী মিঞার সিন্ধু খাম্বাজে রচিত টপ্পা ছিল—

ও মিঞা বে জানেওয়ালে (তামু)
আল্লা কি কসম ফিরিয়া নয়নুওয়ালে॥

নিধুবাবু অনুকরণ করিলেন—যে যাতনা যতনে মনে মনে মন জানে
পাছে লোকে হাসে শুনে—লাজে প্রকাশ করিনে॥

রবীন্দ্রনাথ সুরে তাঁহাদের উভয়ের রীতির সংমিশ্রণ করিলেন—

এ পরবাসে রবে কে হায়॥ (মধ্যমান)

রবীন্দ্রনাথের সুরের বৈচিত্র্যের সূত্রপাত হইয়াছে রাগিণী মিশ্রণে,

নানা প্রকার পরীক্ষামূলক (Experimental) রীতি (Style) প্রবর্তনে। অনেকে মনে করেন রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ অবদান এই সুরমিশ্রণেই আছে।

শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন—"সৃষ্টিপ্রকরণ যে মিশ্রণে, সেটা অতি প্রাচীনকাল থেকেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল আমাদের দেশে। যে ভাবে রাগরাগিণী ধরা-বাঁধা ছাঁদে বেঁধে দেওয়া হয়েছে (Standardised) প্রাচীন ভারতে তা ছিল না। তখনকার সুরস্রষ্টারা নতুন রাগসৃষ্টির নব নব সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথও এঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন।"

নিজস্ব রীতিতে রাগিণী মিশ্র করিয়া কবি যে সকল বিশিষ্ট সুর এ সকল গানে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ মৌলিক; যেমন—আকুল কেশে আসে (মিশ্র বারোঁয়া ও ভৈঁরো) শোন শোন আমাদের ব্যথা (দেশ—খাম্বাজ) আমার গোধূলিলগন (ইমন—পূরবী) আমার মিলনলাগি (বাহার—বাগেশ্রী) তোমার নামে নয়ন মেলিনু (আশা ভৈঁরো) হৃদয় নন্দন বনে (ললিতা গৌরী) এ শুধু অলস মায়া, খরবায়ু বয় বেগে, ভুবনেশ্বর হে (ইমন ভূপালী) হেমন্তে কোন বসন্তেরি বাণী, আকাশ জুড়ে শুনিনু (বেহাগ খাম্বাজ) যে রাতে মোর দুয়ার গুলি (সাহানা—বাহার) প্রভৃতি। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত assimilate করিয়া কবি এ ভাবেই তাঁহার গানে বাংলার বাণী সুষমা বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন করিয়া ভগীরথের মতন সুর সুরধুনী বহাইয়াছেন।

প্রথম বয়সের অনেক গানেও এইরূপ সুর মিশ্রণ পাওয়া যায়, তবে সেগুলি এমন কিছু বিপ্লবাত্মক হয় নাই। মিশ্রিত রাগিণী দুইটি পৃথক পৃথক ভাবেই রূপায়িত হইয়াছে, সম্মিলিত হইয়া তৃতীয় একটি বিশিষ্ট সুরে পরিণত হয় নাই। প্রথম যুগের মিশ্র

সুরের গান; যেমন—আমার যা আছে আমি সকলি দিতে পারি (দেশ-সিন্ধু), সখি ভাবনা কাহারে বলে (বেহাগ খাম্বাজ), বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি (আশাবরী ভৈরবী), প্রতিদিন তব গাথা গাব আমি সুমধুর (ঝিলফপিলু বারোঁয়া) প্রভৃতি।

মধ্যযুগে ষট্ বা ছয় প্রভাতী রাগিণী ললিত, বিভাস, রামকেলী, আশাবরী, যোগিয়া এবং ভৈরবীর মিশ্রণের সুরে অনেকগুলি গান রচনা করেন, ইহার মধ্যে—(১) আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে—, (২) আমার যাবার সময় হল, (৩) আঁধার রজনী পোহালো, (৪) ওকে কেন কাঁদালি, (৫) আলোর অমল কমল খানি, (৬) আমাদের যাত্রা হলো সুরু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শেষ গানটিতে ভৈরবী প্রাধান্য পাইয়াছে।

ঐ ছয়টির অপেক্ষা কম প্রভাতকালীন রাগিণী ব্যবহার হইলে বলা হয় 'প্রভাতী'। এ সুরের গান—(১) যাওরে অনন্তধামে, (২) হে মোর চিত্ত, (৩) মোর প্রভাতের এই প্রথম ক্ষণের প্রভৃতি।

গীতাঞ্জলির অধিকাংশ গানের সুরেই একাধিক রাগিণীর ছায়াপাত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে এই কয়টি গানের উল্লেখ করা যায়; যেমন—আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই (মিশ্র কামোদ), দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া, যদি তোমার দেখা না পাই, আজি ঝড়ের রাতে (সিন্ধু কাফি), তোরা শুনিস্ নি কি (সিন্ধু বারোঁয়া), উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে (টোড়ি ভৈরবী), এবার ভাসিয়ে দিতে হবে (হাম্বীর কল্যাণ), বসন্ত জাগ্রত দ্বারে (খাম্বাজ বাহার) প্রভৃতি।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে তাঁহার রাগিণী-মিশ্রণ জটিলতর হইয়া আসিয়াছিল। এক রাগের কোন একটি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অন্যান্য রাগিণীর নানা বৈশিষ্ট্য সম্মিলিত করিয়া সুরে কবি বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। একমাত্র বর্ষার বিশিষ্ট রাগিণী মল্লারকেই ভিত্তি করিয়া কবি নানাভাবে সুরসৌন্দর্য্য রচনা করেন; প্রসঙ্গতঃ—

ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো, বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল, হৃদয় আমার নাচেরে, আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে, আমার যেদিন ভেসে গেছে প্রভৃতি গান উল্লেখযোগ্য।

তানসেনের মিঞামল্লারে রচিত 'বলোরে পাপিহারা' গানের অবলম্বনে রচিত 'কোথা যে উধাও হলো' অনুকৃত সুরকে অতিক্রম করিয়াছে বহুভাবেই। মল্লার রাগিণীর বৈচিত্র্য সৃষ্টি আজ পর্যন্ত বহুগুণীই করিয়াছেন—তাঁহাদের প্রত্যেকের নামের সঙ্গে স্ব স্ব রাগিণীর নাম যুক্ত করা হইয়াছে। যেমন—বকৃস্থমল্লার, মীরাবাঈ-কি মল্লার, সুরদাসী মল্লার, রামদাসী মল্লার, চর্জু-কি মল্লার, ধুন্ধী-কি মল্লার, নারায়ণী মল্লার, অরুণ মল্লার, পূরণ মল্লার, নট মল্লার, গৌড় মল্লার; জয়ন্ত মল্লার, সন্ত-কি মল্লার প্রভৃতি। কবির বিশিষ্ট মল্লারকেও এ রকম 'রবিমল্লার' আখ্যা দেওয়া যায়।

'অশ্রুভরা বেদনা' রীতিমতো কৌশলের গান। ইহার সুর জৌনপুরী টোড়ি এবং খাম্বাজের মিশ্রণে রচিত, এই শ্রেণীর মিশ্রণ পূর্বে প্রচলিত ছিল না। 'নিভৃত প্রাণের দেবতা' গানটি হিন্দুস্থানী ওস্তাদের নির্দেশিত 'পূর্বী কল্যাণী'তে রচিত। জৌনপুরী টোড়ির রূপান্তর সিন্ধুড়াতে গান ছিল, 'না যেয়ো না'; সিন্ধুড়া এবং খাম্বাজের মিশ্রণে রচিত হইল 'ধনে জনে আছি জড়ায়ে'। এই রকম খাঁটি দরবারী সুরে রচিত গান তাঁহার শেষ যুগেও আছে—শুনি ঐ রুনুঝুনু পায়ে পায়ে নূপুরধ্বনি (দরবারী কানাড়া, ঝং), ঝরঝর বরিষে বারিধারা (মিঞা মল্লার) প্রভৃতি।

সুরের মিশ্রণে কবি সব সময়ে লক্ষ্য রাখিতেন রাগিণীর রস-সুসঙ্গতি। 'ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর প্রভাত অম্বর মাঝে' একটি গম্ভীর ভাবের গান—মূল রাগ ভৈঁরো, কোমল 'নি' দিয়া অবরোহণে ভৈরবী সুরের মিশ্রণ হইয়াছে। 'আমার জীবন পাত্র উচ্ছলিয়া

মাধুরী করেছ দান' করুণ ভাবের গান। ইহারও সুরে ভৈরবী ফুটিয়াছে কোমল গান্ধারে ; এই গানের মূল রাগ ছিল রামকেলী।

কবি শেষ পর্য্যন্ত একসঙ্গে চার পাঁচটি রাগিণীও এজন্য ব্যবহার করিতে লাগিলেন, যেমন (১) অকারণে অবেলায় মোর পড়্‌ল— পিলু+বাঁরোয়া+সাহানা+মল্লার। (২) অরূপ তোমার বাণী—আলেয়া+ছায়ানট+কেদারা+বেহাগ+হাম্বীর+ভৈরবী। (৩) কখন দিলে পরায়ে—ভৈরবী+ভৈরোঁ+পিলু+বারোঁয়া। শেষ গানটি একটি হিন্দী ভজন 'কিন্থে দেখা কানাইয়া' অবলম্বনে রচিত।

পরজ, বসন্ত, এবং ভৈরবী তিনটি সুরের মিশ্রণে রচিত হয় 'অজানা খনির নূতন মণির গেঁথেছি হার' এবং 'কাহার গলায় পরাবি গানের রতন হার'। খাম্বাজ, পরজ, কালাংড়া এবং বেহাগের মিশ্রণে রচিত গান 'আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে'। 'ওগো কিশোর আজি' গানে চারটি রাগিণী ব্যবহৃত হইয়াছে ইমন, পিলু, খাম্বাজ ও কানাড়া।

গানের সুরের কতকগুলি ঠাট আছে, এই ঠাটগুলির উপরই ভিত্তি করিয়া গান রচিত হয়। কবি এ সম্বন্ধে বলিতেছেন "এই ঠাটগুলির আয়তনের উপরই গানরচয়িতার স্বাধীনতা নির্ভর করে। আমাদের দেশের গানের ঠাট এক একটা বড় বড় ফালি, তাকেই বলি রাগিণী। আজ সেই ফালিগুলাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সেই উপকরণে নিজের ইচ্ছামত কোঠা গড়িবার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু টুক্‌রাগুলি যতই টুক্‌রা হোক্ তাদের মধ্যে সেই আস্ত জিনিসটার একটা ব্যঞ্জনা আছে। তাদের জুড়িতে গেলে সেই আদিম আদর্শ আপনিই অনেকখানি আসিয়া পড়ে। সুতরাং যে ভাবেই গান রচনা করি এই রাগরাগিণীর রসটি তার সঙ্গে মিলিয়া থাকিবেই। আমাদের দেশের গান যেমন করিয়াই তৈরি হোক্‌না কেন রাগ

রাগিণী সেই সর্বব্যাপী আকাশের মত তাহাকে একটি বিশেষ নিত্যরস দান করিতে থাকিবে।" কবি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে এইভাবে ভাঙ্গিয়া নানাভাবে নব সৃষ্টির প্রয়াসী হইয়াছিলেন, "Classical আমাদের কাছে দাবী করে নিখুঁত পুনরাবৃত্তি। যে পূর্ণতা পূর্বতন রূপকে আপনাকে প্রকাশ করেছে সেই পূর্ণতাকে উত্তীর্ণ হয়ে আপনাকে যদি প্রকাশ করতে না পারি তাহলে ব্যর্থ হল আমাদের স্বরশিক্ষা।" এভাবেই তিনি সেই পূর্ণতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়াছেন। এ সুর তাঁহার নিজস্ব সৃষ্টি, তাহাতে রাগরাগিণীর বৈচিত্র্য থাকিলেও ব্যতিক্রম নাই—এই কথাই কবি বার বার বলিয়াছেন।

আমাদের গানের উল্লিখিত ঠাটগুলি মোটামুটি এই, সেই সঙ্গে কর্ণাটী এবং ইউরোপীয় অনুরূপ ঠাটের নাম করা হইল—

(১) বিলাবল ঠাট—কর্ণাটী শঙ্করাভরণ—Ionian Mode C—Major starting from C বেহাগ, শঙ্করা, দেশকার প্রভৃতি। (২) ইমন বা কল্যাণ শ্রেণী—কর্ণাটী কল্যাণী Lydian Mode Starting from F হাম্বীর, কেদারা, কামোদ, ইমন, ভূপালী, গৌড়সারঙ্গ, ইমন কল্যাণ। (৩) খাম্বাজ শ্রেণী—কর্ণাটী হরিকাম্বোধী Mixolydian Mode, starting from G ঝিঁঝিঁট জয়জয়ন্তী, খম্বাজ, দেশ। (৪) ভৈরব শ্রেণী, মায়ামালভগৌল Mixophrygian Mode : Accidental এই ঠাটের গান ভৈরোঁ, যোগিয়া, রামকেলি, বিভাস। (৫) পূরবী শ্রেণী- কর্ণাটী কামবর্দ্ধনী, এই ঠাটের রাগ শ্রী, গৌরী, পরজ, বসন্ত। (৬) কাফি শ্রেণী—কর্ণাটী খরহরপ্রিয়া Dorian Mode, Starting from D পিলু, সাহানা ভীমপলশ্রী, সারঙ্গ, বাহার, সিন্ধু। (৭) মারওয়ার শ্রেণী, কর্ণাটী গমনপ্রিয়া—এই ঠাটের গান হিন্দোল, পঞ্চম, ললিত।

(৮) আশাবরী শ্রেণী, কর্ণাটী নট-ভৈরবী, Aeolian Mode, এই ঠাটের গান আশাবরী, কানাড়া, আড়ানা। (৯) ভৈরবী শ্রেণী—কর্ণাটী হনুম তোড়ী Phrygian Mode, starting from E এই ঠাটের ভূপালী, মালকোষ, প্রভৃতি। (১০) তোড়ী শ্রেণী—কর্ণাটী শুভপন্তুভরালী, Aeolian Mode, starting from A এই ঠাটের রাগ গুর্জরী, মূলতানি, টোড়ি প্রভৃতি।

ভিন্ন শ্রেণীর ঠাটের মিশ্রণে স্বর হইয়া পড়ে বর্ণসঙ্কর, কিন্তু কবি মনে করেন এ সংযোগের ফলেই সৃষ্টি হইবে স্বরে শক্তি এবং সৌন্দর্য্য। "এরা বড়ো আদর্শ হতে বিচ্যুত হবেনা, তাদের জাত যাবে, জাতি কিন্তু যাবেনা। তারা সচল হবে, তাদের সাহস বাড়বে, নানারকমের সংযোগের দ্বারা তাদের মধ্যে নানাপ্রকার শক্তি ও সৌন্দর্য্য ফুটে উঠবে (রবীন্দ্রনাথ)।"

কাফি ঠাটের ভীমপলশ্রীর (বাদী মধ্যম, সম্বাদী ষড়জ; গা ও না কোমল) দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে। ভীমপলশ্রী, মুলতানী এবং ভৈরবীর মিশ্র স্বরের গান 'প্রখর তপন তাপে আকাশ তৃষায় কাঁপে' এবং 'যাবার বেলা শেষ কথাটি'। ভীমপলশ্রী কবির প্রথম যুগের গানে বেশি না থাকিলেও শেষ যুগের বহু গানের স্বরে মিশ্রিত হইয়া আছে। প্রথম যুগে রবীন্দ্রনাথের ভীমপলশ্রীর গান তেওরা তালে 'বিপুল তরঙ্গরে, দিন ফুরালো হে সংসারী এবং দাঁড়াও মন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড। এ রকম অন্য রাগিণী মিশ্রণে তাঁহার এই স্বরের অনেকগুলি গান আছে, যেমন—আকাশে আজ কোন চরণের আসা যাওয়া। আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে। যদি হায় জীবন পূরণ নাই হল প্রভৃতি।

কবি তাঁহার গানের স্বরে রাগিণীর চিরাচরিত নিয়ম প্রথার কিছু কিছু ব্যতিক্রম করিতেন, তাঁহার মতে—"যদি মধ্যমের স্থানে পঞ্চম

দিলে ভালো শুনায় আর তাহাতে বর্ণনীয় ভাবের সহায়তা করে, তবে জয়জয়ন্তী বাঁচুক বা মরুক, আমি পঞ্চমকেই বহাল রাখিব না কেন?"

এ ভাবে তিনি রাগিণীর স্বরবিন্যাসে নানাভাবে পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, ওস্তাদী মতে সেটা অপরাধ হইলেও তাই তাঁহার গানে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। হিন্দুস্থানী ওস্তাদদের অনেকেই অবশ্য কবির রাগসঙ্গীতের স্বরসৌষ্ঠবের প্রশংসাই করিতেন। দুই নিষাদ যোজিত কবির এক শ্রেণীর কেদারা রাগের গানের প্রসঙ্গে পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী বলিতেছেন—"এই কেদারে প্রাচীন গান আছে, তাহার মধ্যে বর্ষাবর্ণনই বেশী। পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের এই রাগে অনেক গান আছে। অনেকে অজ্ঞানবশতঃ সেগুলিকে নানা রাগের খিচুড়ী মনে করেন। পক্ষান্তরে, ইহাও ঠিক্ যে, নানাপ্রকার মিশ্রণ না হইলে বৈদিকযুগ হইতে এ পর্য্যন্ত এত রাগের উৎপত্তি হইত না।"

আশাবরীর গানে প্রাচীন রীতিতে অবরোহণে কোমল ঋষভ (রে) তাঁহার বহুগানে ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন—আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে। তোমার সুর শুনায়ে যে ঘুম ভাঙাও। এসো শরতের অমল মহিমা প্রভৃতি। ভৈঁরো ঠাটের অন্য রাগিণীর ন্যায় রামকেলিতেও তিনি বিশিষ্ট স্বর কড়ি মধ্যম বর্জন এবং কোমল গান্ধার ব্যবহার করিতেন। যেমন—তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে, মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্তদ্বারে প্রভৃতি। ভৈরোঁর সঙ্গে রামকেলির মিল করিয়াছেন পঞ্চম ও গান্ধার সংযোগ সাধনে—'আলোয় আলোকময় করে হে এলে'।

পূরবী ঠাটের গানের স্বরবিন্যাসে তিনি শুদ্ধ ধৈবতের সঙ্গে কোমল ধৈবত মিল করিতেন, যেমন—সন্ধ্যা হল গো মা। অশ্রুনদীর সুদূর পারে। গোধুলি লগনে মেঘে প্রভৃতি। পূরবী নামটিও কবিরই

দেওয়া ; আসলে এ রাগিণী পূর্বদেশীয় বা 'পূর্ব্বী' নামেই পরিচিত ছিল। এ রাগিণীর স্বরবিন্যাসের অপেক্ষাকৃত অল্প পরিচিত রূপটিই তিনি গ্রহণ করিয়া ছিলেন।

হিন্দুস্থানী ওস্তাদদের মতো এ যুগের বাঙ্গালী কলাবিদ্‌রাও কবির সুর বৈচিত্র্যের বিশ্লেষণ করিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন। হিমাংশু কুমার দত্ত বলিয়াছেন—"তিনি ভৈরবী রাগকেই এতো বিচিত্ররূপে প্রকাশ করেছেন যে তা ভাবলে অবাক হ'তে হয়। অতি প্রিয়জনও অনেকদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে পুরাণো হ'য়ে যায়, তখন তাকে নতুন সজ্জায় দেখলে যেমন অধিকতর সুন্দর মনে হয়, তেমনি এই আমাদের অতিপ্রিয় পুরাতন ভৈরবী রাগকে কবি নব সজ্জায় নবরূপে সাজিয়ে আমাদের কতো না আনন্দ দিয়েছেন।"

ভৈরবীতে কড়ি 'ম' বিবাদী স্বর এবং সমস্ত শুদ্ধ স্বর ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন—আমার রাত পোহাল।

বেহাগ এবং ভৈরবী কবির এ যুগের সর্বাপেক্ষা সমাদৃত রাগিণী। তাঁহার অধিকাংশ গানের উপর এ দুটি সুরের ছায়া পড়িয়াছে। তুমি একটু কেবল বস্‌তে দিও, আমার একটি কথা বাঁশী জানে, আমার রাত পোহালো প্রভৃতি ভৈরবী রাগিণীর গানে বিচিত্র ঢঙে পিলু, বিভাস প্রভৃতির প্রভাব আনা হইয়াছে। বেহাগ তাঁহার চিরকালই প্রিয়। ছেলেবেলার স্মৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"কখনো কখনো যখন মন আপনা হতে লেগেছে তখন গান আদায় করেছি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে। সেজদাদা বেহাগে আওড়াচ্ছেন 'অতি গজ গামিনীরে' আমি লুকিয়ে মনের মধ্যে তার ছাপ তুলে নিচ্ছি।"

কবির বেহাগের সুরও বিশিষ্টতা মণ্ডিত। রে ও ধা তিনি এ রাগের গানেও ব্যবহার করিয়াছেন, কড়ি মধ্যম বহুস্থলে এড়াইয়াছেন।

'আজি শরত তপনে' গানটি যোগিয়া বিভাসে রচিত। হিন্দুস্থানী ওস্তাদদের নির্দেশিত দেশকারকে বাংলায় বিভাস বলা হয়। এ ধরণের গান—আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ। আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে প্রভৃতি। কিন্তু 'শরত তপনে' গানের বিভাস সম্বন্ধে পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী বলিতেছেন "রবীন্দ্রনাথের কোন কোন গানে যোগিয়া বিভাস বলিয়া সুর নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু দেশকারের (বাঙলার বিভাসের) সঙ্গে যোগিয়া কি করিয়া মিশিতে পারে? যেহেতু উক্ত দেশকার বিভাসের সুর সমস্ত শুদ্ধ, যোগিয়াতে রা এবং ধা কোমল। অতএব যোগিয়ার সঙ্গে মিশাইতে হইলে কর্ণাটক বিভাসকেই গ্রহণ করিতে হয়।"

রাগরাগিনীর ঋতু, ভাব, কাল, প্রভৃতির বশ্যতার কতকগুলি চিরাচরিত প্রথা প্রচলন ছিল, এই convention রবীন্দ্রনাথ সুরে অনেক স্থলে ভাঙ্গিয়াছেন। বর্ষার গানে মল্লার ছাড়া অন্য সুরের রেওয়াজ ছিল না, কিন্তু কবি ইমন, বেহাগ প্রভৃতির ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন, ইমনের সুরে 'আজি বারি ঝরে ঝর ঝর ভরা বাদরে' (তেওড়া); কাফিতে 'আজি ঝরঝর মুখর বাদল দিনে,' বেহাগে 'আজি তোমার আবার চাই শুনাবারে', দীপক-সোহিনী—পঞ্চমে 'আজি বরিষণ মুখরিত শ্রাবণ রাতি' প্রভৃতি। বৃন্দাবনী সারঙ্গ বর্ষার রাগিণী তাহাকে প্রয়োগ করিয়াছেন উপাসনার গানে 'জয় তব বিচিত্র আনন্দ হে কবি।'

সময়ের আনুগত্য প্রথা রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছামতো অনেক জায়গায় ভাঙ্গিয়াছেন, ইহার ফলে নবতম সৃষ্টির সূচনা হইয়াছে। শাস্ত্র অনুসারে সারঙ মধ্যাহ্নের সুর (১২টা—২টা) এবং কানাড়া রাত্রির সুর (১০টা—১২টা) এই উভয় সুরের সম্মিলন করিয়াছেন 'চক্ষে আমার তৃষ্ণা; ওগো' গানে। সারঙ, কানাড়ার সঙ্গে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জল ঝরাইবার আকুলতা ফুটাইয়াছে মল্লারেরও সুর।

পিলু বারোঁয়া কারুণ্য ভাব প্রকাশের জন্য প্রসিদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের পিলু এবং বারোঁয়ার অর্থাৎ পিলুর খাদ সুর এবং বারোঁয়ার চড়া সুরের মিশ্রণে রচিত 'পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে। ছায়া ঘনাইছে বনে বনে। পুষ্প ফুটে কোন কুঞ্জ বনে' ইত্যাদি গানে কারুণ্য না ফুটিলেও উৎকণ্ঠার ভাব ফুটিয়াছে।

ঋতু বন্দনা বা নান্দীগানে ঋতুকালীন বিশিষ্ট রাগরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে; যেমন—নমো নমো হে বৈরাগী (গ্রীষ্ম)। নমো নমো নমো করুণাঘন (বর্ষা)। নির্মলকান্ত নমো এবং নব কুন্দধবল দল সুশীতলা (শরৎ)। নমো নমো তুমি ক্ষুধার্তজন শরণ্য (হেমন্ত)। নমো নমো নমো নির্দয় অতি করুণা (শীত) এবং নমো নমো তুমি সুন্দরতম (বসন্ত)।

রাগসঙ্গীতের সুরের সঙ্গে লোকসঙ্গীতের সুরেরও মিশ্রণ করিয়াছেন। বাউলগানের সুরে বিশেষতঃ সঞ্চারীতে রাগ সঙ্গীতের প্রয়োগ করিয়াছেন। বেহাগ, খাম্বাজ এবং ঝিঁঝিটের মিশ্রণে কীর্ত্তনে মায়ুর নামে একটি নূতন রাগিণীর সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথ এ সুরের নাম দিয়াছিলেন 'বেহাগড়া'। শুদ্ধ বেহাগে ধা সুর বর্জিত, বেহাগড়ায় 'ধ' সুর ব্যবহৃত হয়, এবং শুদ্ধ ও কোমল দুই নিখাদ লাগে! কবির এ সুরের একটি রাগসঙ্গীত আছে 'মনে রয়ে গেল মনের কথা'।

কবির এ শ্রেণীর রাগসঙ্গীত গুলি অনেকটা তাঁহার নিজস্ব সৃষ্টি। ব্রহ্ম সঙ্গীতের মতন ইহারা ধার করা সুরের নয়। এ শ্রেণীর গানের বৈচিত্র্য অনেক, তাহার মধ্যে (১) এ সব গানের গায়করা কিছু কিছু সুরবিহার করিবার অধিকার পাইয়াছেন। (২) এ সব গানে 'তান' ব্যবহার করা হয়। (৩) কাব্যের রূপের অপেক্ষা রাগিণীর রূপ প্রকাশই এ শ্রেণীর গানের লক্ষ্য; প্রত্যেকটি সুরসৌষম্য এবং রাগিণীবৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছে। যে সকল গানে রাগিণীর রূপটি

সুপরিস্ফুট সে সকল গানের মধ্যে কবি সুরের নাম করিয়া চাতুর্য্যের সঞ্চার করিয়াছেন। যেমন—'কেনরে এতই যাবার ত্বরা' ভৈরবীতে; বেহাগে 'ধূসর জীবনের গোধূলিতে', ছায়ানটে 'কোন গহন অরণ্যে তারে', ললিত বসন্তে 'আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ,' সাহানায় 'উদাসিনী বেশে বিদেশিনী কে,' প্রভৃতি গান উল্লেখনীয়।

(৭) এ গানগুলিতে ছন্দোবৈচিত্র্যও আছে। যেমন—অমল কমল সহজে জলের কোলে (বেহাগ), রসরূপ প্রকাশের জন্য একতালাকে লঘু চালে ব্যবহার করা হয়। আবার 'আজি যত তারা তব আকাশে' (লুম খাম্বাজ) ঠুংরিকে দ্রুত চালে ব্যবহার করার নির্দ্দেশ আছে।

রাগরাগিণীর রূপগুলি তাঁহার মনের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। তাহারা কেবল তাঁহার চিত্তকে উদ্‌বুদ্ধই করিত না, রসের প্রবাহের মুখও উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল; রাগরাগিণীর রূপকল্পনায় কবির বিভিন্ন সময়ের উক্তিগুলি ইহার পরিচায়ক—

'ভৈরোঁ যেন ভোর বেলায় আকাশেরই প্রথম জাগরণ, পরজ যেন অবসন্ন রাত্রিশেষের নিদ্রাবিহ্বলতা, কানাড়া যেন ঘনান্ধকারে অভিসারিকা নিশীথিনীর পথবিস্মৃতি, ভৈরবী যেন রৌদ্রতপ্ত দিনান্তের ক্লান্তি নিশ্বাস, পূরবী যেন শূন্যগৃহচারিণী বিধবা সন্ধ্যার অশ্রুমোচন।'

যে রাগিণীতে যে রসের ব্যঞ্জনা আছে কবির সেই রাগিণীর গান সেই রসেই অভিষিক্ত হইয়াছে—যে ভাবের ইঙ্গিত দিয়াছে সেই ভাবেই অভিরঞ্জিত হইয়াছে। যেমন পরজ তাঁহার মতে 'যেন অবসন্ন রাত্রিশেষের নিদ্রাবিহ্বলতা'র সুর, তাহাই ফুটিয়াছে তাঁহার গানের ভাষায়—

ওগো স্বপ্ন স্বরূপিণী তব অভিসারের পথে পথে স্মৃতির দীপ জ্বালা।

ঠিক এই রসের গান আর একটি 'গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে আর কোলাহল নাই' (রূপকড়া)।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বারবারই জোর দিয়া বলিয়াছেন যে তাঁহার গান তাঁহার নিজেরই সৃষ্টি। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সঙ্গে তাঁহার সুরের মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে। তাহাদের রাগরাগিণীকে তিনি অনুসরণ করিলেও অনুকরণ করেন নাই। "আমি যে গান তৈরী করেছি তার ধারার সঙ্গে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ধারার একটা মূলগত প্রভেদ আছে—বাংলা সঙ্গীতের বিশেষতঃ আমার সঙ্গীতের বিকাশ ত হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ধারায় হয়নি। আমার আধুনিক গানকে সঙ্গীতের একটা বিশেষ মহলে বসিয়ে তাকে একটা বিশেষ নাম দাও না আপত্তি কি?" (রবীন্দ্রনাথ)

কবির সেই ইচ্ছানুসারেই তাঁহার গানকে একটি বিশেষ সঙ্গীত মহলে বসাইয়া দেওয়াই হইয়াছে, সেখান হইতে সুরের বৈচিত্র্যে, রসের নৈপুণ্যে, ভাবের গাম্ভীর্য্যে আমাদের মনকে চিরকালই মুগ্ধ করিয়া রাখিবে।

সঙ্গীতে রূপানুশীলন

রবীন্দ্র-সঙ্গীতে প্রতীচ্য প্রভাব—সঙ্গীত মানব-মনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশভঙ্গী। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মানব তাহাদের মনের কথাপ্রকাশের জন্য বিভিন্ন ভাষার আশ্রয় লয়, কিন্তু মনের অনুভূতি প্রকাশের একটি সার্বজনীন ভাষা আছে তাহাই সঙ্গীত। এই সঙ্গীত ভিন্নভিন্ন ভাষাকে বাহন স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু হৃদয়ানুভূতির গভীরতর রাজ্যে আছে একটি ভাষা, তাহাতে বাণী নাই, আছে কেবল সুর। এই বিভিন্ন সঙ্গীতের ভাব ও ভাষা হয়ত আপাতদৃষ্টিতে পৃথক্, কিন্তু হৃদয়ানুভূতির ছায়াচিত্রে সকল সঙ্গীতের মূলবৈচিত্র্য একই।

আমাদের মনের একটি বিশেষ সময়ের বিশেষ রূপটিই সুরের ভাষায় প্রকাশ পায়, তাই প্রকাশভঙ্গীর রূপ যতই ভিন্ন হউক, প্রাথমিক রূপারোপে তাহাদের মোটেই পার্থক্য নাই! মনের আবেগ ও আকূতিই (sentimental emotion) সুর ও ছন্দে ব্যক্ত হইয়া সঙ্গীত আখ্যা পায়।

কাজেই বিভিন্ন দেশের সঙ্গীতে যে পারস্পারিক আদান-প্রদান সম্ভব, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মত একটি প্রবল Dynamic Force যে বিভিন্ন প্রকার গানের অনুশীলনে এবং অনুকরণে নব নব সুরের সৃষ্টি করিবে—তাহা বিচিত্র কি! রবীন্দ্রনাথের এই সুরের সুরধুনীধারায় তাই সকল সুরধারাই নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া একত্রে মিশিয়াছে। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের আনুরূপ্যে প্রথম জীবনের Irish Melodies হইতে সুরু করিয়া শেষ বয়সের Church

Musicএর সুরের শেষ গানটি পর্য্যন্ত রবীন্দ্র-সঙ্গীতের এই অনুকরণ পদ্ধতির পর্য্যায় একটি বিশিষ্ট সুরের ধারা লক্ষ্য করা যায়।

পাশ্চাত্য সঙ্গীতের আদর্শ এবং বৈচিত্র্যের সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। ভারতীয় সঙ্গীত একস্বর বা Melody প্রধান, এখানে একটি রাগ বা গৎকে অবলম্বন করিয়া স্বরবিন্যাস করা হয়। বলা চলে স্বরবিন্যাসরূপ শরীরে আত্মা অর্থাৎ রাগিণীর প্রতিষ্ঠাই ভারতীয় সঙ্গীতের আদর্শ। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের Harmony হইতেছে Simultaneous Productions of Several Notes। "Strings in Vibrating do not only swing as a whole but have also several secondary motions, each of which produce a sound proper to itself. A string which struck Vibrates first in its entire length, secondly in two segments, thirdly in three and so on. The sound proceeding from them are blended into one note. The lowest note is the loudest and is called the fundamental of prime tone and the others are called overtones, upperpartial tones or harmonics." এক একটি স্বরবিন্যাসের বিভিন্ন সুরের তারা-মুদারা-উদারার উত্থান পতন এবং ইহাদের মিশ্রিত সমাবেশ অথবা বিভিন্ন সম্বাদী স্বরবিন্যাসের সংযুক্ত সমাবেশ হইতেই পৃথক পৃথক শুদ্ধ অথবা মিশ্র রাগ-রাগিণীর রূপ পরিস্ফুট হয়।

ভারতীয় সঙ্গীতে কোন একটি মাত্র বিশিষ্ট রাগিণীকে অথবা একসঙ্গে কয়েকটি রাগিণীর মিশ্র সুরকে তাহার সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্য, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের সহিত সম্পূর্ণাঙ্গ করিয়া প্রকাশ করা হয়। পাশ্চাত্য সঙ্গীত বহুস্বরপ্রধান; তাহাতে একটি স্বরবিন্যাসের

আভ্যন্তরীণ একাধিক সম্বাদী ও অনুবাদী উভয় প্রকার স্বরকে গ্রাম অনুযায়ী একসঙ্গে ফুটাইয়া তোলা হয়।

পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ও ভারতীয় সঙ্গীতের প্রধান পার্থক্য সঙ্গীতধারার বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গীতে। আমাদের গানে রাগ-রাগিণীর প্রকাশে তাহার স্বরভেদ প্রাধান্য পাইয়াছে, পাশ্চাত্য সঙ্গীতে বহুল স্বর (Harmony) ও অর্কেষ্ট্রার স্বরসম্পাদ প্রাধান্য পাইয়াছে। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের Principal Melodyর অঙ্গে Stacatto এবং Pizzizcalo প্রধান অলঙ্কার সজ্জায় Harmonyর সৃষ্টি হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গানে পাশ্চাত্য Harmonyর প্রভাবটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের এই সম্পদটির সংবাদ রবীন্দ্রনাথ প্রথম পাইয়াছিলেন তাঁহার সুরগুরু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিকটে। জ্যোতি ঠাকুর ছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় সঙ্গীতে সমান গুণী, কাজেই দুইটি মিলিত ধারার একত্র শিক্ষাই রবীন্দ্র-সঙ্গীতের উৎকর্ষের সাহায্য করিয়াছিল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার 'অশ্রুমতী' নাটকে ইটালিয়ান একটি গৎ ভাঙ্গিয়া তাহাকে ঝিঁঝিট রাগিণীতে ঢালিয়া একটি সুর পরীক্ষা করিয়াছিলেন ; সেই গানটি একসময়ে অতি প্রসিদ্ধ ছিল—"প্রেমের কথা আর বোলোনা, আর বোলো না" ; রবীন্দ্রনাথ তাহারই অনুকরণে সেই ইটালিয়ান ঝিঁঝিটে "আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী" গানটি রচনা করেন।

জোড়াসাঁকো বাড়ীতে বিলাতী গানের চর্চায় কবি অনেক সঙ্গী পাইয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছাড়াও প্রতিভা দেবী, ইন্দিরা দেবী, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি অনেকেই কবির সঙ্গে ইংরাজী গানের অনুশীলন করিতেন। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবির গানে হার্মনির সার্থকতা সম্বন্ধে সুচিন্তিত অভিমত দিয়াছেন, "হার্মনির নিয়মে জড়িত

বিজড়িত স্বরগুলিতে পরস্পরের সহিত বিরোধ ভঞ্জনার্থে প্রত্যেকটির নিজস্ব অনেকটা খর্ব, মিলিত সৌন্দর্য্য বিধানার্থে ব্যক্তিগত সৌন্দর্য্য অনেকটা পরিহার করিয়া চলিতে হয়, অথচ সকলের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াও মধ্যে মধ্যে এ স্বর নিজ মূর্ত্তি বিকাশের সুযোগ হইতে একেবারে বঞ্চিত হয় না। এইরূপে, দেশী বিলাতী সঙ্গীতের নিজস্ব বিহার ক্ষেত্র স্বতন্ত্র হইলেও উভয়ের একটি মিলনের স্থান থাকাও অসম্ভব নহে।"

পাথুরিয়াঘাটার রাজা শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর বাংলা গানে য়ুরোপীয় যন্ত্রসঙ্গীত প্রয়োগে বিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন।

বিদেশী সঙ্গীতের সঙ্গে আরও একটি প্রধান পার্থক্য আমাদের সঙ্গীতে—তাহা হইতেছে যন্ত্রসঙ্গীত বা Orchestraর প্রভাব। বিলাতী গানে অর্কেষ্ট্রার অসহযোগিতায় স্বর প্রকাশ হয় সম্পূর্ণ ব্যর্থ। গানের একাংশ প্রকাশ পায় কণ্ঠে, আর একাংশ যন্ত্রে, উভয়ের সংমিশ্রণে সঙ্গীত সম্পূর্ণ—একটির অভাবে অপরটি অপূর্ণ। ভারতীয় গান তথা বাংলা গানে যন্ত্রসঙ্গীত অতিরিক্ত স্বরদোসরমাত্র—একমাত্র তালরক্ষা ব্যতীত আমাদের গানে যন্ত্রের প্রয়োজন স্বীকৃতও হয় না এবং একাধিক যন্ত্রের একত্র প্রয়োগও নিষিদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রসঙ্গীতের গৎ-অনুসরণে গান গাঁথিয়াছিলেন, এইগুলি সেদিক দিয়া তাঁহার এক অপরূপ সৃষ্টি। সাধারণত: কণ্ঠসঙ্গীতের অনুকরণে যন্ত্রসঙ্গীতের সৃষ্টি, রবীন্দ্রনাথের এই ধরণের গানে যন্ত্রসঙ্গীতের তাগিদে তাহার গৎভাঙ্গায় কণ্ঠসঙ্গীতের আয়োজন। জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ ও অক্ষয়বাবু পিয়ানো বাজাইতেন, রবীন্দ্রনাথ সেই পিয়ানোয় ধ্বনিত গতের অনুকরণে গান গাঁথিতেন, পিয়ানোর স্বরধ্বনিটাই সেখানে মুখ্য, গানের কথাগুলি অতিরিক্ত অলঙ্কারমাত্র, ধ্বনির তাগিদেই বাণী-সজ্জা। বাল্মীকিপ্রতিভা ও কাল মৃগয়া'র সমস্ত গানই এইভাবে রচিত।

এই ধারার গান 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যের "দে লো সখি দে পরায়ে দে গলে" গানটিও।

শেষের যুগে বর্ষার শব্দঝঙ্কার সৃষ্টির জন্য সেতারের সুরঝঙ্কার অনুকরণে দেশ (তেতালায়) রাগিণীতে দুইটি গানের সৃষ্টি হইয়াছে—(১) মোর ভাবনারে কি হাওয়ায় মাতালো, (২) এসো শ্যামল সুন্দর। এই রকম গৎভাঙ্গা সুরের পর্য্যায়ে আরও কয়টি গানের উল্লেখ করা যায়—মন মোর মেঘের সঙ্গী, ঐ ঝঞ্ঝার ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে প্রভৃতি। মৃদঙ্গের ছন্দে শব্দসজ্জা করিয়া রচিত হয় 'চণ্ডালিকা'য়—আমার মালার ফুলের দলে আছে লেখা।

বিলাতের টমাস্ মুরের **Irish Melodies**এর অনুকরণে তাঁহার প্রথম গীতিনাট্য দুইটীর সুর রচনা। এসব গানের মূল সুর দেশী হইলেও গীতিরীতি বিদেশী। বাল্মীকি প্রতিভার তিনটী গানে তো হুবহু ইংরাজী সুর বজায় রাখাও হইয়াছে।

এই গান তিনটি (১) কালী কালী কালী বলরে আজ, (২) মরি ও কাহার বাছা, (৩) তবে আয় সবে আয়। তাহা ছাড়া, ডাকাতদের উল্লাসের গানগুলিও বিলাতি ভঙ্গীতে রচিত, যেমন (১) এনেছি মোরা এনেছি মোরা, (২) এই বেলা সবে মিলে, (৩) ত্রিভুবন মাঝে আমরা সকলে প্রভৃতি। এ সব গানের মধ্যে 'কালী কালী বলরে' গানটী সুপরিচিত। বিলাতে সে-সময়ে Nancy Lee নামে একটী গানের প্রচলন ছিল, গানটীতে নাবিকদের প্রিয়া বিরহের কথা আছে; এ গানটী তাহার সুরের অনুরূপে রচিত। কাল মৃগয়া গীতিনাট্যের অনেক গানের সুর বিলাতি গান হইতে গৃহীত। (১) সকলি ফুরাল যামিনী পোহাইল—গানটী একটী স্কটীস্ প্রেমের গান Rabin Adair অনুকরণে রচিত। (২) তুই আমার কাছে আয়, আমি তোরে সাজায়ে দি গানটীর মূল সুর ইংরাজ নাবিকপ্রশস্তি

The British Grenadiers, (৩) ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কিবা মৃদু বায়—গানটীর সুর বার্ণসের স্কচ্ গান Ye banks and braes of Bonnie Doone আনুরূপ্যে গৃহীত। (৪) ও দেখবি রে ভাই আয় রে ছুটে—গানটীর সুর অপ্রচলিত Longtim গানের অনুকরণে রচিত।

এ ছাড়া প্রথম যুগের আরও অনেকগুলি গানের মূল বিদেশী সুরের সন্ধান পাওয়া যায়— (১) পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কিরে হায়—এ গানের মূল সুর Auld Lang Syne.

গানটির প্রথম দুই স্তবক—

Should auld acquaintance be forgot,
And never brought to min'?
Should auld ac-quaintance be forgot,
And days o' lang syne ?
For auld lang Syne, my dear
For auld lang syne.
We'll clasp our hands in kind-ness yet
For auld lang syne
We twa hae run about the braes,
And pu'd the gowans fine;
But we've wandered mony a weary fit
Sin' auld lang Syne, For auld lang syne.

(২) কত-বার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া—এ গানের মূল সুর Drink to me only. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও ঠিক্ ঐ গানগুলির কয়েকটির সুর অনুকরণে গান রচনা করিয়াছেন।

Go where glory waits thee গানটির অনুকরণে চারটি

গান আছে—কাল মৃগয়ার (১) মানা না মানিলি, তবুও চলিলি; বাল্মীকি প্রতিভার (২) মরি ও কাহার বাছা; কবির আদি যুগের একটি ধর্ম্মসঙ্গীত,—(৩) ওহে দয়াময় নিখিল আশ্রয় এবং মায়ার খেলার (৪) আহা আজি এ বসন্তে এত ফুল ফুটেছে। টমাস মুরের আর একটি কবিতা Love's Young Dream-এর অনুবাদ করিয়াছিলেন কবি একটি গানে—'গিয়াছে সে দিন যে দিন হৃদয়।'

কবির বহু গানের গীতিরীতিতে বিলাতি কায়দা লক্ষ্য করা যায়। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের রীতিতে গানের অন্তঃস্থ সুর সূক্ষ্মাংশ বিস্তার Modulation ও Permutation তাঁহার বহু গানেই ব্যবহৃত হইয়াছে। ধরা দিয়েছি গো আকাশের পাখী, সুখে আছি সখা আপন মনে, সকাতরে ঐ কাঁদিছে সকলে প্রভৃতি গানে বিলিতি সুরসঙ্গতি বা Harmony লক্ষণীয়। বিলাতি ভঙ্গীর আকস্মিক কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন (Abrupt voice change) সাধন কবির গানের আর একটি বৈশিষ্ট্য—যেমন (১) অলকে কুসুম না দিও, (২) জাগরণে যায় বিভাবরী, (৩) কে বলে যাও যাও প্রভৃতি গানে লক্ষণীয়। উদ্দীপনাময় গানগুলি এবং কৌতুক সঙ্গীতগুলি প্রায় সবই পাশ্চাত্য গীতিরীতিতে গ্রথিত।

ইংরেজী ভাষায় রচিত কবির একটিমাত্র গান পাওয়া গিয়াছে George Calderon এর The Maharani of Arakan নাটকে। রবীন্দ্রনাথের সুহৃদ ডক্টর Rothenstein বলিয়াছেন—"George Calderon dramatised one of his stories 'The Maharani of Arakan'—the play was acted at the Albert Hall Theatre when it fell to me to introduce Tagore to his first English audience." কাহিনী কবির সুপরিচিত 'দালিয়া'

গল্পের ভাবালম্বনে রচিত; তাহাতে মায়ার খেলার বিখ্যাত গান 'অলি বার বার ফিরে যায়ে'র ইংরাজী অনুরূপ রহিয়াছে—

The bee is to come and the bee is to hum.

Till the heart of the flower comes out.

বিলাত প্রবাসকালের স্মৃতি কথা বিবৃতি প্রসঙ্গে কবি সে গানের রচনা ও সুরদানের কথা বলিয়াছেন "তাতে আমি একটি ছোট্ট গান লিখে দিয়েছিলুম, সুরও আমার।"

বিলাতি সঙ্গীতের প্রভাব পরোক্ষভাবেই কবি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী গ্রহণ করিয়াছেন; বিলাতি গানের প্রেরণায় কবি কৌতুক, বীররস বিস্ময় প্রভৃতি নানা রসের গান বাঁধিয়াছিলেন। তাঁহার বৈচিত্র্যময় Romantic গানের প্রাচুর্য্যের সৃষ্টি হইয়াছে য়ুরোপীয় সঙ্গীতেরই সংস্পর্শে, কবি সে কথা বলিয়াও গিয়াছেন—"আমি যখনই য়ুরোপীয় সঙ্গীতেরই রসভোগ করিয়াছি, তখনই বারম্বার মনের মধ্যে বলিয়াছি ইহা রোমাণ্টিক। ইহা মানবজীবনের বিচিত্রতাকে গানের সুরে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছে। আমাদের সঙ্গীতে কোথাও কোথাও সে চেষ্টা নাই যে তাহা নহে, কিন্তু সে চেষ্টা প্রবল ও সফল হইতে পারে নাই।"

বিলাতী Programme Music সুরের মধ্য দিয়া একটি পরিপ্রেক্ষী গড়িয়া দেয়। হৃদয়ভাবের প্রকাশ অপেক্ষা দৃশ্যসজ্জার Photography শ্রোতাদের সামনে তুলিয়া ধরাই এশ্রেণীর গানের অধিকতর লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যের অনেক গানের মধ্যে তাহার প্রভাব পাওয়া যায়, যেমন 'চিত্রাঙ্গদায়' শিকার আয়োজন, 'শ্যামায়' কোটালের বজ্রসেনের পশ্চাদ্ধাবন প্রভৃতিতে!

ডক্টর আর্ণল্ড বাকে নামক একজন বিদেশী সুররসিক কবির বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে বিলিতি ভঙ্গী বাংলা গানে গ্রহণ

করা যায় কিনা কবি একসময়ে সে বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন। বাকে সাহেব কবির ২৬টি গানের ফরাসী এবং ইংরাজী স্বরলিপি করিয়া বিদেশে প্রচার করেন। তিনি বলেন—"The music of Tagore like most Indian Music, needs a tranquil atmosphere. It should be sung in subdued tones. It has a constant quality of veiled tenderness gentle almost confidential. The notes should therefore, not be sung from the rift of the mouth."

কবি পাশ্চাত্য রীতিতে অনেক স্থলে এই বৈশিষ্ট্যটি কাটাইয়া উঠিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সে জন্য বিলাতি গীতিরীতির অনুকরণ করিয়াছেন এইভাবে কবি তাঁহার বহু গানে। বৈদেশিক চাপল্য উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছে যে শ্রেণীর গানে সেই শ্রেণীর কয়েকটি গানের উল্লেখ করা হইল—মোর মরণে তোমার হবে জয়। অলকে কুসুম না দিও। তোমার বীণায় গান ছিল। হারে রে রে আমায় ছেড়ে। নয় নয় এ মধুর খেলা। প্রাণ চায়, চক্ষু না চায়। একদিন চিনে নেবে তারে। ও কি এল, ও কি এল না। মম চিত্তে নিতি নৃত্যে। বসন্তে ফুল গাঁথল প্রভৃতি। বহু গানের স্বরভঙ্গীতে বিলাতি কায়দায় অভিনয়প্রবণতা Histrionism গ্রহণ করিয়াছেন; যেমন—না না গো না—কোরো না ভাবনা; না যেয়ো না কো; না রে না, হবে না তোর স্বর্গ সাধন প্রভৃতি গানের রীতিতে ইংরাজী গানের সুরের কায়দায় 'না' শব্দের দৃপ্ততা নানাভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে।

Church Music হইতেছে খৃষ্টীয় ধর্ম্মমন্দিরের ভজনগান; রবীন্দ্রনাথ সেই Church Musicএর অনুরূপে কয়টি গান রচনা করিয়াছেন—"সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি", 'তোমার হলো সুরু আমার হলো সারা", "আমার সকল রসের ধারা', "মোরা

সত্যের পরে মন"; "আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর" প্রভৃতি। এই গানগুলি পিয়ানোর উদাত্ত গম্ভীর স্বরের পতনোত্থান পদ্ধতি অনুসারে রচিত। এই সকল গানে ভগবৎ মহিমা যেন ঔদার্য্যময় পবিত্র স্বরে প্রকাশিত হয়।

কালমৃগয়া এবং বাল্মীকি-প্রতিভার অনেকগুলি গানে হৃদয়ভাবের বৈচিত্র্য সুরে প্রকাশ করিয়াছেন। কবি এশ্রেণীর সুরে নাট্যরীতি প্রবর্ত্তনায় Herbert Spencer সাহেবের লেখা হইতে প্রেরণা পাইয়াছিলেন। কবির কথায়—"হর্বট পেন্সারের একটি লেখার মধ্যে পড়িয়াছিলাম যে সচরাচর কথার মধ্যে যেখানে একটু হৃদয়াবেগের সঞ্চার হয়, সেখানে আপনিই কিছু—না—কিছু সুর লাগিয়া যায়। বস্তুতঃ রাগ দুঃখ আনন্দ বিস্ময় আমরা কেবলমাত্র কথা দিয়া প্রকাশ করি না, কথার সঙ্গে সুর থাকে। এই কথাবার্ত্তার আনুষঙ্গিক সুরটারই উৎকর্ষ সাধন করিয়া মানুষ সঙ্গীত পাইয়াছে।"

নাটক দুইটির গানগুলিতে সুরের দাক্ষিণ্য ছাড়াও স্বচ্ছন্দরীতির অবাধগতি আছে। রাগিণী-বৈচিত্র্য অপেক্ষা অভিনয়-প্রবণতা এই গানগুলিতে অধিকতর সুপরিস্ফুট। এই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলিয়াছেন—

"এই দেশী ও বিলাতী সুরের চর্চ্চার মধ্যে বাল্মীকি প্রতিভার জন্ম হইল। ইহার সুরগুলির অধিকাংশই দেশী, কিন্তু গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকি মর্য্যাদা হইতে অন্য ক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে। সঙ্গীতের এইরূপ বন্ধনমোচন ও তাহার নিঃসঙ্কোচে সকল প্রকার ব্যবহারে লাগাইবার আনন্দ আমার মনকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছিল।" সঙ্গীতের এই মুক্তপথ বিচরণ ও স্বচ্ছন্দ গতি সম্পূর্ণ বিদেশী, রবীন্দ্রনা সেই প্রথম বিদেশী সুরের আনুরূপ্যে গান রচনা করিয়াছিলেন।

Herbert spencer সাহেবের উল্লিখিত সেই মতটি এই—

"The various Inflections of voice which accompany feelings of different kinds and intensities, are the germs out of which music is developed. It is demonstrable that these inflections and cadences are not accidental or arbitrary, but that they are determined by certain general principles of vital actions; and that their expressiveness depends on this."

বাল্মীকি প্রতিভা-কালমৃগয়া হইতে চিত্রাঙ্গদা-শ্যামা পর্য্যন্ত সমস্ত স্বরনাটিকা এই ভাবেই রূপায়িত হইয়াছে।

কবি নিজেই বলিয়াছেন "বাল্মীকি প্রতিভার অনেকগুলি গান বৈঠকি গান ভাঙ্গা, অনেকগুলি জ্যোতিদাদার রচিত গতের সুরে বসানো এবং গুটি তিনেক গান বিলাতী সুর হইতে লওয়া।"

এই সকল গান যে বিলাতী সুর অবলম্বনে রচিত গান শুনিলেই তাহা বেশ ধরা যায়, কিন্তু এমন অপূর্ব্বভাবে বাংলা কথার আবরণে ইংরাজী সুর ঢাকা পড়িয়াছে যে, একমাত্র গানের চটুলতার আভাস ব্যতীত বিদেশী প্রভাব ভারতীয় শ্রোতার কানকে রসগ্রহণে ব্যাহত করে না। অনুকৃতিই অভিনব সৃষ্টিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

ইন্দিরা দেবীর উল্লিখিত রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি প্রিয় ইংরাজী গান (১) Won't you tell me Mollie darling, (২) Darling, you are growing old, (৩) Come into the garden Maud, (৪) Good night, Good night beloved, (৫) Good bye, Sweetheart Good bye, (৬) Adelaide প্রভৃতি। সম্ভবতঃ তাঁহার এই প্রিয় গানগুলির সুর বারবার কানে ধ্বনিত হইয়া দেশী সুরের সহিত নিজের অজ্ঞাতেই এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছে।

কবি ইংরাজী গান গাহিতেন কেবল ছেলেবেলায়ই নয়, পরেও বহু সময়েই। ফক্স ষ্ট্রাঙ্গোয়েজ এবং রবার্ট ব্রীজের সঙ্গে কবির আলাপ হইয়াছিল ১৯১২-১৩ সালে। ইউরোপে কবি বহু অনুরাগী শ্রোতাও পাইয়াছিলেন। কবি এ—বিষয়ে নিজেই উল্লেখ করিতেছেন—"একজন জার্মান সহযাত্রী আমাকে বল্‌ছিল তুমি যদি তোমার গলার রীতিমত চর্চা কর তা হলে আশ্চর্য্য উন্নতি হতে পারে। You have a mine of wealth in your voice, প্রথম বারে যখন ইংলণ্ডে ছিলুম তখন যদি এই কাজ করতুম তাহলে মন্দ হত না। × × যা হোক্ জাহাজে এসে আমার গান বেশ appreciated হচ্ছে। আসল কথা হচ্ছে এর আগে আমি যে ইংরেজি গানগুলো গাইতুম কোনটাই Tenor Pitch এ ছিল না—তাই আমার গলা খুল্‌তো না—এখন সমস্ত উচু Pitchএর Music কিনেচি।" কিন্তু সে সঙ্গে কবি এ কথাও জানাইয়া গিয়াছেন—"গুন্ গুন্ করে একটা দিশি রাগিণী ভাঁজছিলুম ভারি মিষ্টি লাগল—ইংরেজি গান গেয়ে গেয়ে শ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলুম হঠাৎ দিশি গানে প্রাণ আকুল হয়ে গেল।"

প্রাচ্য প্রভাব—ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের আনুরূপ্যে যে সকল গান রবীন্দ্রনাথ গাঁথিয়াছিলেন, সে গুলি রসিকজনের সুপরিচিত। এ শ্রেণীর গানকে 'ভাঙ্গাগান' বলা হয়।

কবির রাগসঙ্গীত গুলিকে দুইটি ভাগ করা যায় (১) ব্রহ্মসঙ্গীত এবং (২) অন্যান্য রাগপ্রধান গীতি। তাঁহার ব্রহ্মসঙ্গীতগুলির সুর ও ছন্দ উচ্চাঙ্গের হইলেও অধিকাংশই প্রচলিত হিন্দী গানের অনুকরণে রচিত। 'মায়ার খেলা'র সব গানগুলিই শোরী মিঞার টপ্পার অনুকরণে রচিত। সুরের সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধনের জন্য অনেক গানের

বাণী তদনুসারে রচিত হয়। বাণী রচনা ছাড়া এ শ্রেণীর গানে কবির বিশেষ কৃতিত্ব নাই। কবি সে সম্বন্ধে কৈফিয়ৎও দিয়াছেন—

"ভারতবর্ষের বহু যুগের সৃষ্টি করা যে সঙ্গীতের মহাদেশ, তাকে অস্বীকার করলে দাঁড়াব কোথায়? সেই সঙ্গীত থেকেই আমি প্রেরণা লাভ করি। তবু যত দৌরাত্ম্যই করি না কেন রাগ-রাগিণীর এলাকা একেবারে পার হোতে পারিনি। দেখলাম তাদের খাঁচাটা এড়ানো চলে, কিন্তু বাসাটি তাদেরই বজায় থাকে।" এই শ্রেণীর রাগসঙ্গীতের অনুরূপ মূল হিন্দী গান শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী সবশুদ্ধ ১৫৬টি সঙ্কলন করিয়াছেন। এ সব গানের অধিকাংশ বিষ্ণুপুর ঘরোয়ানার প্রসিদ্ধ ধ্রুপদগানের ভাঙ্গা সুরে রচিত।

এই পর্য্যায়ের গানগুলিতে মূল সুরের সঙ্গে যতদূর সম্ভব মূল গানের ভাবকেও বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন—

(নটমল্লার একতালা) লাগিরে মেরি নই লগন লাগিরে—তুমি ফিরালে মোরে বারে বারে। (আড়ানা, একতালা) সুন্দর. লগরি প্যায়ার বাঁ—মন্দিরে মম কে আসিলে হে। (বেহাগ, ঝাঁপতাল) 'মেরে ডুন্দদল সাজে দশরথসুত রামা—মহারাজ, একি সাজে এলে। (বসন্ত বাহার, তেওড়া) আজু বহত বসন্ত পবন সুমন্দ—আজি বহিছে বসন্ত পবন। (ভৈরবী, ঠুংরী) মুখপরে মালতী গুলাল— আমার রাত পোহাল শারদ প্রাতে। (খাম্বাজ, একতালা) আজু শ্যাম মোহে লিয়ে বাঁশরী বাজায়—তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে প্রভৃতি।

দক্ষিণ-ভারতীয় বা কর্ণাটীয় সঙ্গীতের সহিত উত্তর-ভারতের সঙ্গীতের মূলগত পার্থক্য আছে। দক্ষিণী গান প্রধানতঃ তান বিস্তারের এবং সর্গমের।

কর্ণাটীয় সঙ্গীতের গঠনতন্ত্র জটিল, উত্তরভারতের সুর এবং বাণী দক্ষিণী সুরের পক্ষে বেমানান। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে দক্ষিণী প্রভাব খুব

বেশী নাই। প্রথম যুগের গানে দুই-তিনটি এবং শেষের যুগের গানে ছয়-সাতটি এবং নৃত্যের প্রভাবে রচিত আরও কয়েকটি আছে মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম এ শ্রেণীর দক্ষিণী গানের সুর অবলম্বনে বাংলা গান রচনা সুরু করেন। 'নমামি মহিষাসুর মর্দিনি' নামে (নারায়ণী ; যং) একটি তামিল গান অবলম্বনে তিনি রচনা করিলেন 'ভজরে ভজরে ভব খণ্ডনে'। সত্যেন্দ্রনাথও দক্ষিণী সুরে গান সৃষ্টি করেন 'জয় দেব জয় দেব জয়মঙ্গলদাতা'। সঙ্গীতের অন্যান্য ধারার ন্যায় এখানেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কবিকে পথ দেখাইলেন কর্ণাটী সুরের গানে 'প্রণমামি অনাদি অনন্ত' (ফেরতা)।

দক্ষিণ ভারতে ধ্রুপদ এবং খেয়ালকে যথাক্রমে কীর্ত্তন এবং কৃতি বলে এবং বাউলকে বলা হয় সিন্ধু। এ দেশের গানে মীড়ের অভাব, এক সুর হইতে অন্য সুরে গমনাগমন সর্বদা সমান্তরাল। দক্ষিণী গানের গতি অতি দ্রুত।

মহীশূরের প্রচলিত একশ্রেণীর ভজন গানের সুর অবলম্বনে কবির বিখ্যাত 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর' গানের সৃষ্টি। **মহীশূরী** ভজনের সুরে রচিত তাঁহার অন্যান্য গানের মধ্যে নাম করিতে হয়—চির সখা মোরে ছেড়োনা, এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ এবং যদি আসে তবে কেন (পূর্ণ ষড়জ)। মহীশূরী আর একটি গানের সুর অনুসরণে খাম্বাজে কবির ঠুংরি গান 'চির বন্ধু, চির নির্ভর, চির শান্তি তুমি হে'। শুদ্ধ কর্ণাটীয় সুরে রচিত কবির প্রসিদ্ধ গান (১) আজি শুভদিনে পিতার ভবনে, অমৃত সদনে চল যাই (খাম্বাজ) গানের মূল কর্ণাটীউৎস 'পূর্ণ চন্দ্রাননে চিন্ময় হরণে মন্মথ মোহিনী। (২) বড় আশা করে এসেছি গো কাছে—কর্ণাটীয় ঝিঁঝিটে রচিত, মূল গানের নাম 'সখি বা বা'। (৩) সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে—মূলগান 'চারিবর্ষা পর্য্যন্ত'। এই তিনটি গান **কানাড়ী** ভাষায় রচিত। কবি

সত্যেন্দ্রনাথের কাছে বোম্বাই অঞ্চলে কিছুদিন ছিলেন—সেখানেই প্রথম এ শ্রেণীর গান শুনিবার সুযোগ হয়।

মাদ্রাজী ভজনের সুর লইয়া গান সৃষ্টি করিলেন 'অন্তরের ধন প্রাণরঞ্জন তুমি'। এ সমস্ত গানই কবির প্রথম জীবনের রচনা।

শেষ জীবনে দক্ষিণ ভারতীয় মাদ্রাজী গানের সুর অনুসরণে গীতিকৌশলাশ্রিত গান তাঁহার আরো কয়েকটি আছে; যেমন (১) 'বৃন্দাবন লোলা' নামে ভজন গানের অনুসরণে 'নীলাঞ্জন ছায়া'। (২) 'মীনাক্ষী মে মুদম' পূর্বকল্যাণী সুরে রচিত গানের অনুকরণে 'বাসন্তী হে ভুবন মোহিনী।' (৩) 'নিতুচরণ মূলে' নামে গানের সুর অনুকৃতিতে 'বেদনা কী ভাষায় রে' এবং (৪) সিংহেন্দ্র মধ্যম রাগের গান 'বাজে করুণ সুরে'। 'নিভৃত প্রাণের দেবতা' গানেও পূর্বীকল্যাণী সুরের বেশ আভাস আছে। নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকার 'নব বসন্তের দানের ডালি' গানেও দক্ষিণী সুরের প্রভাব আছে।

মূলতঃ উত্তর ভারতের সঙ্গীতের গঠনরীতির কোনই পার্থক্য বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় রচিত গানে লক্ষিত হয় না। যে গান পাঞ্জাবী ভাষায় এবং যে গান বাংলায় রূপ পাইয়াছে—তাহাদের সুরগত বিশেষ কোন পার্থক্য নাই, প্রকাশভঙ্গীই কেবল স্বতন্ত্র। বিশেষতঃ ভজনজাতীয় গানে ভাষার বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা সুরের বৈচিত্র্যের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়, তাই ভজন গানের সুর সর্ব্বভারতে প্রায় একই। **গুজরাটী** ভজন গান রবীন্দ্রনাথের হাতে অতি সহজে বাংলা রূপ পাইয়াছে। গুজরাটী সুরে রচিত দ্বিজেন্দ্রনাথের 'অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি' গানটির অনুসরণে কবির অনেকগুলি গান আছে। গুজরাটী ও বাংলা ভাষা অনেকটা প্রায় এক গোত্রের বলিয়াই হয়ত সে ভজন গানগুলি অক্ষুন্নতায় অপূর্ব্ব হইয়াছে! গুজরাটী গানের অনুকরণে গান—

(১) কোথা আছ প্রভু এসেছি দীনহীন, আলয় নাহিক মোর অসীম সংসারে (একতালা), (২) তোমারেই প্রাণের আশা কহিব (ঢেঁপকা), (৩) একি অন্ধকার এ ভারত-ভূমি প্রভৃতি। শেষ গানটীর এবং (৪) নমি নমি ভারতী ও (৫) যাওরে অনন্ত ধামে একই সুর।

মারাঠী গানের অনুরূপে তাঁহার দীর্ঘতম গান "বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে"। মহারাষ্ট্রীয় গান "নাদবিদ্যাপরব্রহ্মরস জানবে" গানটির আনুরূপ্যে তাহা রচিত। সুর শঙ্করাভরণ-ফেরতা। মূল সুরটি শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী মহারাষ্ট্র দেশ হইতে শিখিয়া আসেন।

পাঞ্জাবী শিখদিগের দুইটি প্রসিদ্ধ ভজন গানের সুরের আনুরূপ্যে রবীন্দ্রনাথের দুইটি গান আছে। একটি গান গুরু নানকের বিখ্যাত দোঁহা (১) 'গগনময় থালের প্রথম অংশের অনুবাদ—"গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে" (জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল) এবং (২) "বাদৈ বাদৈ রম্য বীণ বাদৈ" গানের সুন্দর অনুরূপ "বাজে বাজে রম্য বীণা বাজে" (ইমন কল্যাণ, তেওড়া)।

নানকের ভজনের অনূদিত অংশ—

গগনময় থাল রবি চন্দ্র দীপক বনে তারকাগণ্ডলা জনক মোতি।
ধূপ মলেয়ানীল পবন চৌরি করে সকল বন রাই ফুলন্ত জ্যোতি।
ক্যায়সে আরতি হোয়ে ভয় খণ্ডন তেরি আরতি,
অনহত শব্দ বাজন্ত ভেরী ॥

কবির অনুবাদ—গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে
তারকামণ্ডল চমকে মোতি রে।
ধূপ মলয়ানিল পবন চামর করে
সকল বনরাজি ফুটন্ত জ্যোতিরে।
কেমনে আরতি হে ভবখণ্ডন, তব আরতি,
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী হে ॥

পাঞ্জাবী হিন্দু ভজনের একটি অনুবাদ তাঁহার গানে আছে—এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর (সিন্ধুড়া-তেতালা)।

প্রচলিত হিন্দি ভজন গানের সুর অনুসরণে কবির কতকগুলি গান পাওয়া যায়—(১) কখন দিলে পরায়ে—(পিলু বারোঁয়া). (২) কি করিলি মোহের ছলনে (ঠুংরি), (৩) মন জাগো মঙ্গলালোকে (ভৈঁরো) ইত্যাদি

নিধুবাবুর প্রাচীন বাংলা গানের অনুকরণে রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি গান আছে ; ইহা ব্যতীত দাশরথি রায়, গগন হরকরা প্রভৃতির অনেক গানের ভাবচ্ছায়া রবীন্দ্র-সঙ্গীতে আছে। একটি মাত্র গানের উল্লেখ করিতেছি—কবিয়াল রাম বসুর গান—"মনে রইল সই মনের বেদনা" গানটির আনুরূপ্যে রবীন্দ্র-সঙ্গীতে "মনে র'য়ে গেল মনের কথা"। রামনৃসিংহের বহু গানের সুরের সহিত রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মিল পাওয়া যায়।

সামসময়িক গ্রাম্য গীতের বহু আভাস রবীন্দ্র-সঙ্গীতে আছে। রবীন্দ্রনাথের অনেক বাউল গানের উৎস প্রচলিত গ্রাম্য গানগুলির সুর ও ভাষা হইতে। লালন ফকিরের বাউলের বিশেষ প্রভাব রবীন্দ্রনাথের বাউলে পাওয়া যায়। 'বেঁধেছ প্রেমের পাশে, ওহে দয়াময়' (কাফি কানাড়া, ঢিমা তেতালা) গানটি 'চাঁচর চিকুর আধো' নামে একটি প্রাচীন বাংলা গানের সুরে রচিত।

এই ধারার গানগুলিতে সুরের মর্য্যাদার কৃতিত্ব অপেক্ষা কবিত্বশক্তি বহুগুণ প্রশংসা পাইবার যোগ্য।

"জনগণমন অধিনায়ক জয় হে" গানের ধুয়াটিও অনেকটা নগর-সংকীর্ত্তনের সুরে রচিত। "হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল" ধ্বনিরই ক্রমোদাত্ত অনুরূপ "জয় হে, জয় হে"।

সঙ্গীতে রূপানুবর্ত্তন—সবশেষে রবীন্দ্রনাথের একই গানের বিভিন্ন রূপ লইয়া আলোচনা করা যাইবে। রবীন্দ্রনাথ এত বেশী গান রচনা

করিয়াছিলেন, এত বিভিন্ন সুরে বিভিন্ন ঢঙে তাঁহার গান গাঁথা হইয়াছিল যে শেষে রবীন্দ্রনাথের সুরবৈচিত্র্য নিঃশেষ হইয়া গেল, তাই একই সুরের বিভিন্ন গানও যেমন রচিত হইয়াছে তেমনি একই গানে দুইটি বিভিন্ন সুরও লাগানো হইয়াছে—

(১) বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা (রাজা)—একটি সুর বাহার, জলদ তেওড়া; অপর সুরটি বাউলাশ্রিত সারিগান।

(২) বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে দাও ডাক (নবীন)—একটি সুর মিশ্ররামকেলি; অপর সুরটি জলদ, শুদ্ধরামকেলি।

(৩) হে সখা বারতা পেয়েছি মনে মনে (শাপমোচন)—একটি সুর মিশ্র বসন্ত; অপর সুরটি বেহাগ।

(৪) আমি যখন ছিলেম অন্ধ (রাজা)—একটি সুর কেদারা; অপর সুরটি কীর্তনের! এই পর্য্যায়ের প্রতিটি গানের একটির গতি মন্থর, অপরটির গতি দ্রুত পদক্ষেপে; একটির সুর উচ্চাঙ্গের, অপরটি গ্রাম্য লৌকিক সুরের। (৫) কী বেদনা সে কি জানো (বীথিকা) (৬) ঝড়ে যায় উড়ে যায় (৭) আজি ঝরঝর মুখর বাদলদিনে প্রভৃতি গানেও পাশাপাশি দুইটি সুর প্রচলিত আছে।

গ্রামের অমার্জিত গান এবং দরবারের শাস্ত্রীয় নিয়মানুবর্ত্তী গানের যে প্রভেদ, তাহা প্রায় সব দেশের গানেই বিদ্যমান। যে কথাটি প্রকাশ করিবার জন্য সুরের পারিপাট্যের প্রয়োজন হয় না তাহাই গ্রাম্য এবং অলঙ্কারে সুসজ্জিত পরিচ্ছন্ন সুরের গানই শাস্ত্রীয়। এ শ্রেণীর সাঙ্গীতিক পার্থক্য সকল দেশের গানেই সমান।

এক একটি স্বতন্ত্র রাগিণী হৃদয়াবেগের এক একটা স্বতন্ত্র ভাবের প্রকাশ করে; কিন্তু লোক-সঙ্গীতের সমস্ত সুরই প্রায় বেদনার উচ্ছ্বাস। একটা লোক সঙ্গীতের সঙ্গে অন্য একটি লোকসঙ্গীতের পার্থক্য একমাত্র গাহিবার ভঙ্গীতে। কবিরও অধিকাংশ গানই 'বিরহ বিধুর'!

রবীন্দ্রনাথের শিল্পী মনে একটী অতৃপ্তির আভাস ছিল, তাই গানে সুরের এই অহরহঃ পরিবর্ত্তন। গানগুলিতে যদিও তিনি সুরের পরিবর্ত্তন করিতেন, কথার পরিবর্ত্তন করিতেন, কিন্তু পূর্ব্বতন গানগুলিকে বাতিল করিতে তাঁহার জনক-মন ব্যথা পাইত, তাই পাশাপাশি বিভিন্ন সুরের স্বল্পপরিবর্ত্তিত একই বাণীর গান রাখিয়া গিয়াছেন। তালের দিক হইতে অনেক সময় এই গানগুলির কোন পরিবর্ত্তন না থাকায়, গানগুলি শুনিতে প্রায় একই রকম লাগে।

অনেক গানে কবি দুইটি পৃথক ছন্দ বা তালও ব্যবহার করিয়া একই কথা ও সুর অবলম্বনে স্বতন্ত্র গান রচনার প্রয়াস পাইয়াছেন—যেমন, (১) হেরি অহরহ তোমারি বিরহ (মিশ্র কানাড়া, ১২ মাত্রার একতালা এবং চৌতালা) (২) সংশয় তিমির মাঝে (দেশসিন্ধু-৭ মাত্রার ঠুংরি, কার্ফা এবং তেওড়া) (৩) যেতে যেতে একলা পথে (ঝম্পক এবং দাদ্‌রা)। একই গানে বিভিন্ন ছন্দের সমাবেশকে বলা হয় 'তাল ফেরতা।' দীর্ঘ গানে কবি বহুবার তাল ফেরতা ব্যবহার করিয়াছেন—যেমন আদি যুগে (১) বিশ্ব বীণারবে (২) আনন্দধ্বনি জাগাও (৩) আজি শুভদিনে (৪) মধুর মিলন প্রভৃতি এবং অন্ত্যযুগে (৫) নৃত্যের তালে তালে, (৬) আমার মালার ফুলের দলে (৭) ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব (৮) হে নিরুপমা প্রভৃতি এ শ্রেণীর গানের নিদর্শন।

একই সুরের দুইটী বিভিন্ন গান—

(১) তৃষ্ণার শান্তি সুন্দর কান্তি এবং ওগো বধু সুন্দরী। (২) শ্যামল শোভন শ্রাবণ ছায়া নাই বা গেলে এবং শ্রাবণ তুমি বাতাসে কার আভাস পেলে ? (৩) দেখো দেখো শুকতারা আঁখি মেলি চায় এবং চলে ছল ছল নদীধারা নিবিড় ছায়ায়। (৪) কেটেছে একেলা বিরহের বেলা এবং সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে। (৫) বাকি আমি রাখব না এবং আমার এই

রিক্ত ডালি। (৬) দেখা না-দেখায় মেশা এবং স্বপ্নমদির নেশায় মেশা। (৭) বসন্তে ফুল গাঁথল এবং অশান্তি আজ হান্‌ল। (৮) কোন দেবতা সে কী পরিহাসে এবং দূরের বন্ধু সুরের দূতীরে। (৯) ঐ ঝঞ্ঝার ঝঙ্কারে এবং ঐ সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে! (১০) ওরে কি শুনেছিস ঘুমের ঘোরে এবং ওরে কি অপরূপ রূপ দেখো রে। (১১) ওরে চিত্র রেখা ডোরে এবং কেন পান্থ এ চঞ্চলতা। (১২) কাহার গলায় পরাবি গানের রতন হার এবং অজানা খনির নূতন মণির। (১৩) আমি কাকেও বুঝিনে শুধু বুঝেছি তোমারে এবং যে ছিল আমার স্বপনচারিণী। (১৪) যায় দিন শ্রাবণ দিন যায় এবং ধরা সে যে দেয় নাই। (১৫) অনেক দিনের মনের মানুষ এবং স্বপন লোকের বিদেশিনী। (১৬) হৃদয় মোর কোমল অতি ও আঁধার শাখা উজল করি। (১৭) হাসি কেন নাই ও নয়নে এবং সমুখেতে বহিছে তটিনী। (১৮) ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত আলোয় এবং ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত মলিন যেই স্মৃতি।

(১) আমার নয়ন তব নয়নের এবং আমার নয়ন তোমার নয়নতলে। (২) শ্যামল ছায়া নাই বা গেলে এবং শ্যামল শোভন শ্রাবণ ছায়া, (৩) ওগো জলের রাণী এবং ও জলের রাণী প্রভৃতি একই গানের সঙ্কুচিত এবং বিস্তারিত রূপ। অনেক গানের ভাব ঋতু লীলা বৈচিত্র্য প্রকাশের জন্য রূপান্তরিত হইয়াছে: যেমন—'হৃদয় আমার ঐ বুঝি তোর' গানের বৈশাখী এবং ফাল্গুনী রূপ, 'চরণ রেখা তব' গানের শরৎ এবং বসন্তের রূপ প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথের বাউল গান

(১)

বাউলগান আমাদের গ্রাম-অঞ্চলের লোকসঙ্গীত। লোকসঙ্গীত বলিয়া কিন্তু মোটেই তুচ্ছ নয়, বহু গহন তত্ত্ব ও নানা গভীর আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক চিন্তা ও বহু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় বাউলের গানে। মধ্যযুগে ইস্‌লামী (সুফী) সংস্কৃতি যে ঐতিহ্য বহন করিয়া আনিয়াছিল, বাউলদের এই গানগুলিতে তাহারও ছায়াপাত হইয়াছে।

এই গানগুলি জনসাধারণের গান—বৈষ্ণবগানের মতন কেবল রসিক ভক্তজনের গান নয়; তাই এগুলির মধ্যে যে আন্তরিকতা, প্রাণের যে গভীরতার ছাপ আছে, বাংলার মার্জিত গানে তাহা নাই। বাংলার যে অকপট প্রাণের নিদর্শন তাহার উদার আকাশ-ছোঁওয়া মাঠে, খেয়া-বাওয়া নৌকার ঘাটে, ছায়া-ঢাকা পাখী-ডাকা বনবাটে, গ্রামপ্রান্তের হাটে হাটে, দেবালয়ের নাটমন্দিরে ছড়াইয়া আছে, এই বাউলরা তাহাই সযত্নে সংগ্রহ করিয়া তাহাদের সুরের মালা গাঁথিয়াছে।

কবি বলেন—····"ইহা গ্রাম্য সাধারণের ভাষায় লিখিত এবং নিতান্ত অমার্জিত বলিয়া উচ্চ সাহিত্য কর্তৃক অবজ্ঞাত। এই সব গ্রাম্য গায়কেরা তত্ত্ববিদ্যার কোন ধার ধারেন না, সেটা তাঁহারা বেশ একটু জোরের সঙ্গেই বলিয়া থাকেন! ××× এই বাউল গান গ্রামের চাষী ও সর্বসাধারণের, যাহারা এই গানের আধ্যাত্মিক অতি বাস্তবতায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠে না"।

বাংলা দেশকে ভালবাসিতে হইলে তাই এই গানগুলিকে উপেক্ষা করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন:—"বাউলের গান

আমি খাঁটি বাউলের মুখে শুনেছি ও তাদের পুরাতন খাতা দেখেছি। নিঃসংশয়ে জানি বাউলের সঙ্গীতে একটা অকৃত্রিম বিশিষ্টতা আছে যা চিরকালের আধুনিক।" বাউল এক শ্রেণীর সহজ (মিষ্টিক) সাধক গোষ্ঠীর সাধন ভজনের গান। আধুনিক বাউল গানের মধ্যে সে সাধনা নাই, এ গুলির কেবল সুরই সম্বল। কবি এ সব কৃত্রিম বাউল গানের বৈশিষ্ট্য স্বীকার করেন না।

কবি এই শ্রেণীর বাউল গানগুলিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"অধিকাংশ আধুনিক বাউলের গানের অমূল্যতা চ'লে গেছে, তা চল্‌তি হাটের সস্তা দামের জিনিষ হয়ে পথে পথে বিকোচ্চে। তা অনেকস্থলে বাঁধি বোলের পুনরাবৃত্তি এবং হাস্যকর উপমা তুলনার দ্বারা আকীর্ণ,—* * * এর উপায় নেই, খাঁটি জিনিষের পরিমাণ বেশী হওয়া অসম্ভব, * * * এইজন্যে কৃত্রিম নকলের প্রচুরতা চল্‌তে থাকে। এইজন্যে সাধারণতঃ যে-সব বাউলগান যেখানে-সেখানে পাওয়া যায়, কি সাধনার কি সাহিত্যের দিক্ থেকে তার দাম বেশী নয়।"

কতকগুলি বিষয়ে সাধারণ মানুষ নিজেদের স্বভাবসূত্রে কেবল তাহাদের পরিবেশ হইতেই জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে, সেগুলির জন্য কোনরূপ সাধনার প্রয়োজন হয় না। বাউলরা তাহাদের স্বভাবসূত্রে যে সহজ জ্ঞান পাইয়াছিল, সুরের মধ্য দিয়া ক্রমে সাধনা করিয়া তাহারা বিশ্বজগৎকে তাহাই দান করিয়াছে। যাহা চিরন্তন সত্য—আগ্রহী মানুষ তাহা কেবল চিত্তের স্বচ্ছতা ও নির্ম্মলতার গুণেই Intuition এর দ্বারাই লাভ করে। এই ভাবে বহু দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব চিত্তে স্বভাবতঃ প্রতিফলিত হইয়া এই অশিক্ষিত বাউলদের গানে রূপ পাইয়াছে, তাহারা ক্রমাগত সাধনার ফলে সেই সত্যগুলিকেই তাহাদের জীবনে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে। ঋষিদের

সঙ্গে তপস্যার পদ্ধতি ও ধারার তফাৎ থাকিলেও বাউলরাও গভীর ভাবের সাধক এক শ্রেণীর তপস্বী।

বাউলরা ভিক্ষাজীবী বৈরাগীদের পর্য্যায়েরই লোক। সঙ্গীত তাহাদের সাধনার অঙ্গ, সেই সঙ্গে ভিক্ষারও একমাত্র উপজীব্য। সঙ্গীতই বাউলদের ঐহিক ও পারত্রিক দুই জীবনকে যুক্ত করিয়াছে। বাণীদেবীর বরপুত্র হয়ত বাউলেরা নয়, কিন্তু বীণাপাণিই ইহাদের লৌকিক ও পারমার্থিক দুই জীবনেরই একমাত্র আরাধ্যা! ইহারা তারস্বরে রবীন্দ্রনাথের মতো বলিতে পারে—

"যে দিন জগতে চ'লে আসি,
কোন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশি।
বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হ'য়ে আপনার সুরে
দীর্ঘ দিন দীর্ঘ রাত্রি চ'লে গেনু একান্ত সুদূরে
ছাড়ায়ে সংসারসীমা। সে বাঁশিতে শিখেছি যে সুর
তাহারি উল্লাসে যদি গীতশূন্য অবসাদ-পুর
ধ্বনিয়া তুলিতে পারি, মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সঙ্গীত * * *
তবে ধন্য হবে মোর গান॥

বাউলেরা একশ্রেণীর কর্ত্তাভজা, কোন-না-কোন গুরুর চেলা তাহারা। সরাসরি ভগবানের সন্ধান ইহারা করে না—একজন গুরু, বা 'সাঁই' এর (স্বামীর) মারফতে বাউলদের পরম পুরুষের সন্ধান; গুরু যে পথে তাহাদের লইয়া যাইবেন সেই পথেই অন্ধভাবে অনুসরণ করাই ইহাদের বিধান।

গুরুর উপর নির্ভর করার প্রথাটা এই দেশে সুপ্রাচীন! চর্য্যাপদের যুগ হইতে বাঙ্গালী সাধক গুরুর চরণে জীবনের দায়িত্ব ভার অর্পণ করিয়া আসিতেছে।

এই গুরুই অধিকাংশ স্থলে আবার ভগবানের সঙ্গে অভেদাত্মক।

ঠিক্ যেমন সাধারণ হিন্দু গৃহস্থের কৌলিক দেবতার মূর্ত্তি ভগবানের সঙ্গে অভেদাত্মক। গুরু হইল ইষ্টদেবতার রক্তমাংসের জীবন্ত প্রতীক। বাউলদের জীবন ডিঙ্গায় গুরুই কর্ণধার। তাই গুরুকে স্মরণ করা হয় এই ভাবে—

ড্যাং ড্যাং ডাঙ্গায় ডিঙ্গে, চালায় আবার সে কোন জন,
কুবীর বলে শোন শোন শোন, ভাবো গুরুর শ্রীচরণ ॥

আধুনিক বাউল গানেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই—

আমার গুরুর আসন কাছে, সুবোধ ছেলে ক'জন আছে,
অবোধ জনে কোল দিয়েছেন, তাই আমি তাঁর চেলা রে।"

বাউল সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনে গঠিত, তাহাদের সাধন ধর্মে সুফী ও বৈষ্ণব উভয় মতের সম্মিলন হইয়াছে সর্ব্বসংস্কারমুক্তির পথে। কিংবা বলা উচিত ব্রাহ্মণ্য ও ইস্‌লামী উভয় সংস্কারকেই বর্জ্জন করিয়াছে। এই সকল সংস্কার তাহাদের সাধনার বাধা—

তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মস্‌জেদে
তোমার ডাক শুনি সাঁই, চল্‌তে না পাই
রুইখ্যা দাঁড়ায়ে গুরুতে মুরশেদে ॥

বাউলেরা নিজেদের 'পাগল' বলিয়া পরিচয় দেন, নিজেদের খাপ্‌ছাড়া আচার ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া রাখেন। বাউল কথাটাই 'বায়ুল' বা বাতুল হইতে জন্মিয়াছে। এই নাম বাউলরা নিজেরাই বরণ করিয়াছে। বিধি-নিষেধের শাস্ত্রীয় শাসন ও লোকাচার দেশাচারের অনুশাসন মানিয়া চলাই হইল প্রকৃতিস্থতা। এ হিসাবে বাউলরা অপ্রকৃতিস্থ, কাজেই পাগল। এই অর্থেই বাউলরা নিজেদের পাগল বলেন—

তারে কৈ পেলুম সই, হলাম যার জন্য পাগল।
ব্রহ্মা পাগল বিষ্ণু পাগল আর পাগল শিব।

তিন পাগলে যুক্তি করে ভাঙলো নবদ্বীপ ॥
আর এক পাগল দেখে এলাম নবদ্বীপের পথে।
রাধা প্রেম সুধা ব'লে করোয়া কান্তে হাতে ॥

বাউলদের গানের সর্বত্রেই ইঙ্গিত ব্যঞ্জনা—ঠারে ঠোরে কথা বলার প্রথা প্রাচীন বাংলার অধ্যাত্ম-সাহিত্যের সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। ভাবপ্রকাশের এই বিচিত্র ভঙ্গীই তাহাদিগকে রহস্যরসের সাধক করিয়া রাখিয়াছে। তাহা ছাড়া, যাহা 'বাক্‌পথাতীত', যাহা ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য তাহাকে সরলভাষায় কেমন করিয়া বলা যাইবে?

সহজ ভাবকে প্রকাশ করা তো সহজ নয়! বাউল এবং দেহতত্ত্বের গানে সেই আধ্যাত্মিক সাধনার সহজ তথ্যই রহস্যময়ী ভাষায় প্রকাশ পায়। তাহাদের গানের ভাষা তাই প্রহেলিকার ভাষা। গানগুলির প্রকৃত অর্থ সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না বলিয়াই তাহা চিত্তকে এত উদাস করে!

এই প্রহেলিকাময়ী ভাষায় আছে Symbolism ও Suggestiveness. এই দুটি উচ্চশ্রেণীর আর্টের অঙ্গ। এই ভাষা যতটুকু ভাবের দ্যোতনা করে, তার চেয়ে ঢের বেশি ভাবায়। এই রহস্যময়তার জন্য বাউলের গান উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য।

বাঙলাদেশে মুসলমান-শাসন ছিল কয়েক শতাব্দী ধরিয়া অব্যাহত, এই দেশের গ্রামে গ্রামে সেই সময়ে রাজধর্ম বিস্তার লাভ করিয়াছিল; সহজিয়া সংস্কৃতিতে ইস্‌লামী ছাপ গভীরভাবে পড়িবার সুযোগ হয় তখন। জারি এবং মুর্শিদা গান বাউল হইতেই উদ্ভূত।

বৈষ্ণবদের প্রেমের মতন বাউলদের প্রেমও লৌকিক স্তরের নয়। তবে বাউলেরা সাধারণ নরনারীর দৈনন্দিন কার্য্যকলাপের বাহিরে—তাহাদের সহিত সম্পর্কশূন্য কোন কিছুর কথা কোথাও বলেন নাই।

বাউলদের গানের 'মনের মানুষ' তাহাদের আপন মনের মাধুরী দিয়া

গড়া। সহজ সাধনার দ্বারা এ Man Idealised কে ভালোবাসায় পরমতত্ত্বের রসোপলব্ধিই তাহাদের ত চরমলক্ষ্য।

চর্য্যাপদের সিদ্ধাচার্য্যগণের ন্যায় বাউলরাও বারবার নরনারীদের দৈহিক সম্বন্ধের কথা বলিয়াছিলেন তাহাদের দেহতত্ত্বের গানে। এই নরনারীর দেহ সম্বন্ধ symbolism ছাড়া কিছু নয়,—আত্মা পরমাত্মারই কথা। অন্যতর উদ্দেশ্য প্রহেলিকার সাহায্যে যাহারা ঐন্দ্রিয়িক সুখ ছাড়া অন্য কোন তীব্রতর সুখের সন্ধান জানে না, তাহাদের দিব্যানন্দের আভাস দেওয়া,—ইহা এক প্রকারের লোক শিক্ষা। চর্য্যার উপমা প্রভৃতি বাউলেরাও অনেক স্থলে হুবহু গ্রহণও করিয়াছেন ; যেমন একটি উপমা—

মূঢ়া দিঢ় না ঠ দেখি কা অর ভাগ তরঙ্গ কি সোসই সা অর ॥
মূঢ়া আছন্তে লো অ ন পেখই দুধ মাঝে লড় আছন্তে ণ দেখই ॥

এই দুধের ইঙ্গিতটি এই বাউল গানটিতেও সুস্পষ্ট—

ওরে আমার মন গোয়াল !
দু বেলা তুই দুধ যোগাবি
ঐ কথাটি আঁটি আঁটি দুধ তুই আমারে দিবি।
ঘরে আছে ধর্ম গাভী, তাহার দুধ দুইয়া লবি।
কামধেনুর দুধ দুইয়া খাবি, যখন চা'বি তখন পাবি।
সাধুর সনে যাবি গোঠে আনবিরে দুধ নিকষ পটে।
অসৎ সঙ্গে লাগিলে ছিটে নষ্ট হবে দুধ, সব খোয়াবি ॥

রামপ্রসাদী সুরের মধ্যে তত্ত্বচিন্তায় গূঢ়রূপটি যে ভাবে পাই, বাউলের গানের মধ্যেও অনেক স্থলে তাহার অনুরূপ ছায়াপাত দেখা যায়। এই বাউল গানটির—

আমার মন পাগলা হলরে, ডাকি গুরু বলে,
ঐরূপ যখন মনে পড়ে আমি ভাসি নয়নের জলে।

গুরু আমার পূর্ণশশী, আমি ঐ চরণে হব দাসী ;
ঐরূপ ভালবাসি, ওরে কাজ কি আমার গয়া কাশী ;
ওরে কাজ কি এ ছার কুলে ॥

রামপ্রসাদী গানের মধ্যেও বাউলসুরের যথেষ্ট ছায়াপাত হইয়াছে। উপরের বাউলের কথার প্রতিধ্বনি দেখি রামপ্রসাদী সুরে—

'আর কাজ কি আমার কাশী।
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী' ॥

মুসলমানি লৌকিক গানেও ইহার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়—

যাইতে ত চায় না রে মোর মন মক্কা আর মদিনা।
হেথায় যদি আল্লার পাইবে কুদ্রৎ ॥

বাউলের গুরু জীবিতও হইতে পারে, মৃতও হইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন তিরোহিত মহাপুরুষ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের গুরুস্থান অধিকার করিয়াছেন। যেমন—

যাহারা মূলতঃ 'গৌরপারম্যবাদে' বিশ্বাসী অর্থাৎ বাঙ্গলার 'মনের মানুষ' শ্রীগৌরাঙ্গকেই যাহারা গুরু বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদের বলা যায়—'গৌর-বাউল'। তাহাদের গানে সোনার গৌরাঙ্গের উল্লেখ থাকে,

কার ভাবে গৌরবেশে, মজালে হে প্রাণ।
প্রেম সাগরে উঠ্‌লো তুফান, থাকবে না আর কুলমান ॥

আর এক শ্রেণীর বাউলের গুরু নবী ছাড়া আর কেহই নয় ; ইহারা ইস্‌লামী ধারার সাধনা করে—ইহাদের নাম 'ফকির বাউল' বা দরবেশ বাউল। ইহাদের গানে নবীর নামোল্লেখ থাকে যেমন—

নবীর তরীক্ ঠিক্ রাখি কেমনে আমি, তা বুঝতে পারলেম না,
আমি তা ঠিক্ রাখতে পারলেম না।
ও নবীর তরীক জানা, সে ভেদ মানা, ও তার ঠিকানা পাই কোনে ?

মুসলমান সাধকদের মতে ভক্ত সিদ্ধিলাভ করে চার ভাবে—শরিয়ৎ, মারেফৎ, হকিকৎ, তরীকৎ। শরিয়ৎ কোরাণ শরিফ ও হাদিস শরিফের অনুশাসনের পথ। মারেফৎ মুরশেদ বা গুরুর নির্দ্দেশিত পথ। হকিকৎ—দিব্য স্বষ্টিতে উপলব্ধ সত্যের পথ আর তরীকৎ বিবিধ আচার অনুষ্ঠানের পথ। উল্লিখিত-গানটি তরীকৎ। পথের সম্বন্ধে তত্ত্ব জিজ্ঞাসার ব্যাকুলতার গান।

আর এক শ্রেণীর বাউলেরা তান্ত্রিক সাধনভজনে বিশ্বাসী; চর্য্যাপদ হইতে রামপ্রসাদ পর্য্যন্ত বাংলার তান্ত্রিক সাধনার যে ক্রমোন্মেষ ও পরিণতি হইয়াছে, এই শ্রেণীর 'তান্ত্রিক বাউল'রা সেই ধারার উপাসক। সেই ধারায় গান—

দুই দলে বিরাজ করে সহজ মানুষ চিনিলে না—
মনের মানুষ হয় যে জনা।
এক দম হাওয়ায় চলে, আর এক দম ঘুরছে কলে,
আর এক দম সত্য হলে, অনায়াসে মিলে।
ও তার দশ দরজা বন্ধ হলে, তখন মানুষ উজান চলে,
স্থিতি হয় দশম দলে, চতুর্ দলে বারাম খানা।

এই সকল বিবিধ শ্রেণীর বাউল গান ও বাউলিয়া তত্ত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোন সম্পর্ক নাই।

বাউলের সুরের মধ্যে বৈচিত্র্য আছে। প্রচলিত রাগরাগিণী বাউলদের অথৈ রসের হ্রদে থৈ পাইল না; বাউলদের নবসাধনার সঙ্গে প্রয়োজন হইল নূতন সুরের। কীর্ত্তনের মতন বাউল সৃষ্টি করিল নূতন সুরভঙ্গীতে নূতন গীতি-রীতিতে নূতন গান। এই সুরের কৌলীন্য বা আভিজাত্য না থাকিলেও মাধুর্য্য আছে। 'গৌড়মল্লার'কেই মনে করা যাইতে পারে বাউলের মূল সুর—এই গয়ড়া বা গৌড়রাগ বাংলা বা গৌড়দেশের নিজস্ব রাগিণী। মুসলমান

শাসনেও রসিক সমাজ এই গৌড়মল্লারকে বাঙ্গালীর সুর বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছিলেন।

পরে বাংলার অন্যতর নিজস্ব বস্তু—কীর্ত্তনের সুর বাউলের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। কবি তাঁহার গানে সে পরীক্ষাও করিয়াছেন।

চিরকালই সাঙ্গীতিক ক্রমবিকাশে এক সময়ের লোক-সঙ্গীত পরের যুগের উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের মর্যাদা পাইয়া আসিয়াছে। ধ্রুপদ ছিল গোয়ালিয়রের মেয়েদের ঘরোয়া গান, বক্সু, ভন্নু, তানসেন প্রভৃতির যত্নে তাহাই দরবারে আসন পাইল। খেয়াল ছিল খয়রাবাদ অঞ্চলের লোক গীতি, সুলতান হোসেন শাহ সির্কীর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং আমীর খসরু, গোপাল নায়ক প্রভৃতির প্রসাদে তাহার এই রূপ লাভ। টপ্পাও এই ভাবে ঝাঙ্গ জেলার লোক সঙ্গীত হইতে মর্য্যাদার আসন পাইয়াছে।

(২)

রবীন্দ্র-সঙ্গীতে বাউল গানগুলিই তাঁহার শ্রেষ্ঠ মরমী গান। বাংলার অতি-পরিচিত গ্রাম্য বাউল সুর কবিগুরুর কণ্ঠে অপূর্ব্ব অভিজাত রূপ পাইয়াছে। তাঁহার নিজের কথায়—"বাঙ্গলা ভাষায় আউল ও বাউলের গানে, মেয়েদের ছড়ায়, ঝরণার জলে নুড়ির মতো হসন্ত শব্দগুলো পরস্পারের উপর পড়িয়া ঠুন্ ঠুন্ শব্দ করিতেছে। ভদ্র সাহিত্য-পল্লীর গম্ভীর দীর্ঘিকার স্থিরজলে সে হসন্তের ঝঙ্কার নাই। আর সেই জন্যই সাধুভাষায় ছন্দটা যেন মোটা ফাঁকওয়ালা জালের মতো, আর অসাধুটির একেবারে ঠাসা বুনানি।"

বাউল গানের ভাববস্তুর জন্য নয় তাহার হসন্তবহুল ভাষা ও ছন্দই কবিকে বাউল সুরের দিকে আকৃষ্ট করে। কবির বাঙ্গালী জন সুলভ উদাসী-প্রাণে নিজস্ব একটা বাউলিয়া ভাব ছিল। এই দুইএর মিলন ঘটিয়াছে কবির বাউল সুরের গানগুলিতে।

পশ্চিমবঙ্গের পল্লী অঞ্চলে প্রতিবৎসর শরৎ-হেমন্তে এই বাউলের দল পথে বাহির হয়, স্থানে স্থানে তাহাদের একতারা অথবা গাব্-গুবাগুব যন্ত্র বাজিতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ তাহাদের সেই অন্ত্যজ গানের মধ্যে বাংলার প্রাণস্পন্দন শুনিতে পাইলেন। বাংলাদেশের গ্রাম্য জীবন ও প্রকৃতির সহিত কবির অন্তরের সুগভীরযোগ ছিল, অবসরসময়ে গ্রামে যাইয়া শুনিতেন পদ্মার মাঝির গান, সৃষ্টি করিতেন তাঁহাদের সুরে "গ্রামছাড়া ঐ রাঙ্গামাটির পথ"—শুনিতেন মাঠে হাল-চষা কৃষাণের গান, তাহাদের সুরে বাঁধিতেন'—'আমার সোনার বাংলা"; পথে ভিক্ষা-মাগা বৈরাগী বোষ্টমদের গান, তাহাদের সুরে রচনা করিতেন "নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে"—(মিশ্র বিভাস, কাশ্মীরী খেমটা)। আর গৃহকর্ম্মরত শান্ত নিরুপদ্রব গৃহস্থের আঙ্গিনার বধূর গান শুনিয়া তিনি রচনা করিতেন—"আমার হিয়ার মাঝে, "মালা হ'তে খসে পড়া ফুলের একটি দল," "কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা"।

স্বতই বাংলার অমার্জ্জিত পল্লীপ্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিব্যক্তি বাউল গানগুলিতে আছে বলিয়া বাউলের সুর কবিকে শুধু মুগ্ধ করে নাই, তাঁহার অন্তরে সৃজনী শক্তির উদ্বোধন করিয়াছে, নিজের বাঙ্গালী মনের অনুভূতিকে তিনি এই সুরে রূপদান করিয়াছেন।

অবশ্য বাউলের সহজ সুরটিকে অনেকে লঘু তরল ভাবের প্রকাশক রূপে ব্যবহার করিয়াছেন। রূপচাঁদ পক্ষী, দীন বাউল প্রভৃতির গান এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

বাউল গান এবং কীর্ত্তন গান উভয়ই বাংলার পল্লীর গান, কিন্তু সুরের বিন্যাসে উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য। কীর্ত্তনগানের একটি বৈজ্ঞানিক নিগড় আছে, একমাত্র আঁখর ভিন্ন তাহার নিয়মভঙ্গের কোনই পন্থা নাই; কিন্তু বাউল গানে সেইরূপ কোন শাসন বাঁধন নাই। অথচ কীর্ত্তনের ধুয়ার এবং আঁখরের মত বাউলেরও সুরের টান

এবং আঁখর আছে—গান প্রতিবার সেই টানে আসিয়া শেষ হয়। বাধাবন্ধনহীনতার জন্য কবি বাউল সুরকে তাঁহার ভাবের বাহন করিয়াছেন। আবেগের সঙ্গে সুরের গতির স্বাধীনতা আছে; রবীন্দ্রনাথের বাউল গানে তাই ইমনকল্যাণ হইতে পিলুর প্রভাব, তথা হইতে মল্লার অথবা গৌড়সারঙে আবার পিলুর প্রভাবে, সুরের গতির কোন বাধা নাই। পিলুরাগিণীর গতিভঙ্গীই অবশ্য কবির বাউলগানের প্রধান আশ্রয়। বাউল গানের 'পথহারা কোন বৈরাগীর একতারায়' কবি পাইলেন প্রথম স্বেচ্ছামত সুরবিহারের অধিকার। এ গানেও রাগসঙ্গীতের সুর কাজে লাগাইলেও নির্দেশ অনুসারে নয়, সঙ্গতি অনুযায়ী স্বচ্ছন্দভাবে রাগকে ব্যবহার করিয়াছেন। কবি বলেন—

"ক্ষণে ক্ষণে এ রাগিণী ও রাগিণীর আভাস পাই কিন্তু ধরতে পারা যায় না। অনেক কীর্ত্তন ও বাউলের সুর বৈঠকী গানের একেবারে গা ঘেঁসে গিয়েও তাকে স্পর্শ করে না। ওস্তাদের আইন অনুসারে এটা অপরাধ, কিন্তু বাউলের সুর যে একঘরে, রাগ রাগিণী যতই চোখ রাঙাক সে কিসের কেয়ার করে!"

মানভূম অঞ্চলের লোকসঙ্গীত 'ঝুমুর' এবং বাংলাদেশের কীর্ত্তনের সঙ্গে যে ঝুমুর গাওয়া হয় উভয়ই প্রায় একই অঙ্গের। এই ঝুমুরও আর এক শ্রেণীর বাউল।

বাউল গানের সুর ও ভাব আমাদের অন্তরে একটা সাড়া জাগায়। এই গান অতি সহজ সুরে আমাদের সঙ্গীতের তৃষ্ণা না মিটাইলেও সুপ্ত হৃদয়বৃত্তিগুলিকে জাগাইয়া দেয়; কেবল বাউল নয়, সকল গ্রাম্য গীতের সুরের সম্বন্ধে এইটাই সবচেয়ে বড় কথা। এইসব গানে সুরের ঐশ্বর্য্য নাই, চাতুর্য্যও নাই, কিন্তু মাধুর্য্য আছে এবং বাঙ্গালীর প্রাণের সঙ্গে সুগভীর

সংযোগ আছে। এই মাধুর্য্যই গানগুলিকে আয়ুষ্মান করিয়া রাখিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"আমাদের সঙ্গীতও রাজসভা সম্রাটসভায় পোষ্যপুত্রের মত আদরে বাড়িতেছিল। সে সব সভা গেছে, সেই প্রচুর অবকাশও নাই, তাই সঙ্গীতের সেই যত্ন আদর, সেই হৃষ্টপুষ্টতা গেছে। কিন্তু গ্রাম্য সঙ্গীত, বাউলের গান, এ সবের মার নাই। কেননা, ইহারা যে রসে লালিত সেই জীবনের ধারা চিরদিনই চলিতেছে। আসল কথা, প্রাণের সঙ্গে যোগ না থাকিলে বড় শিক্ষাও টিকিতে পারে না।"

বাউল গানে স্বাভাবিক সহজ সরল কথাই বৈশিষ্ট্য। কাব্যালঙ্কার অথবা শব্দঝঙ্কারের আদর এই সকল গানে মোটেই নাই। গূঢ়তত্ত্ব, ভগবদ্ভক্তি, আধ্যাত্মিকতার সন্ধানে কর্ণকে অনবহিত করাই রস-গ্রহণের পক্ষে শ্রেয়ঃ। রবীন্দ্রনাথের মতো মার্জিত রুচির কবির পক্ষে গ্রাম্য বাউল গানের অসংস্কৃত প্রকাশভঙ্গী বজায় রাখা মনে হয় বেশ শক্ত কাজই হইয়াছিল। **লালন সাঁই** নামক একজন তখনকার বাউল ফকিরের সহিত ব্যক্তিগত পরিচয় কবিকে এ বিষয়ে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। লালন ফকির রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ জমিদারীর একজন প্রজা ছিলেন। তাঁহার অনেক মূলগান রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশও করেন। লালনের সুবিখ্যাত গান—

আমি একদিন না দেখিলাম তারে।
আমার বাড়ীর কাছে আর্শিনগর এক পড়্‌শী বসত্‌ করে॥

যে অমার্জিত প্রতিভার সতেজ প্রাণস্পন্দন দুর্ব্বল প্রকাশভঙ্গীর জন্য বহুদিন রুদ্ধ ছিল দেহতত্ত্বের গানের সঙ্কীর্ণ পরিবেষ্টনীতে, তাহাই রবি-করস্পর্শে বাংলার নাগরিক সমাজে প্রথম সাড়া জাগাইল। তখন এই সুর, এই ছন্দ এই ভাষা, এই সুরসঙ্গত আমাদের অতি আপন

বস্তু বলিয়া মনে হইল—আমরা কেন যে এ রস গ্রহণে বঞ্চিত ছিলাম এতকাল, তাহা ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম !

তবে নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, কাঙাল ফিকির চাঁদ প্রভৃতি বহু বিখ্যাত সঙ্গীতরচয়িতাদের অনেক সুপ্রসিদ্ধ গানও বাউলের সুরে রচিত। স্বদেশী গানের অধিকাংশই রচিত হইত জনপ্রিয় বাউলের সুরে। বিস্মৃতপ্রায় অখ্যাত সেইরকমই বাউলগানের কিছু কিছু কবি তাঁহার চয়নিকায় স্থান দিয়াছিলেন,—তাহাদের কয়েকটি নিদর্শন—

(১) আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে দেশবিদেশে বেড়াই ঘুরে ॥
লাগি সেই হৃদয়-শশী, সদা প্রাণ রয় উদাসী,
পেলে মন হোত খুসী, দেখ্‌তাম নয়ন ভ'রে ॥
আমি প্রেমানলে মরছি জ্বলে,
নিভাই কেমন ক'রে, মরি হায়, হায় রে। (**গগন হরকরা**)

গগনের এই বাউলের "আমার মনের মানুষ" ও আঁখর "মরি হায়, হায় রে" এবং এই শ্রেণীর বহু বিশিষ্ট বাণী-ভঙ্গী রবীন্দ্রনাথের বহু গানে পাওয়া যায়। "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি" গানের সুর ও 'মরি হায় হায়' আঁখরটি রবীন্দ্রনাথ পাইয়াছেন গগন হরকরার ঐ প্রসিদ্ধ বাউলগানটি হইতেই।

(২) নদি, বলরে বল, আমায় বল রে।
প্রেমতরঙ্গে তুমি কর টলমল রে।
তুমি নেচে নেচে ছুটে বেড়াও (মরি হায় হায় রে নদী)
যারে নিকটে পাও তারে নাচাও ॥ (**ফিকির চাঁদ**)

'মরি হায়, হায় রে' বাউলের অতি প্রচলিত আঁখর। কাঙাল ফিকির চাঁদের উল্লিখিত সুপ্রসিদ্ধ বাউলেও সে আঁখরটি রহিয়াছে।

(৩) নিঠুর গরজী, তুই কি মানস-মুকুল ভাজবি আগুনে ?
তুই ফুল ফুটাবি, বাস ছুটাবি সবুর বিহনে ?
দেখ্‌না আমার পরম গুরু সাঁই,
সে যুগযুগান্তে ফুটায় মুকুল (তার) তাড়াহুড়া নাই ॥ **(মদন বাউল)**

(৪) আমার ডুব্‌ল নয়ন রসের তিমিরে—
কমল যে তার গুটাল দল আঁধিয়ার তীরে।
গভীর কালোয় যমুনাতে চলছে লহরী,
(কালোয় ঢালা যমুনাতে রসের লহরী)
ও তার জলে ভাসে কানে আসে রসের বাঁশরী ॥ **(পদ্মলোচন)**

(৫) আমি মজেছি মনে।
না জানি মন মজল কিসে, আনন্দে কি খোদ-মরণে।
ওগো এখন আমায় ডাকা মিছে,
আমার নাই যে হিসাব আগে পিছে,
আনন্দে এই মন নাচিছে
শোন্‌ তার নূপুর বাজে রাত্রে দিনে ॥ (**ঈশান যুগী**)

(৬) অচিন ডাকে নদীর বাঁকে ডাক যে শুনা যায়।
(কূলে ভিড়া, ক্ষণেক জিরা)
অকূল পাড়ি থামতে নারি সদাই ধারা ধায় ॥
ধারার টানে তরী চলে ডাকের চোটে মন যে টলে,
টানাটানি ঘুচাও জগার হৈল বিষম দায় ॥ (**জগা কৈবর্ত্ত**)

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ বাউল গান ভাব ও সুরের জন্য এই সকল অবজ্ঞাত সুর সাধকদিগের প্রচলিত গানের নিকটই ঋণী !

বাউল, ভাটিয়ালী প্রভৃতি লোকসঙ্গীতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে,—ইহাতে গ্রাম্য-পরিবেশ এবং গ্রাম্য-বাচনরীতি থাকে। কবি এ শ্রেণীর গানে অলঙ্কৃত ও মার্জিত ভাষা ব্যবহার করায় তাহার স্বাভাবিকতা

কতকটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন—"বাউল গানের গ্রাম্যতা দোষ পীড়া দিতে থাকলো কবিকে। এখানে কথার প্রাধান্যই বেশি সুরের আভিজাত্য নেই, তার কৌলীন্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কাঠামো ভাঙ্গল বটে, কিন্তু সুরের গভীরতা এসে পৌছলনা।"

সুরের সৌষ্ঠব বাড়াইবার জন্য কবি যেমন রাগিণীমিশ্রণ করিয়াছিলেন, ভাষায়ও তেমনি চল্‌তি গ্রাম্য শব্দের সঙ্গে ভাবগভীর শব্দ ব্যবহার করিলেন। ইহাতেও তাঁহার বাউল গানের স্বধর্ম্মচ্যুতি ঘটিয়াছে। বরং অতুলপ্রসাদ বাউলগানের স্বধর্ম্ম অনেকটা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন।

ঔদাস্যময় কারুণ্যের সুরটি বাউলের গানের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এই সুরে মীড়ের ভাঁজে ভাঁজে একটা সংসারক্লান্তির আবেশ আছে, এই ভাবটি ফুটিয়াছে কবির—(১) তুমি এবার লহো হে নাথ। (২) তুমি যত ভার দিয়েছ আমায় করিয়া দিয়াছ সোজা। (৩) তুমি এপার ওপার করো খেয়ার নেয়ে প্রভৃতি গানে।

বাংলার বিশেষতঃ রাঢ়বাংলার পল্লীতে দুইটি মর্ম্মস্পর্শী সুর শোনা যায়—একটি রামপ্রসাদী, অপরটি বাউল। বাউলের গানের যে চিরন্তন দুঃখবাদ তাহা বৌদ্ধ সহজিয়াদিগেরই প্রভাব। রামপ্রসাদী গানে এই দুঃখবাদ নাই, রামপ্রসাদী সাংসারিক ভক্তের ভক্তিসাধনার গান। বাউল সংসার-সমাজকে এড়াইতে চাহিয়াছে, রামপ্রসাদী সংসার ও বৈরাগ্যের সমন্বয় সাধন করিয়াছে। সংসারী ভক্তদের পক্ষে রামপ্রসাদী গান বাউল গান অপেক্ষা অধিকতর সহজ সাধনপন্থার নির্দ্দেশ দিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের অন্তর্জীবনে একটি বাউল পুরুষ চিরদিন গাহিয়াছে "তাইরে নাইরে নাইরে না।" সাংসারিক বন্ধন তাঁহাকে কখনও জড়াইতে পারে নাই, খ্যাতির ফুলের মালাও তাঁহাকে বাঁধিতে পারে

নাই, সেখান হইতে বহুবার তিনি সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, সকল বাঁধন, সকল সংস্কার হইতে রসিক আত্মার মুক্তিই ছিল তাঁহার সাহিত্য রস-সাধনা ধারার আদর্শ! অনেক জায়গায় তিনি নিজেকে তাই 'কবি বাউল' আখ্যা দিয়াছেন! ফাল্গুনী গীতিনাট্যে "শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথের হাতে কবি বাউলের এক তারার মত নাট্যকাব্যটি" উৎসর্গ করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের বাউলগানগুলির স্বরপর্য্যায়ের সমশ্রেণীর গান পূর্ব্ববঙ্গের সারি গান। পূর্ব্ববঙ্গ জলের দেশ, তাহার স্বরগত বৈরাগ্যও তাই অশ্রু জলের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। রবীন্দ্রনাথের পল্লী-গানে পশ্চিমবঙ্গের বাউলের ন্যায় পূর্ব্ববঙ্গের সারিগানের আকুতি ও ব্যাকুলতার অনুভূতিও রূপ পাইয়াছে। বাঙ্গালীর পল্লীজীবনে দুঃখ ও বৈরাগ্যই সর্ব্বস্ব, তাই বাউল, কীর্ত্তন, সারি কোন গানেই উল্লাসের অভিব্যক্তি নাই।

পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীসঙ্গীত 'ভাটিয়ালী' গান একক কণ্ঠের, আর সারিগান chorus বা সারিবদ্ধ মাঝি-মাল্লাদিগের মিলিত কণ্ঠের গান। ডাঃ আর্ণল্ড বাকে সাহেব তাঁহার 'রবীন্দ্র-সঙ্গীতে'র পরিচয়প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"Tagore has absorbed the age-long tradition of mystic songs from the Kirtans, Bauls and this popular tune of Sarigan. In them he found nourishment and help as well as a material which he has stamped with his strong personality. He is thus at once more than an isolated creative artist." রবীন্দ্রনাথের সারিগানের সুরের গানগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

(১) গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ। (২) বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা। (৩) আমি কান পেতে রই।

(৪) যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন। (৫) তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে। (৬) থর বায়ু বয় বেগে।

ভাটিয়ালী সুরের গান রবীন্দ্র-সঙ্গীতে নাই। রবীন্দ্রনাথের মার্জ্জিত সংস্কৃত রূপে পূর্ব্ববঙ্গের বিকৃত অশুদ্ধ উচ্চারণবিশিষ্ট ভাটিয়ালী গানের বৈশিষ্ট্য আশা করাও যায় না।

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ বাউলের গানে কীর্ত্তন গায়নভঙ্গী এবং সুরের বিশেষ প্রভাব আছে। রবীন্দ্রনাথের এই ধারার 'বাউলিয়া কীর্ত্তন' গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

(১) বক্ষে তোমার বাজে বাঁশী; (২) আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায়; (৩) এবার দুঃখ আমার অসীম পাথার

'বাউল-কীর্ত্তন' ভঙ্গী অতুলপ্রসাদ সেনের গানেও আছে; যেমন— * আর কতকাল রইব বসে, মেঘেরা দল বেঁধে যায়, যদি তোর হৃদ্ যমুনা হ'লরে উছল রে ভোলা প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথের বাউলগানে ছন্দের বৈচিত্র্য নাই। বাউল গান সাধারণ জনগণের গান, সেখানে সুরের ন্যায় ছন্দেরও বৈচিত্র্য আশা করা যায় না। কবির বাউল গানে প্রধানতঃ দুইটি তালের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়—একটি তিন মাত্রাবিশিষ্ট দাদরা এবং অপরটি চার মাত্রার কাহারবা। দুই একটি গানে ঝাঁপতাল, ঠুংরি এবং সুরফক্তাও ব্যবহৃত হইয়াছে। ছয় মাত্রার 'কাশ্মীরি খেমটা' প্রচলিত বাউলের বিশিষ্ট ছন্দ; রবীন্দ্রনাথ অনেক গানে তাহাও বজায় রাখিয়াছেন যেমন,—আকাশ হতে আকাশ পথে, নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ বাউলই দ্রুত লয়ের, গানে কথার দীর্ঘতা সেই জন্যই হয়ত রক্ষা করা গিয়াছে! মৃদুলয়ের দাদরা তালের 'এবার দুঃখ আমার অসীম পাথার' বাউলটির মধ্যেও ছন্দের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে। তালের অপূর্ণতা পূর্ণ করিয়াছে নৃত্য, গানের সঙ্গে

বাউলের নাচ অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। যদিও এই নৃত্য কোন সুরসঙ্গত নয়, বাউলের স্বতঃস্ফূর্ত অন্তরের অভিব্যক্তিই প্রকাশ পায় এই পদসঞ্চারে; প্রাণের আবেগ রূপ পায় বাউলের নাচে এবং এই নৃত্যের গতিই বাউল গানের বিশিষ্ট ছন্দ।

বাউল গানের সম্পূর্ণতা তাহার নিজস্ব যন্ত্রসঙ্গীতের উপরও অনেকটা নির্ভর করে। বাউল গানের বিচিত্র সঙ্গত একতারা এবং গাবগুবাগুব (গোপীযন্ত্র) ব্যতীত ঐ গানের রসগ্রহণ সম্ভব নয়। গানের সুর, তাল কথা, আবেগ সকলই তাহার ঐ বিচিত্র সঙ্গতের দ্বারাই যেন নিয়ন্ত্রিত হয়। একতারা ব্যতীত আরও দুইটি যন্ত্রসঙ্গীত বাউলের আছে—একটি হইতেছে খঞ্জনী অথবা মন্দিরা, অপরটি নূপুর। কীর্তনে যেমন খোল ব্যতীত সুর রূপ পায় না, বাউলেও এই কয়টি বাদ্যযন্ত্র ব্যতীত তাহার নিজস্ব সুর-সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয় না।

প্রচলিত বাউল গানের সুরের মধ্যে বৈচিত্র্য নাই, প্রায় সমস্ত বাউলই একই বিশিষ্ট লৌকিক ঢঙ্গে গাওয়া হয়। বাউল গানের রচয়িতারা সাধক হইলেও বিজ্ঞানী ছিলেন না। সুর-বৈজ্ঞানিক কবি তাঁহার বাউলে সুরের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করিয়াছেন নানা ভাবে,—ধ্রুপদের সুনিয়ন্ত্রিত কাঠামোয় বাউলের সুরকে আনিয়াছেন, নানা রাগিণীর সঙ্গে মিশাইয়া অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাঁহার সুপরিচিত গীতিরীতির সঙ্গে প্রচলিত বাউলিয়া গায়ন ভঙ্গীর সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছেন, সবার উপর সুমধুর শব্দসজ্জায় বাউলের গ্রাম্য গানকে আভিজাত্য দিয়াছেন।

প্রচলিত উচ্চাঙ্গ পদ্ধতির ধ্রুপদ জাতীয় গানের ন্যায় রবীন্দ্রনাথের অনেক বাউলেও চারটী স্বতন্ত্র সুর বিভাগ পাওয়া যায়—আস্থায়ী অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগ। সাধারণ বাউলগানগুলি এই শ্রেণীর সুর শৃঙ্খল হইতে মুক্ত।

যেমন, দাদরা ছন্দের 'যেথায় তোমার লুট হতেছে ভুবনে' গানের

যেথায়……কেমনে (আস্থায়ী) সোনার……গগনে (অন্তরা) যেথায় তুমি……কেমনে (সঞ্চারী) নিত্য·……জীবনে (আভোগ)। এ ধরনের সুর-নিয়ন্ত্রিত বাউল তাঁহার আরো আছে যেমন 'ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায়', 'ডাকব না, অমন করে' প্রভৃতি। তবে কবির অধিকাংশ বাউলই দুই তুক্ বিশিষ্ট যেমন, 'কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ' গানে প্রথম দুই লাইন কেবল আস্থায়ী বাকি অংশ তাহার অন্তরা (তাল ঠুংরি)। 'আলো আমার আলো' (তাল দাদরা) গানেও সে রীতি অবলম্বন করা হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের শুদ্ধ বাউল গানগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; প্রথমতঃ ভারতীয় রাগরাগিণীসম্মত সুরে গঠিত বাউল ভঙ্গীর গান এবং দ্বিতীয়তঃ প্রচলিত বাউল সুরের অনুকরণ। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ বাউলই শুদ্ধ সঙ্গীতধারায় গঠিত। তথাপি বাউলিয়া গায়নভঙ্গীর জন্য এই সকল সুরেও আংশিকভাবে প্রচলিত বাউল সুর, কীর্তন এবং অন্যান্য দেশী গাহিবার ভঙ্গী অনুসৃত হইয়াছে। কোন গানেই সম্পূর্ণ একক রাগরাগিণীর অনুকরণ করা হয় নাই; সবই মিশ্ররাগের সৃষ্টি। প্রথম পর্য্যায়ের—

(১) না, না, ডাকব না, অমন করে বাইরে থেকে (পরজের সুরপ্রভাব)। (২) বজ্রমাণিক দিয়ে গাঁথা আষাঢ় তোমার মালা (দেশ রাগিণীর প্রভাব)। (৩) এবেলা ডাক পড়েছে কোনখানে (পূরবী রাগিণীর প্রভাব) (৪) আমি তারেই জানি, তারেই জানি এবং (৫) এবার রাঙিয়ে দিয়ে যাও (পিলুর প্রভাব)। (৬) আমার ভুলতে দিতে নাইকো তোমার ভয় (ভৈরবী রাগিণীর প্রভাব) (৭) কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ (ঠুংরি, বিলম্বিত লয়)। (৮) খর বায়ু বহে বেগে (ইমন ভূপালীর প্রভাব)। (৯) আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায় গানটিতে মূল সুর দেশকার, কবি তাহার সঙ্গে বাউলের সুরও মিশাইয়াছেন—গাহিবার রীতি সম্পূর্ণ কীর্তনের (তাল ঠুংরি)।

রবীন্দ্রনাথের যে বাউলগুলি প্রচলিত বাউল গানের অনুকরণে রচিত, তাহাদের মধ্যে এই পাঁচটির সুর বাংলার নানা অংশে আজিও প্রচলিত রহিয়াছে—

(১) আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে চাও কি (বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া অঞ্চলের "মা যশোদা তোর ছেলে ঘরে যায় কি" গানটির অনুকরণে সৃষ্ট সুর)।

(২) আমার সোনার বাঙলা, আমি তোমায় ভালবাসি (আমি কোথায় পাব তারে—গগন হরকরা)।

(৩) যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে (হরি নাম দিয়ে জগৎ মাতালে—নদীয়ায় টহল বাউল। বাউলের আঁখর 'একলা নিতাই' রূপায়িত হইয়াছে 'ও অভাগায়')—

হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার এক্‌লা নিতাই।
আমার নিতাই যদি মনে করে, (নিতাই প্রেমদাতার শিরোমণি রে)
নামে পাষাণ গলাইতে পারে,
একলা নিতাই (যদি গৌর থাক্‌তো কিনা হতো)
আমার নিতাই যারে দয়া করে, নামে মহাপাতকী উদ্ধারে ॥

(৪) এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে ("মন মাঝি, সামাল সামাল, ডুবল তরী ভবনদীর তুফান ভারি"—সরলাদেবী সংগৃহীত হুগলীর গঙ্গাতীরের বাউল।)

প্রথম কলির বা ধুয়ার সুর রবীন্দ্রনাথের কেবল বাউল গানেই নয়, অন্যান্য বহু গানেই মূল সুর হইতে বিচিত্র দেখা যায়! "আমার সোনার বাংলা" গানটি হইতেই এই সুরবৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যাইবে। ঐ গানটির "মরি, হায়,হায় রে" আঁখররূপে গানের মধ্যে নানা ঢঙে ব্যবহৃত হইতেছে।

রবীন্দ্রনাথের বাউল গানের আলম্বন এবং সুরের বৈচিত্র্যে আমরা পাঁচটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী-বিভাগ দেখিতেছি—

(ক) প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের বাউলের সুর—(১) আমারে কে নিবি ভাই, (২) ক্ষ্যাপা, তুই আছিস্ আপন খেয়াল ধরে, (৩) তোমরা সবাই ভালো, (৪) আমার নাই বা হোলো পাড়ে যাওয়া প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ তখনও যথার্থ বাউল সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসেন নাই। এগুলির গীতিরীতি অনেকটা যান্ত্রিক!

(খ) জাতীয় আন্দোলনের প্রভাব—বঙ্গভঙ্গ এবং স্বদেশী আন্দোলনের সময় (১৩১২) তাঁহার অধিকাংশ দেশ-প্রেমোদ্দীপক গানগুলি রচিত হয়। এই গানগুলির সঙ্কলনের নাম ছিল 'বাউল'; সবগুলি না হইলেও ইহার কয়েকটির ছিল বাউল সুর।

স্বদেশী যুগের এই গানগুলিতে সুরের বিতান অপেক্ষা আবেগই বোধহয় প্রাধান্য পাইয়াছে। প্রচলিত বাউল গানের তত্ত্ব Mysticism-এর, আর আবেগ ভাগবতী অনুভূতির; রস ছিল শান্ত এবং দাস্যের এবং প্রকাশ হইত মৃদু এবং ধীরভাবে। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে বাউল সুরকে যুক্ত করিয়া তাহার রসকে চারণ ধর্ম্মে এবং সুরকে উদাত্ত গম্ভীর উদ্দীপনার পর্য্যায়ে লইয়া গেলেন। এই শ্রেণীর গান—"ও আমার দেশের মাটি।" "যদি তোর ডাক শুনে কেউ।"

(গ) ঋতুমঙ্গলে বাউল সুর—রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির মধ্যে একজন বৈরাগী বাউলের রূপ দেখিয়াছিলেন। নিঃশেষে যে ঋতুরাজ আপনাকে বিলাইয়া দিয়া বসিয়া আছে, তাহার গানে যে বাউল সুর থাকিবেই তাহাতে আর বিচিত্রতা কি! বর্ষাকে কবি 'বাদল-বাউল' বলিয়াই সম্বোধন করিয়াছেন। ঋতু-সঙ্গীতগুলির মধ্যে বাউলিয়াভাবে-প্রভাবিত গান—(১) পথিক মেঘের দল জোটে ঐ, (২) মেঘের কোলে কোলে যায় রে চলে, (৩) বাদল-বাউল বাজায় রে একতারা, (৪) আমারে ডাক দিল কে ভিতর পানে, (৫) কোন খেপা শ্রাবণ ছুটে এল, (৬) সে কি ভাবে গোপন রবে, (৭) ফাগুন হাওয়ায়

হাওয়ায় করেছি যে দান, (৮) ওরে বকুল পারুল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শেষের গানটির মধ্যে ঝুমুরের স্বরও আছে।

(ঘ) প্রাণের গভীর আর্তিপ্রকাশে—সাধারণ প্রচলিত বাউল গানগুলির সুরে করুণ ভাবটিই প্রকাশ পায়। প্রচলিত বাউল সুরের অনুকরণে রচিত রবীন্দ্রনাথের গানগুলির অধিকাংশই এই ব্যাকুলতার সুরটিকে রূপ দিয়াছে। এই গানগুলির মধ্যে—তোমারি নাম বল্‌বো নানা ছলে। আমি তারেই জানি তারেই জানি। এবার রাঙিয়ে দিয়ে যাও। তুমি কোন পথে এলে পথিক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তোরা যে যা বলিস ভাই আমার সোনার হরিণ চাই; আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে প্রভৃতি গানেও এই গম্ভীর আকুলতাই প্রকাশ পাইয়াছে।

(ঙ) সতেজ ভঙ্গীর বাউল—রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীতে যে বাউল সুরের একদা প্রচলন হইয়াছিল; তাঁহার এই শ্রেণীর বাউল গানগুলিতে তাহার অপেক্ষাও সচেতন সুরের প্রকাশ রহিয়াছে। এইগুলির মধ্যে গভীর আত্মসচেতনতার গান "নিশিদিন ভরসা রাখিস"; আত্মোপলব্ধির গান "আমি তারেই খুঁজে বেড়াই", "না, ডাক্‌ব না।" "এই কথাটা ধ'রে রাখিস্ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। "পাগ্‌লা হাওয়ার বাদল দিনে," "ওরে গৃহবাসী" প্রভৃতির দ্রুতচ্ছন্দের উপর সুরবৈশিষ্ট্য নির্ভর করিতেছে।

রবীন্দ্রনাথের রাগরাগিণী সম্মত দৃষ্টি তাঁহার সৃষ্ট বাউল গানের অলঙ্কারহীন বৈরাগী রূপ সহ্য করিতে পারে নাই। তাই তাঁহার বাউল গানেও পল্লীসুন্দরীর প্রসাধনসজ্জার মত রাগিণীসজ্জা করা হইয়াছে! অন্যান্য বহু গানেও বাউলের এরকম সুর মিশিয়া আছে। কবির স্বীকারোক্তি—"বাউল গানের সুর আমার অনেক গানে গ্রহণ করেছি। অনেক গানে অন্য রাগরাগিণীর সঙ্গে আমার

জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিল ঘটেচে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোন এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হ'য়ে মিশে গেছে।”

রবীন্দ্র-সঙ্গীতে আর এক শ্রেণীর গান আছে যেগুলি যথার্থ শুদ্ধ বাউলের সুরে রচিত না হইলেও বাউলের ভাবে-ভঙ্গীতেই গঠিত। এই গানগুলিকে আমরা 'অর্দ্ধবাউল' আখ্যা দিব, যেমন—হৃদয়ের একূল ওকূল দুকূল ভেসে। আমার দোসর যে জন। তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে। ওরে ভীরু তোমার হাতে। আমি মারের সাগর পাড়ি। ভেঙ্গে মোর ঘরের চাবি। এলেম নতুন দেশে। ওগো দখিণ হাওয়া প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গীতিনাট্য এবং রূপকনাট্যে বাউল, বৈরাগী অথবা ঠাকুরদা শ্রেণীর একজন সাধকের চরিত্র আছে; সেই চরিত্রের প্রধান পরিচয় গানেরই মধ্যে; সেই গানগুলির অধিকাংশেই বাউল গানের ভাব, ভাষা, ভঙ্গী এবং সুরধারার প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করা যায়।

বাউলের রূপটি কবি লিপিরেখায় আঁকিয়াছেন—

দূরে অশথতলায় পুঁতির কণ্ঠিখানি গলায়
বাউল, দাঁড়িয়ে কেন আছ?
সামনে আঙিনাতে তোমার একতারাটি হাতে
তুমি সুর লাগিয়ে নাচ।
কও তো আমায়, ভাই তোমার গুরুমশায় নাই?
আমি যখন দেখি ভেবে,
বুঝতে পারি খাঁটি তোমার বুকের একতারাটি
তোমায় ঐ তো পড়া দেবে॥

রবীন্দ্রনাথের কীর্ত্তন

কীর্ত্তন বাংলা দেশের একটি বিশেষ গাহিবার পদ্ধতি; বাংলার বাহিরে এই ধরণের গান আর কোথাও নাই। ভগবদ্ভক্তিমূলক (Devotional) গান বাংলাদেশের বাহিরে 'ভজন' গান নামে পরিচিত। মহারাষ্ট্র দেশে 'কথা কীর্ত্তন' এবং মারাঠী কবি তুকারামের ভজন গান অনেকটা কীর্ত্তনেরই মতো। বাংলা কীর্ত্তনের ঢঙ্ এরকম কেবল মারাঠী গানেই নয়, অন্যান্য আধুনিক ভারতীয় গানের গীতিরীতিতেও লক্ষিত হয়!

কীর্ত্তনের সুর মর্ম্মস্পর্শী, তাহার জন্য শুধু কাণ নয়, প্রাণও চাই। ভক্তের আকুতি, তাহার আত্মভোলা ব্যাকুল আবেগই কীর্ত্তনের প্রধান উপজীব্য; ভক্তিবিহ্বলতার প্রধান বাহন এই কীর্ত্তন।

রবীন্দ্রনাথের কীর্ত্তনের কৃতিত্ব অবশ্য শুদ্ধমাত্র সুরেই। কীর্ত্তনের আধ্যাত্মিকতার আবেদন কবির কীর্ত্তন সুরের গানে নাই। কীর্ত্তনের ৬৪টি রসসম্মত প্রকরণ বিভাগ রবীন্দ্রনাথের গানে পাওয়া না গেলেও প্রধান রস অর্থাৎ সুরবিহ্বলতায় তাঁহার কীর্ত্তনগান ভরপূর। রবীন্দ্রনাথ ভক্তির গূঢ়তত্ত্ব সুরে প্রকাশ করেন নাই, তিনি করিয়াছেন কেবল সুরের পাত্রে রোমাণ্টিক মাধুরীর পরিবেশন।

পদাবলীর কীর্ত্তনে ৬৪ রস প্রকরণের প্রকাশ হইয়াছে। কীর্ত্তনীয়ারা সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যকে পূর্ব্বরাগ, অভিসার, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, গোষ্ঠযাত্রা, উত্তর গোষ্ঠ, নৌকাবিলাস, দান, ঝুলন, হোলী, বিরহ, মাথুর, কুঞ্জভঙ্গ প্রভৃতি কতকগুলি পালায় বিভক্ত করিয়াছেন। পদাবলীর কীর্ত্তনই ছিল বৈষ্ণব ধর্মের প্রাণকেন্দ্র,

সমগ্র ধর্মসম্প্রদায় যেন সেই সুরে বাঁধা ছিল। বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণের নিকট কীর্ত্তন ছিল ভজন সাধনের উপচার, কিন্তু জনসাধারণের সঙ্গে প্রথম প্রথম ইহার বিশেষ যোগ ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে বৈষ্ণবধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের উপাসনা আরাধনার উপচার হইয়া উঠিল এই কীর্ত্তন। অবশ্য জনসাধারণের কাছে নামকীর্ত্তন এবং টহল কীর্ত্তনই ভজনপূজনের প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল। টহল কীর্ত্তনের নিদর্শন—

হরিনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে ? বল মাধাই মধুর স্বরে ॥

বৈষ্ণব যুগে বাংলাদেশে একটি সাংস্কৃতিক 'রেনেসাঁ' আসিয়াছিল। সে বিপ্লব দেখা দিল সাহিত্যে পদাবলীর রূপে ; কেবল তাহাই নয়, কবি বলিয়াছেন—"এই স্বাতন্ত্র্যচেষ্টা কেবল কাব্যছন্দের মধ্যে নয়, সঙ্গীতেও দেখা দিল। সেই উদ্যমের মুখে কালোয়াতি গান আর টিকিল না। তখন সঙ্গীত এমন সকল সুর খুঁজিতে লাগিল যাহা হৃদয়াবেগের বিশেষত্ব-গুলিকে প্রকাশ করে, রাগরাগিণীর সাধারণ রূপগুলিকে নয়"। কবি এই নবজাগরণকে Romantic Movement বলিয়াছেন।

কীর্ত্তনের সুরবিস্তার অল্প পরিসরের মধ্যে সমাপ্তি লাভ করিত না। রবীন্দ্রনাথই প্রথম কীর্ত্তনকে ভক্তির বিহ্বলতা এবং সুরের ক্লান্তিকর বিস্তারণ হইতে মুক্তি দিলেন।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে আমাদের অধিকাংশ ভজনগানই কীর্ত্তনের সুরে গীত হইত। তাহার পর ব্রাহ্মধর্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে হিন্দী রাগসঙ্গীতের অনুকরণে 'ব্রহ্মসঙ্গীত' নামে ভজনগানের জন্ম হয়। এ গানগুলি বৈষ্ণব কীর্ত্তনের অনুকৃতি না হইয়া অনেকটা খৃষ্টীয় Church Music এরই অনুসরণে সৃষ্ট হয়। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ভাগবতী গীতি সেই ধারার অন্তর্গত।

কীর্ত্তন ছাড়া বাংলাদেশের অন্যান্য ভাগবতী গীতিতে হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গের সুরসৌষ্ঠব অনুস্যূত হইয়াছে। রামপ্রসাদের পরবর্ত্তী রামবসু, গদাধর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কবিওয়ালা এবং কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য, কালীমির্জ্জা, শ্রীধর কথক ইত্যাদি অনেকের শ্যামাসঙ্গীত এবং উমা-সঙ্গীত (আগমনী, বিজয়ার গান, উমার বাল্যলীলা) রীতিমতো সূক্ষ্ম কলা কৌশলে রচিত।

কেবল ভজন গানই নয় বাংলাদেশের সমস্ত গানই ছিল কীর্ত্তনাশ্রিত। তবে এ সমস্ত গান ভাবানুসারে স্বতন্ত্র; রাধাকৃষ্ণের নামাঙ্কিত এবং কীর্ত্তনের সুরাশ্রিত হইলেও কবির গান, যাত্রাগান প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃত প্রেমের লীলাকাহিনী। বৈষ্ণব মহাজন গীতিগুলির ভক্তি বিহ্বলতার লেশমাত্র এসব গানে নাই! সেদিক্ দিয়া কৃষ্ণকমল গোস্বামীর কীর্ত্তনগুলি বহুলাংশে ভক্তিরসোচ্ছল; তাঁহার অধিকাংশ গান মনোহরশাহী রীতিতে লোফা ছন্দে রচিত; যেমন—

(১) যখন নব অনুরাগে হৃদয় লাগিল দাগে। (২) কুঞ্জের দ্বারে ঐ দাঁড়ায়ে কে ? প্রভৃতি।

মহাজন পদাবলীর সব গানই উচ্চাঙ্গের সুরাশ্রিত হইলেও কীর্ত্তন পদ্ধতিতে গাঁথা। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতির গানও অনেকটা ঐ কীর্ত্তনপদ্ধতির অনুকৃতি। এই ধারা সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হয় নিধুবাবুর হাতে। তিনি পশ্চিম হইতে শোরীমিঞার টপ্পার আমদানী করিলেন বাংলা গানে। তাহার পর হইতে কবির গানের যুগে এবং বহুদিন পর্য্যন্ত এই টপ্পাই হইল বাংলার গানের প্রধান বাহন। রবীন্দ্রনাথের হাতে আবার বহুদিন পরে কীর্ত্তনের নবজীবন লাভ হয়। রবীন্দ্রনাথ রাগসঙ্গীতের ধারায় যেমন নূতন সুরের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, দেশী সঙ্গীতের ধারায় সেই প্রকার নূতন কীর্ত্তনের জন্মদান করিলেন। কীর্ত্তনের প্রচলিত ধারা আর উচ্চাঙ্গ

সঙ্গীত একত্রে সংমিশ্রিত হইয়া অভিজাত শ্রেণীতে বহুদিন পরে উন্নীত হইল। তবু হৃদয়ের সেই পুরাতন আবেগ আর ফিরিয়া আসিল না, তাহার পরিবর্ত্তে স্থান পাইল কবিপ্রতিভার শব্দঝঙ্কার আর সুরের কলা কৌশল। তাঁহার আধুনিক কীর্ত্তন মিশ্র সুরে সৃষ্ট, বিদেশী গানেরও কোথাও কোথাও প্রভাব আছে। অবশ্য প্রচলিত ধারায় রচিত প্রথম যুগের কীর্ত্তনের আঁখর, দীর্ঘতান প্রভৃতি প্রাচীন মহাজনগণকেই স্মরণ করায়।

কীর্ত্তনের নিজস্ব যে বাদ্যযন্ত্র—মৃদঙ্গ ও মন্দিরা (খোল ও করতাল)—তাহারই উপর সমগ্র কীর্ত্তনের গায়নী পদ্ধতি নির্ভর করিতেছে। মৃদঙ্গ এবং মন্দিরার সঙ্গত একমাত্র গুটিকয়েক রাগ-সঙ্গীত ছাড়া কবির প্রায় সমস্ত গানেই সুসঙ্গতি রক্ষা করে।

ধ্রুপদের দ্রুত ও বিলম্বিত লয়ের ন্যায় কীর্ত্তনেও দুইটি গতি আছে—অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধ। আলাপ বা সুরের ভাঁজ হইতেছে অনিবদ্ধ এবং মূল গান নিবদ্ধ। পাঁচ প্রকার কীর্ত্তন গানের প্রচলন আছে—মনোহরশাহী, গরানহাটী, রেনেটি, মান্দারণী এবং ঝাড়খণ্ডী।

বর্দ্ধমান, বীরভূম অঞ্চলের পদ্ধতির নাম **মনোহরশাহী**—এই পদ্ধতির কীর্ত্তনই সর্ব্বাপেক্ষা সুললিত, প্রায় খেয়াল অঙ্গের গানের মত। শ্রীনিবাস আচার্য্য এই রীতির প্রবর্ত্তক। ময়নাদলের গায়নরা এই ধারায় গান করেন। **ঝাড়খণ্ডী**—মানভূম এবং মেদিনীপুর অঞ্চলের বিশিষ্ট কীর্ত্তনরীতি। কবীন্দ্র গোকুল এই রীতির প্রবর্ত্তক। এ রীতির গান টপ্পা অঙ্গের সদৃশ। উদ্ধবদাস প্রমুখ ভক্তদের গাহিবার পদ্ধতি **রেনেটি** এবং উড়িষ্যা অঞ্চলের কীর্ত্তন গানের পদ্ধতি **মান্দারনী**। মান্দারনী কীর্ত্তনের রীতি ঠুংরি অঙ্গের গানের সদৃশ। চৈতন্য পরবর্ত্তী মঙ্গলকাব্য এবং চরিতকাব্যগুলি প্রায় সবই এ রীতিতে লঘু তালে গাওয়া হইত।

গরানহাটী পদ্ধতির কীর্ত্তন গম্ভীর, প্রায় ধ্রুপদ অঙ্গের গানের মত। কবি এ রীতির সঙ্গে উচ্চাঙ্গের ধ্রুপদ গানের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন—"এই ধ্রুপদ গানে দুটো জিনিস আমরা পেয়েছি একদিকে তার বিপুলতা গভীরতা, আর একদিকে তার আত্মদমন, সুসঙ্গতির মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করা। কীর্ত্তনে গরানহাটী অঙ্গের যে সঙ্গীত আছে আমার বিশ্বাস তার মধ্যে গানের সেই আত্মসংযত ঔদার্য্য প্রকাশ পেয়েছে।" শ্রুতি, গমক এবং ঠাটে এই কয়প্রকার কীর্ত্তন পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

এ ছাড়া নানা বিশিষ্ট গায়নভঙ্গী বিভিন্ন কীর্ত্তনরীতি গঠন করিয়াছিল। রামপ্রসাদের গান এবং তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণে পরবর্ত্তী যুগের কালীমহিমাও গাওয়া হইত কীর্ত্তনের আর একটি বিশিষ্ট ঢঙ্গে ; তাহাকে বলে 'কালী কীর্ত্তন'।

মধুসূদন কিন্নর বা মধুকানের 'ঢপ কীর্ত্তন' আর একটি বিশিষ্ট রীতি। মোহন দাস নামে একজন সুপ্রসিদ্ধ বাউলের শিষ্য ছিলেন মধুকান। কীর্ত্তনের মধ্যে রাগিণী ব্যবহারে তিনি ঢপ নামে মৃদুলয়ের কম্পনপ্রবণ একটি রীতি প্রবর্ত্তন করেন। কবির চিত্রাঙ্গদার অনেক গান ঢপ কীর্ত্তনের ভঙ্গীতে রচিত ; যেমন—রোদনভরা এ বসন্ত, বিনা সাজে সাজি দেখা দিয়েছিলে প্রভৃতি গান। মধুকানও কবির মতন সংযত অনুপ্রাস ব্যবহার করিতেন।

পল্লী অঞ্চলের রাখালের গানকে অবলম্বন করিয়া আর একটি বিচিত্র রীতি গড়িয়া উঠিয়াছে, এ শ্রেণীর গোষ্ঠ পালার গান কবির 'হেদে গো নন্দরাণী, আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও'।

কীর্ত্তনের নিজস্ব তাল দশকুশী, তেওট, জপতাল, ঠুঠ্‌কী, ব্রহ্মতাল লোফা প্রভৃতি। আবার এক 'দশকুশী'ই দ্রুত ও বিলম্বিত বিভিন্ন প্রকার গতির সঙ্গে সাম্য রাখিতে ক্ষুদ্র, মধ্যম, বৃহৎ প্রভৃতিতে বিভক্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'ও হে জীবন বল্লভ' জপতাল (১২ মাত্রায়) রচিত।

প্রচলিত কীর্ত্তনরীতিতে হিন্দী রাগসঙ্গীতের নিয়মপ্রথা বহুভাবে সরল করিয়া লওয়া হইয়াছে, লৌকিক সঙ্গীতের বৈচিত্র্য সঞ্চার করাও হইয়াছে। কীর্ত্তনের রীতিতেও ধ্রুপদের ন্যায় চারটি তুক আছে—উদ্গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব এবং আভোগ।

আসরে গাহিবার সময় কীর্ত্তনকে পাঁচটি রীতিতে ভাগ করা হইত,—কথা, আঁখর, দোঁহা, ছুট ও তুক। 'কথা' কীর্ত্তনের মূল গীতাংশ, 'আখর' তাহার তান। 'দোঁহা' গানের কোরাস অংশ এবং সুরবিহীন গীতসূত্র। 'তুক্' কীর্ত্তনের পালায় গায়কের নিজস্ব নবসৃষ্ট গীতাংশ এবং 'ছুট' পালার মধ্যবর্ত্তী লঘু ছন্দের স্বতন্ত্র গান।

কীর্ত্তন লৌকিক সঙ্গীত হওয়ায় বিভিন্ন শ্রেণীর গায়করা সহজেই এ গান অভ্যাস করিতে পারিতেন, কাজে কাজেই কীর্ত্তনের গীতিরীতি এতো বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মহাপ্রভুর সময়েই জানা যায় সাত-আটটি রীতির গান হইত—

সাতসম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল। যার ধ্বনি শুনি বৈষ্ণব হইল পাগল।
সাত ঠাঁই বুলে প্রভু হরি হরি বলি। জয় জয় জগন্নাথ কহে হাত তুলি॥

এই শ্রেণীর কীর্ত্তনের নাম 'নাম সংকীর্ত্তন'।

আর পদাবলীর কীর্ত্তনকে বলা হয় 'লীলাকীর্ত্তন'। নামসংকীর্ত্তনে আপামর জনসাধারণ যোগদান করিতে পারিত। কবি বলিয়াছিলেন—

"বাংলায় একদিন বৈষ্ণবভাবের প্রাবল্যে ধর্ম্মসাধনায় বা ধর্ম্মরসভোগে একটা ডিমোক্রেসির যুগ এল। সেদিন সম্মিলিত চিত্তের আবেগ সম্মিলিত কণ্ঠে প্রকাশ পেতে চেয়েছিল। সে প্রকাশ সভার আসরে নয়, রাস্তার ঘাটে। বাংলার কীর্ত্তনে সে জনসাধারণের ভাবোচ্ছ্বাস গলায় মেলাবার খুব একটা প্রশস্ত জায়গা হল।"

কীর্ত্তনের মধ্যে একটা গল্পকাহিনীর অংশ আছে তাহাকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠে পালা গান। সে গল্পও যেমন বাঙ্গালীর

ঘরের কথা, তাহার সুরও তেমনি ঘরাও, হিন্দুস্থানী বিধি বিধানের অলঙ্কার অঙ্গে ধারণ করে নাই। কবির ভাষায়—

"বাংলায় রাধাকৃষ্ণের লীলাগান হিন্দুস্থানী গানের প্রবল অভিযানকে ঠেকিয়ে দিলে। এই লীলারসের আশ্রয় একটি উপখ্যান। সেই উপখ্যানের ধারাটিকে নিয়ে কীর্ত্তনগান হয়ে উঠল পালাগান।"

বাংলার 'কথকতা' বা কথক গান ও পাঁচালী গানও এই ধারার অন্তর্গত। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতির পাঠ-আবৃত্তির একটি বিচিত্র প্রথাকেই কথকতা নামে অভিহিত করা হয়। রবীন্দ্রনাথের বহু গানের সুরাবৃত্তির ভঙ্গী এই কথকতারই অনুবৃত্তি। যেমন "কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি, কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক"। উল্লিখিত গানটিতে সামান্য কেদারা ও মল্লারের আভাস মাত্র আছে।

কবি কথকতার সুরাবৃত্তি প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"আমাদের দেশে কথকতার মধ্যে কতকটা এই চেষ্টা আছে। তাহাতে বাক্য মাঝে মাঝে সুরকে আশ্রয় করে, অথচ তানমানসঙ্গত রীতিমতো সঙ্গীত নহে। ছন্দ হিসাবে অমিত্রাক্ষর যেমন, গান হিসাবে এও সেইরূপ, ইহাতে তালের কড়াকড় বাঁধন নাই—একটি লয়ের মাত্রা আছে। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য কথার ভিতরকার ভাবাবেগকে পরিস্ফুট করিয়া তোলা, কোন বিশেষ রাগিণী বা তালকে বিশুদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা নহে।"

গায়ক গাহিবার সময় গানটীকে এবং সেই সঙ্গে নিজস্ব আবেগকে মূর্ত্ত করিবার জন্য নানাপ্রকার অলঙ্কার ব্যবহার করেন, এই অলঙ্কারই 'আঁখর' নামে পরিচিত।

উচ্চাঙ্গের রাগসঙ্গীতের 'তানের' মতই আঁখরের ব্যবহার হয়। পূর্বে গানে যে যে অংশ আঁখররূপে ব্যবহৃত হইবে তাহার নির্দ্দেশ সুরে দেওয়াই থাকিত, তাহার ফলে গায়কের নিজস্ব আবেগ ব্যাহত

হইত। গুণী সুরকারগণ যখন লক্ষ্য করিলেন—গায়কের নিজস্ব মনোমত আঁখর গানে ব্যবহার অধিকতর মর্ম্মস্পর্শী হয়, তখন তাঁহারা নিজেরাই ইচ্ছামতো আঁখর ব্যবহার করিবার অনুমতি দিলেন। বাউল গানেও এই আঁখরের ব্যবহার আছে। তবে রবীন্দ্রনাথের কীর্ত্তনে এই আঁখর ব্যবহার অত্যন্ত সংযত। 'আঁখর' সহ রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তন—

ওহে জীবন বল্লভ, ওহে সাধনদুর্ল্লভ !
আমি মর্ম্মের কথা, অন্তর ব্যথা, কিছুই নাহি ক'ব,
শুধু জীবন মন চরণে দিনু, বুঝিয়া লহ সব।
(দিনু চরণতলে) (কথা যা ছিল, দিনু চরণতলে)
(প্রাণের বোঝা বুঝে লও, দিনু চরণতলে) (আমি কি আর ক'ব !)

কবি 'আখরকে' বলিয়াছেন 'কথার তান' অর্থাৎ সুরের তানালাপ নয়, বাণীর তান ; তাহা নির্দিষ্ট কাব্যসীমা ছাড়াইয়া ভাবের আবেগে কীর্ত্তনকে রসায়িত করিয়া তোলে। কবির কথায়—"কীর্ত্তনের সুরও অবশ্য কম নয়, তার মধ্যে কারুনিয়মের জটিলতাও যথেষ্ট আছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কীর্ত্তনের মুখ্য আবেদনটি হচ্ছে তার কাব্যগত ভাবের, সুর তারই সহায় মাত্র।"

এই আঁখর আবার কবি অনেক রাগসঙ্গীতেও ব্যবহার করিয়াছেন যেমন 'তোমার আনন্দ ঐ এলো দ্বারে', 'রঙ লাগালে বনে বনে' প্রভৃতি গান। কীর্ত্তনের কতকগুলি বিশিষ্ট এক একটি শব্দের আঁখর রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল গানেই দেখা যায়, যেমন—'আহা', 'মরি', 'গো', 'কে' 'হায়', 'রে' প্রভৃতি।

কীর্ত্তনের প্রচলিত বিধিবদ্ধ তালকে এড়াইয়া ছন্দোবৈচিত্র্য সঞ্চারের জন্য কবি রাগসঙ্গীতের তালও ব্যবহার করিয়াছেন অনেক গানে। প্রথম যুগে ঝাঁপতালে (১) 'আবার মোরে পাগল করে দেবে

কে'। রূপকে (২) 'খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে প্রভৃতি। পরের যুগে—(৩) আমার না বলা বাণীর ঘন যামিনীর (দাদ্‌রা); (৪) আসন তলে মাটির পরে (ঠুংরি); (৫) প্রভু, আজি তব দক্ষিণ হাত (ঠুংরি); (৬) তোমায় আমায় মিলন হবে (কাওয়ালী); (৭) বাঁচান বাঁচি মারেন মরি (দাদ্‌রা) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কীর্ত্তনের সুরের সঙ্গে রাগ-রাগিণীরও মিশ্রণ করিলেন। যথা আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায় (ঠুংরি) গানের মূলরাগ দেশকার; তবে গানটির গীতিরীতি সম্পূর্ণ কীর্ত্তনের। 'কৃষ্ণকলি' গানের এক অংশও এই রকম কীর্ত্তনাশ্রিত। 'আমি শ্রাবণ আকাশে ঐ' গানের সুর সেইরকম মল্লার আশ্রিত কীর্ত্তনের বিশিষ্ট রীতিতে রচিত। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের উপাদান বর্জন না করিয়াও তাহার সংমিশ্রণেই এ ভাবে নব সৃষ্টি হইল।

রবীন্দ্রনাথের অনেক কীর্ত্তনে ধ্রুপদ গানের পদ্ধতিতে চারিটি তুক্‌ও (আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ) আছে। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ বাউল গানও এই কীর্ত্তনের সগোত্র।

রবীন্দ্রনাথের কীর্ত্তন নবতম অবদান, প্রচলিত কোন রীতিতে তাহা রচিত নয়। তাঁহার তিনটি স্বতন্ত্র রীতির কীর্ত্তন পাওয়া যায়—(১) প্রচলিত ধারায় রচিত (২) বাউলাশ্রিত এবং (৩) রাগিণী সম্বলিত।

ধ্রুপদ-খেয়াল-টপ্পা গান অপেক্ষা কীর্ত্তন গানে বৈজ্ঞানিক চাতুর্য্য স্পষ্ট না হইলেও তাহার মধ্যে কলাকুশলতা যথেষ্টই রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব মত এইপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—"উচ্চঅঙ্গের কীর্ত্তন গানের আঙ্গিক খুব জটিল ও বিচিত্র, তার তাল ব্যাপক ও দুরূহ, পরিসর হিন্দুস্থানী গানের চেয়ে বড়। তার মধ্যে যে বহু-শাখায়িত নাট্যরস আছে, তাহা হিন্দুস্থানী গানেও নেই।"

কীর্ত্তনে যে সুর আভিজাত্য এবং স্বাতন্ত্র্য আছে তাহাও উপেক্ষার বিষয় নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই বিষয়ে সচেতন ছিলেন—"বাংলাদেশে কীর্ত্তন গানের উৎপত্তির আদিতে আছে একটি অত্যন্ত সত্য-মূলক গভীর এবং দূরব্যাপী হৃদয়াবেগ। এই সত্যকার উদ্দাম বেদনা হিন্দুস্থানী গানের পিঞ্জরের মধ্যে বন্ধন স্বীকার করতে পারলে না, সে বন্ধন হোক্ না সোনার, বাদশাহী হাটে তার দাম যত উঁচুই হোক্। অথচ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের রাগরাগিণীর উপাদান সে বর্জ্জন করেনি। সে সমস্ত নিয়েই সে আপন নূতন সঙ্গীত-লোক সৃষ্টি করেছে। সৃষ্টি করতে হলে চিত্তের বেগ এমনিই প্রবলরূপে সত্য হওয়া চাই।"

অন্যান্য সঙ্গীতের বৈচিত্র্য সুরের সাহায্যে প্রকাশ পায়, কীর্ত্তনের বৈচিত্র্য কেবল সুরে নয়, উচ্ছ্বাসে, ভাবাবেগে! রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এ ঢঙের গানে তাহা সংবরণ করিয়াছেন। সঙ্গীতের রস ছাড়াও কীর্ত্তনের মধ্যে একটি বিশেষ নাট্যরসও রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—"কীর্ত্তন সঙ্গীত আমি অনেককাল থেকেই ভালবাসি। ওর মধ্যে ভাবপ্রকাশের যে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি আছে, সে আর কোনো সঙ্গীতে এমন সহজভাবে আছে বলে আমি জানিনে। কীর্ত্তন সঙ্গীতে বাঙ্গালির এই অনন্যতন্ত্র প্রতিভায় আমি গৌরব অনুভব করি।" যে সুরেই গাওয়া যাক্ কীর্ত্তন বৈচিত্র্য আনিবেই, রাগপ্রধান না হইয়া এগান ভাবপ্রধান হইয়া উঠিবেই। কবি তাঁহার এ ধারায় রচিত গানে সে পরীক্ষা বহুবারই করিয়াছেন—"কখনো কখনো কীর্ত্তনে ভৈরোঁ প্রভৃতি ভোরাই সুরের আভাস লাগে, কিন্তু তার মেজাজ গেছে বদলে,—রাগরাগিণীর রূপের প্রতি তার মন নেই, ভাবের রসের প্রতিই তার ঝোঁক।"

কীর্ত্তনের গানের সুর সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয় না, কথার

লালিত্যই সেখানে ভাবপ্রকাশ করে, তবু সুরই কীর্ত্তনের আগাগোড়া রসায়িত করিয়া রাখে। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—"হিন্দুস্থানে তুলসীদাসের রামায়ণ সুর করে পড়া হয়। তাকে সঙ্গীতের পদবী দেওয়া যায় না। সে যেন আখ্যান-আসবাবের উপরিতলে সুরের পাতলা পালিশ। কীর্ত্তনে তা বলবার জো নাই। কথা তাতে যতই থাক্, কীর্ত্তন তবুও সঙ্গীত। অথচ কথাকে মাথা নীচু করতে হয়নি। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাসের পদকে কাব্য হিসাবে তুচ্ছ বলবে কে? কীর্ত্তনে, বাঙালীর গানে, সঙ্গীত ও কাব্যের যে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি, বাঙালীর অন্য সাধারণ গানেও তাই।"

কবির বাল্য বয়সের ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর গানগুলি প্রাচীন মহাজনী পদাবলীর ভাবে ও ভাষায় রচিত হইলেও সুরে কীর্ত্তন নয়, রাগসঙ্গীতের অনুসরণে রচিত।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের গান কীর্ত্তনের প্রচলিত ধারার অনুকরণে রচিত হয়। এই যুগের কীর্ত্তনগুলির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গানটি "ওহে জীবনবল্লভ, ওহে সাধন-দুর্লভ" একটি প্রাচীন ভাঙ্গা কীর্ত্তনের ধারায় অনুসৃত। এই গানটি কীর্ত্তনের সকল বিধিনিষেধকে সুষ্ঠুভাবে অনুকরণ করিয়াছে। কিন্তু আবার সেই বয়সেই রচিত "বড়ো বেদনার মত বেজেছ তুমি হে" গানটিতে রাগ সঙ্গীতের সুরের নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। প্রচলিত কীর্ত্তনের রীতি এবং সুরে রচিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের কীর্ত্তনগুলির মধ্যে—

(১) আবার মোরে পাগল করে দিবে কে? (২) খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে। (৩) চাহিনা সুখে থাকিতে হে। (৪) আমায় হৃদয় সমুদ্রতীরে কে তুমি দাঁড়ায়ে। (৫) আমি সংসারে মন দিয়েছিনু। (৬) আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি। (৭) মাঝে মাঝে তব দেখা পাই। (৮) ভালবেসে সখি নিভৃত যতনে। (৯) কে

জানিত তুমি ডাকিবে আমারে। (১০) এসো এসো ফিরে এসো। (১১) তুমি কাছে নেই বলে। (১২) নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে প্রভৃতি নিদর্শন। এইগুলিতে প্রচলিত কীর্ত্তন পদ্ধতি যথাসাধ্য অনুসৃত হইয়াছে। এগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতে বিশিষ্ট আঁখর আছে। পরে কবি দেখিলেন তাঁহার সৃষ্ট কীর্ত্তন গানে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কিছুমাত্র প্রকাশ পায় নাই। তাঁহার দ্বিতীয় ধারায় গানগুলি প্রচলিত কীর্ত্তনের অঙ্গে গণ্য নয়—

(১) আন্‌মনা, আন্‌মনা, তোমার কাছে আমার বীণার। (২) আজি এ নিরালা কুঞ্জে। (৩) আমি যখন ছিলেম অন্ধ। (৪) আমার না বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে। (৫) এই কথাটি মনে রেখো। (৬) সেই ভালো সেই ভালো। (৭) ফিরবে না তা জানি। (৮) ঐ আসনতলে মাটির পরে (৯) প্রভু, আজি তোমার দক্ষিণ হাত প্রভৃতি সম্পূর্ণ বিশিষ্ট ভঙ্গীতে রচিত। এগুলিতে আঁখরের ব্যবহার নাই।

তৃতীয় আর এক শ্রেণীর কীর্ত্তনের উদ্ভব হয় রবীন্দ্রনাথের সুর সাধনার চরম গৌরবময় যুগে। কলাচাতুর্য্যহীন সরল, স্বচ্ছন্দ গতিই এগুলিকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। এ শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য গান—(১) যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে। (২) না চাহিলে যারে পাওয়া যায়। (৩) সখি বয়ে গেল বেলা, শুধু হাসি খেলা। (৪) যে ছিল আমার স্বপনচারিণী। (৫) দে পড়ে দে আমায় তোরা। (৬) বনে যদি ফুটল কুসুম। (৭) এসো আমার ঘরে প্রভৃতি। এগুলির গীতিরীতি ধীর লয়ের পুনরাবৃত্তিহীন আবেগাশ্রিত কণ্ঠেই সুপ্রকাশিত। এই ধরণটি রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিচিত গীতিরীতি।

এ শ্রেণীর মৃদু সুরের অনুবৃত্তিতে ধীর গলায় গান রবীন্দ্রনাথের

সুরের একটি বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের এমন বহু গান আছে, যেগুলি কীর্ত্তনের সুরে রচিত না হইলেও, কীর্ত্তনের কতকগুলি সুরভঙ্গী তাহাতে আছে। এই সকল গানে কীর্ত্তনের আবেগমিশ্রিত কম্পন, স্বরভঙ্গ প্রভৃতির প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, কোন কোন কলিতে কীর্ত্তনাশ্রিত সুরকেও অবলম্বন করা হইয়াছে।

মৃদু সুরের কীর্ত্তনগুলির অন্তর্গত এইগুলির সৌন্দর্য্য অপূর্ব্বতা পাইয়াছে রাগিণী নৈপুণ্যের সহযোগিতায়—(১) আমার নয়ন ভুলানো এলে, আমি কি হেরিলাম। (২) এই যে তোমার প্রেম, ওগো হৃদয়হরণ। (৩) তোমায় আমায় মিলন হবে বলে। হয়। (৪) তুমি যে সুরের আগুন (খেমটা)। (৫) লহো লহো তুলে লহো নীরব বীণাখানি (ঝাঁপতাল)। (৬) দাও হে আমার ভয় ভেঙ্গে দাও (জংলাশ্রিত)। (৭) কবে তুমি আসবে বলে।

কীর্ত্তন এবং বাউল গানের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সুরের বৈচিত্র্য আমাদিগকে যেমন মুগ্ধ করে, সেই সঙ্গে সেগুলির সংখ্যাল্পতা মনকে ক্ষুণ্ণও করে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে ধ্রুপদ এবং টপ্পা গানের যে রূপ প্রভাব, কীর্ত্তন ও বাউলের প্রভাবও সেই রূপ হইলে যেন ভালো হইত!

কীর্ত্তনগানের মধ্যে যে ভাবে কথা ও সুরের শুভ সম্মিলন ঘটিয়াছে কবি তাহার পরিচয় দিয়া বলিয়াছেন—

"বঙ্গদেশের কীর্ত্তন কাব্য ও সঙ্গীতের সম্মিলনে এক আশ্চর্য্য আকার ধারণ করিয়াছে। তাহাতে কাব্যও পরিপূর্ণ এবং সঙ্গীত প্রবল। মনে হয় যেন ভাবের বোঝাই পূর্ণ সোনার কবিতা ভরাসুরের সঙ্গীত নদীর মাঝখান দিয়া বেগে ভাসিয়া চলিয়াছে। সঙ্গীত কেবল যে কবিতাটিকে বহন করিতেছে তাহা নহে, তাহার নিজেরও একটা ঐশ্বর্য্য, ঔদার্য্য এবং মর্য্যাদা প্রবল ভাবে প্রকাশ পাইতেছে।"

—০—

রবীন্দ্রনাথের কৌতুকসঙ্গীত

আমাদের সাহিত্যে এবং সঙ্গীতে মার্জ্জিত সুরুচিপূর্ণ হাস্যরস ইংরাজী সাহিত্য হইতে সঞ্চারিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে শ্লীলতার সহিত কৌতুকের সামঞ্জস্য সাধন সম্ভব হইয়াছে। তর্জা, ধামালী, পাঁচালী গান, দোল-গাজনের সঙের গান, কবির লড়াইয়ের গান ইত্যাদির রুচি ছিল নিম্নস্তরের ; সে সব গান, অশিক্ষিত গ্রাম্যলোকদের এবং ইতরপ্রকৃতির নাগরিক ধনীদেরই উপভোগ্য ছিল। শিক্ষিত সমাজের কাছে যে সব গান আদর পায় নাই! দেশে শিক্ষা ও নবসভ্যতা বিস্তারের সঙ্গেসঙ্গে সে-সব প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিল।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "পূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসকে অন্যরসের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিতে দেওয়া হইত না। সে নিম্নাসনে বসিয়া শ্রাব্য অশ্রাব্য ভাষায় ভাঁড়ামি করিয়া সভাজনের মনোরঞ্জন করিত। আদিরসেরই সহিত যেন তাহার একটা সর্ব্বউপদ্রবসহ বিশেষ কুটুম্বিতার সম্পর্ক ছিল এবং ঐ রসটাকেই সর্ব্বপ্রকারে পীড়ন ও আন্দোলন করিয়া তাহার অধিকাংশ পরিহাস বিদ্রূপ প্রকাশ পাইত।"

অনাবিল বিমল কৌতুকরসের জন্যই হাসির গানের সার্থক সৃষ্টি। হাসির গানে যে উচ্চাঙ্গের সুর ও তালের প্রয়োজন আছে তাহা নয়, একমাত্র তরল আনন্দ, লঘুভার সুরতরঙ্গেই হাসির গানের যথার্থ আবেদন।

বাংলা হাসির গানের ক্রমোন্মেষ অনুসন্ধান করিলে প্রথমেই আমরা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কথা স্মরণ করি। ঈশ্বর গুপ্ত কবির গান, হাফ আখড়াই ও তর্জ্জা গানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই

সমস্ত গানের রুচি-দুষ্ট রসিকতাকে মার্জ্জিত এবং যতদূর সম্ভব বর্জ্জিত করিয়া তিনি বাংলায় সুষ্ঠু কৌতুক-সঙ্গীতের সৃষ্টি করেন। সাহিত্যে হাস্যরসের সৃষ্টিতে রামনারায়ণ তর্করত্ন, দীনবন্ধু মিত্র, জগদ্বন্ধু ভদ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, অমৃতলাল প্রভৃতি সবাই ছিলেন ঈশ্বর গুপ্তেরই অনুসারক। ঠিক গান না হইলেও গুপ্ত কবির 'প্রভাকরে' যে সেকালের উদীয়মান কবিদের 'কলেজীয় কবিতাযুদ্ধ' চলিত, তাহা হইতে বাদানুবাদের মারফতে ছন্দে নূতন ঢঙের রঙ্গলীলার সূত্রপাত হয়।

সঙ্গীতে রামপ্রসাদ সেনের প্রসিদ্ধ শ্যামাসঙ্গীতগুলির প্যারডি করিয়া আজু গোঁসাই শাক্ত-বৈষ্ণব দ্বন্দ্বের বাদানুবাদ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি রামপ্রসাদের 'এ সংসার ধোঁকার টাটি'র প্যারডি করেন 'এই সংসার রসের কুটি—ওরে খাই, দাই আর মজা লুটি॥' এ শ্রেণীর রচনারও প্রবর্ত্তক 'গুপ্ত কবি'। বাদানুবাদের ঢঙ অবশ্য ধামালী এবং তর্জ্জা গানে চিরকালই প্রচলিত ছিল।

উড়িয়া কবি রূপচাঁদ পক্ষী এবং প্যারীমোহন কবিরত্নের হাসির গান রচনায় প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। রূপচাঁদ পক্ষীর হাসির গান বিষয়বস্তুতে এবং সুরে বিশিষ্ট স্থান অর্জ্জন করিয়াছে। তিনি ইংরাজীনবীশ বাবুদের ব্যঙ্গ করিয়া তাহাদের অভ্যস্ত ইংরাজীমিশাল ভাষায় ব্রজলীলা গানের প্যারডিশ্রেণীর গান লিখিয়াছিলেন। তাঁহাদের এ শ্রেণীর গানগুলি অধিকাংশই রাগরাগিণীসম্মত। যথা—ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—(পোস্তা)

—আমারে ফ্রড্ ক'রে কালিয়া ড্যাম তুই কোথা গেলি।
আই য়্যাম ফর ইউ ভেরি স্যরি, গোল্ডন বডি হল কালি॥
হো মাই ডিয়র ডিয়রেষ্ট মধুপুর তুই গেলি কেষ্ট॥
ও মাই ডিয়র হাউ টু রেষ্ট হিয়ার ডিয়র বনমালী॥

প্যারীমোহন কবিরত্নের গান—খাম্বাজে

চাপদাড়ি রাখা, চোখে চশমা ঢাকা,
ভয়ানক ঢং লেগেছে বাংলাতে।
এ পথের পথিক নম্বরে অধিক (গণনায় অধিক)
দেখা যায় কেবল ইয়ং বেঙ্গলেতে॥

এ সকল গানে তখনকার কায়দা কানুন, চালচলন প্রভৃতিকে বিদ্রূপ করা হইয়াছে। মেয়েলি তর্জা, ঝুমুর প্রভৃতি গানেও এ রস থাকিত। ভবরাণী নামক একজন স্ত্রীলোক এরকম একটি দল চালাইত।

সঙ্গীতের অন্যান্য ধারার ন্যায় এক্ষেত্রেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কবির পথিপ্রদর্শক। তাঁহার প্রহসন 'এমন কর্ম্ম আর করব না' (অলীক বাবু) তে নাম ভূমিকায় কবি প্রথম অভিনয় করেন (১৮৭৭)। 'অলীকবাবু'তে জ্যোতিরিন্দ্রের অনেক গানের কৌতুকরস সুরে উচ্ছ্বসিত। ভাবের সঙ্গে রাগিণীর এমন মিল পূর্ব্বে কল্পনাতীতই ছিল যেমন, পূরবীর সুরে শ্লেষাত্মক সান্ধ্য বর্ণনা—

শ্যাওড়াবনে পালে পাল ক্যাকাহুয়া ডাকে শ্যাল,
আঁস্তাকুড়ে কিচির মিচির ছুঁচোয় করে গান।
হুলো বেড়াল মিয়াও কোরে, নেংটে ইঁদুর খাচ্ছে ধোরে,
পেঁচা ভাবে আমার খাবার অন্যে কেন খান॥

উচ্চাঙ্গের তেলেনা গানের শব্দচ্ছটার নকল করিয়াছেন খাম্বাজে—

রাগে গর্ গর্ গর্ গর্ গর্ গর্ কপালে খ্যাংরা।
করিস্‌নে করিস্‌নে ম্যানে মিছে ন্যাকড়া॥

'সংবাদ প্রভাকর' হইতে হাস্যরসের কবিতা সংগ্রহ করিয়া 'অদ্ভুত নাট্য' নামে একটি কৌতুক অভিনয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রযোজনা করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সামসময়িক, হাসির গানে সিদ্ধহস্ত দুইজন গীতরচয়িতার নাম খ্যাতিতে তাঁহার সমতুল্য—একজন কবি

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং অপরজন রজনীকান্ত সেন। বাংলাদেশে আধুনিক হাসির গানের যথার্থ সৃষ্টি করিয়াছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। পরবর্ত্তী যুগে আরো একজনের নাম এই প্রসঙ্গে করিতে হয়—তিনি সতীশচন্দ্র ঘটক। রবীন্দ্রনাথের বহু গানের প্যারডি রচনা করিয়া তিনি বিখ্যাত হইয়াছেন। এছাড়া অমৃতলাল বসুর বিদ্রূপাত্মক হাসির গানগুলিও এক সময়ে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল।

বাংলাদেশ কাঁদুনির দেশ—তাই করুণরসের গানের আদর হইলেও হাসির গান তেমন আদর পায় না। সতীশ ঘটক প্রমুখ হাস্য-রসিক কবিদের নাম লোকে তাই ভুলিয়াই গিয়াছে।

উদাসী বৈরাগীর দেশে লোক সবাই বৈরাগ্যের গানের ভক্ত। হাসির গানকে তাহারা মনে করে ভোগী ও বিলাসীদের উপভোগ্য, সে জন্য এদেশে হাসির গানের তেমন আদর নাই। তাই দ্বিজেন্দ্র-লালের স্বদেশী গানের যতটা আদর হইয়াছে, তাঁহার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অবদান হাসির গানের ততটা আদর হয় নাই। রজনীকান্তের ভাগবত সঙ্গীতের তবু আদর হইয়াছে, তাঁহার 'অপূর্ব্ব হাসির গানের নামও আজ রসিকসমাজ বিস্মৃত হইয়াছেন। এমন কি রবীন্দ্রনাথের অসামান্য কবিখ্যাতি বা সুরমর্য্যাদাও তাঁহার হাসির গানকে আদৃত করিতে পারিল না!

হাসির গানের দ্বিতীয় ধারা প্যারডি। ইংরাজি কাব্য-সঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট ধারার অনুসৃতি বলিয়া ইহার ইংরাজি নামই থাকিয়া গিয়াছে। আজকাল প্যারডিকে কেহ কেহ 'লালিকা' বলেন। 'প্যারডি' সম্বন্ধে কবিশেখর কালিদাস রায় তাঁহার হাসির গানের চয়নিকা 'রসকদম্বের' ভূমিকায় যাহা বলিয়াছেন এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

সাধারণতঃ দেশবিখ্যাত কবির সর্বজনপরিচিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত বা কবিতারই প্যারডি রচিত হইয়া থাকে। ভাষার ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিয়া এবং ছন্দ ও সুর অক্ষুণ্ণ

রাখিয়া sublime শব্দ সমুচ্চয়কে কেমন করিয়া ridiculous করিয়া তুলা যায়—শান্ত প্রসন্ন রসোপেত রচনাকে কিরূপে কৌতুকরচনায় পরিবর্তিত করা যায়—সেই কলা কৌশল দেখাইবার জন্য প্যারডি। কাজেই প্যারডি রচনার দ্বারা আদৌ সূচিত হয়না যে প্যারডিকারের মূল সঙ্গীতের প্রতি ভক্তি বা শ্রদ্ধা নাই অথবা সঙ্গীতের পবিত্র বিষয় বস্তুকে অবমাননা করাই তাহার উদ্দেশ্য। বরং পক্ষান্তরে মহাকবির প্রতি প্যারডিকারের গভীর শ্রদ্ধাই সূচিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ কয়েকটি গানের কথা ও সুর অবলম্বনে প্যারডি গাঁথিয়াছেন—রজনীকান্ত সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সতীশচন্দ্র ঘটক, কবিশেখর কালিদাস রায়, যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য। এই প্যারডি গানগুলি মূল সুরটিকে এমন চমৎকার অনুসরণ করিয়াছে যে মূল গানগুলির সঙ্গে এইগুলিও রবীন্দ্র সঙ্গীতে স্থান পাইবার যোগ্য। 'এখনো তারে চোখে দেখি নি' গানটির দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এইভাবে প্যারডি রচনা করিয়াছেন—

এখনো তারে চোখে দেখি নি, শুধু কাব্য পড়েছি
অমনি নিজেরই মাথা খেয়ে বসেছি।
শুনেছি তার বরণ কালো, কিন্তু তার চেহারা ভালো;
ওগো বল, আমি তারে নিয়ে দেশ ছেড়ে যাবো কি?

সতীশ চন্দ্র ঘটক রচনা করিয়াছেন ঠিক ঐ গানেরই প্যারডি—

এখনো তারে চোখে দেখিনি শুধু স্বামী শুনেছি।
ধন মান যাহা ছিল পায়ে ঢেলেছি।
তার শুনেছি ছুশোটি বিয়ে, তারে আনাই কি দিয়ে?
সখি বল, আমি ধান ভানিতে ও পাড়ায় যাব কি?
শুধু বিবাহে এসেছিল সে, ফোগলা দাঁতে হেসেছিল সে।
সে অবধি সই ভয়ে ভয়ে রই, অতিথটি এলে ভেবে সারা হই।
কাঁকন হাতে যে খুসী পরুক, ফ্যাসন খোঁপা যে খুসী বাঁধুক,
সখি, আমি একাদশী দিনে মাছ খাব কি?

দ্বিজেন্দ্রলালের 'আনন্দ বিদায়' নাটকে এই শ্রেণীর প্যারডি অনেক আছে। অনেকে মনে করেন রবীন্দ্রনাথকে ব্যঙ্গ করিবার উদ্দেশ্য ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের! তাই যদি হয়, তবু কবির অদ্ভুত কৌতুক রসসৃষ্টির জন্য রসজ্ঞ পাঠকগণের সেগুলি উপভোগ্য। রবীন্দ্রনাথের কথা ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া কেবল সঙ্গীত রসটাই উপভোগ করিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের গানের অন্যান্য প্রসিদ্ধ প্যারডিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত—

(১) কেন যামিনী না যেতে জাগালে না…আলুথালু এই কবরী আবরি (কেন যামিনী না যেতে)।

(২) এসো হে,বঁধুয়া আমার এসো হে (এস এস ফিরে এসো)।

(৩) সে আসে ধেয়ে, এন, ডি, ঘোষের মেয়ে (সে আসে ধীরে, যায় লাজে ফিরে।)

(৪) আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি, তুমি Leisure মাফিক বাসিও (আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি) প্রভৃতি।

সতীশচন্দ্র ঘটক রচিত—(১) যদি বারণ কর তবে হাসিব না (যদি বারণ কর তবে গাহিব না)। (২) তেলালো গোলালো টাকে লেগেছে (অমল ধবল পালে)। (৩) তুমি কেমন করে পান কর হে চুনী (তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী) প্রভৃতি।

সতীশ ঘটকের অনুকৃত কবির বিখ্যাত ইটালিয়ান ঝিঁঝিট গানটির প্যারডিটি দেখিলেই তাঁহার রসবত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে—

আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো মাড়োয়ারী
তুমি থাক বিশ্ব জুড়ে, ওগো মাড়োয়ারী ॥
তোমায় দেখেছি সাগর পারে তোমায় দেখেছি কোচবিহারে,
তোমায় দেখেছি বড়বাজারে, ওগো মাড়োয়ারী।

আমি পাহাড়ে পাতিয়া হাট কিনেছি কিনেছি তোমার পাট,
আমি তোমারে সঁপেছি মাঠ, ওগো মাড়োয়ারী।
ভুবন ভ্রমিয়া শেষে আমি ফেলেছি কাজেই হেসে,
আমি খাতক তোমারি দ্বারে, ওগো মাড়োয়ারী ॥

যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য রচিত—

(১) ও আমার রামের পাখী (ও আমার দেশের মাটি)। (২) আমার মাথা পিষে' দাও হে তোমার সবুট চরণ তলে (আমার মাথা নত করে দাও হে) প্রভৃতি।

যতীন্দ্রপ্রসাদের অনুকৃত একটি প্যারডি হাস্যরসের সৃষ্টিতে চমৎকার!

সে যে বেড়া কেটে ঢুকেছিল তবু জাগিনি।
ভীষণ চুরি করিল গো, কাঁদে গৃহিণী!
এসেছিল আঁধার রাতে ছালাখানি ছিল হাতে,
ঘুমের মাঝে পালিয়ে গেল, এমন ভাবিনি!
জেগে দেখি শ্যালক সেজে দেরাজ খুলিয়া
গেছেন চলে আমার দফা নিকাশ করিয়া।
কেন আমায় না বলে যায়, ধরা দিতে কভু না চায়,
কেন গো তার পায়ের ধ্বনি কানে শুনিনি ॥

আর একটি গানের দুই লাইন—

আমার কুলীন জামাই! ঠেকে তোমায় ভালবাসি।
সারাদিন তোমার আচার, তোমার ব্যাভার বাজায় প্রাণে ভেঁপু বাঁশী ॥

রসরাজ অমৃতলাল বসুর রবীন্দ্রনাথের ব্রজবুলিতে রচিত প্রসিদ্ধ গান 'গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝের' (ঝিঁঝিট; কাওয়ালী) একটি প্যারডি এক সময়ে বিশেষ পরিচিত ছিল—

তপত কচুরী ঘিয়েতে ভাজে, পুরত সিঙারা আলুয়া সাজে,
করব গরাস তেয়াগি লাজে, শাশুড়ী লেয়াও লেয়াও গো।

আনহ সুচারু পানতুয়া, কড়ি ও কোমল' সুরস কুয়া
আওর যো কুছ বুঝবে তুয়া,—সজনী কুঞ্জে লাও লো ॥

তাঁহার গানে অবশ্য কবির প্রতি শ্লেষই প্রকাশ পাইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি প্রসিদ্ধ গান বিভিন্ন কবির হাতে কিরূপ বিচিত্ররূপ পাইয়াছে, তাহার আলোচনা উপভোগের বিষয় বলিয়া এখানে বিবৃত হইল! সর্ব্বত্রই মূল সুর এবং ভাষাভঙ্গী যতদূর সম্ভব এই গানগুলিতে রক্ষিত হইয়াছে।

কবির 'সে আসে ধীরে, যায় লাজে ফিরে' কি অপরূপ কৌতুকরূপে রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহার নিদর্শন নীচে প্রদর্শিত হইল—

সে আসে ধেয়ে এন, ডি, ঘোষের মেয়ে
ধিনিক ধিনিক ধিনিক ধিনিক চায়ের গন্ধ পেয়ে।
সে আসে ধেয়ে কুঞ্চিত ঘন কেশে, বোম্বাই শাড়ী বেশে,
খট্ মট্ বুট শোভিত পদ-শব্দিত ম্যাটিনেএ ॥
বঞ্চিত নহে সঞ্চিত কেক, বিস্কুট তার প্লেটে;
অঞ্চল বাঁধা ব্রোচে, রুমালেতে মুখ মোছে,
জবাকুসুমের গন্ধ ছুটিছে ড্রয়িং রুমটি ছেয়ে ॥ (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)

সে গাহে গীতে ঘাম ছাড়ে শীতে।
মা নিধা মা নিধা মানি ধানি ক্রুদ্ধ ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে
মানি ধানি সঙ্গীতে।
বিকট মীড় গমকে নিখিল হৃদয় চমকে,
তম্বুরা সুর-বদ্ধ আসে মস্তক চূর্ণিতে উন্মদ ঘূর্ণিতে ॥
শঙ্কিত চিত কম্পিত অতি বণ্টন শুনে টন্ টন্
কুণ্ঠিত বৃষ গাধা, গজ্জিত রব সাধা।
কোমল কড়ি কর্ত্তব চাহে গুম্ফিত মুখটিতে
নিস্তব্ধ ফুটিতে ॥ (সতীশচন্দ্র ঘটক)

বাংলা হাসির গান প্রসঙ্গে আর এক জনের নাম করিতে হয়—তিনি সুকুমার রায়চৌধুরী। তাঁহার 'আবোল তাবোল' চিরকাল আমাদের আনন্দ প্রদান করিবে। রবীন্দ্রনাথ নাকি সুকুমার রায়ের একটি কবিতায় সুর যোজনা করিয়াছিলেন! কবিতাটির প্রথম চরণ—

"গান ধরেছেন গ্রীষ্মকালে ভীষ্মলোচন শর্ম্মা।" বাউল

কোন সুররসিক যদি সুকুমারবাবুর অন্যান্য কবিতাগুলিকে সুরযোজনা করেন, তবে বাংলা হাসির গানে সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে।

রবীন্দ্রনাথের হাস্যরস বিমল, তাহাতে চাতুর্য্য আছে কিন্তু প্রাচুর্য্য নাই। এ যেন কুণ্ঠাজড়িত অস্বচ্ছ হাসি! তাঁহার হাস্যরস তরল না হওয়ায় প্রাকৃতজনের পক্ষে অনধিগম্য হইয়াই রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের কৌতুক-সঙ্গীত হাসির উদ্রেক করিবার জন্য নয়। সুকুমার রায়চৌধুরীর রচনার মত Comic songs নয়, এইগুলি চটুল লঘু তরল ভাব প্রকাশের গান মাত্র। এইগুলিতে যতটা wit আছে, humour ততটা নাই। এই গানগুলির নাম হওয়া উচিত 'চটুল গান'। তাঁহার কৌতুক সঙ্গীতকে কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।—

(ক) কতকগুলি তরল ভাবের ও সুরের মধ্য দিয়া উচ্ছ্বাস প্রকাশ—মোদের যেমন খেলা। আমরা খুঁজি খেলার সাথী। মোদের কিছু নাইরে নাই। আমাদের পাকবে না চুল। আমাদের ভয় কাহারে। অভয় দাও তো বলি আমার wish কি (কাফি)। চা স্পৃহ চঞ্চল চাতক দল প্রভৃতি।

(খ) কতকগুলি গান বিচিত্র চটুলভাব ও ভঙ্গী প্রকাশের জন্য—চলো নিয়মমতে। হাঁচ্চোঃ। হা-আ-আ-ই। (একটি হাঁচির আর একটি হাঁই তোলার গান) বলবো কী আর উঁ উঁ। এছাড়া নৃত্যনাট্যগুলির কোন কোন গান এ শ্রেণীর।

(গ) কতকগুলি শ্লেষাত্মক—তোমরা হাসিয়া বহিয়া যাও। ওগো ভাগ্যদেবী পিতামহী। যমের দুয়ার খোলা পেয়ে। না গান গাওয়ার দল।

কাঁটাবনবিহারিণী। ও ভাই কানাই। পায়ে পড়ি শোনো ভাই গাইয়ে। ভালো মানুষ নই রে মোরা। ওগো তোমরা সবাই ভালো প্রভৃতি।

চটুল ভাব ছাড়া ঠিক হাসির গান না হইলেও রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য ভাবোচ্ছ্বাসের গানগুলি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে হয়। শিশুসুলভ মনোভাব প্রকাশের জন্য— "মেঘেরা চলে যায়।" "হেদে গো নন্দরাণী।" "তোমার কটীতটের ধটি কে দিল রাঙিয়া"। ইহা ছাড়া আবেগাত্মক উচ্ছ্বাস—"যাবই আমি যাবই," "আগে চল আগে চল, ভাই," "আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে," "যাত্রী আমি ওরে" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের হাসির গানগুলি অধিকাংশই সহজ রাগ-রাগিণীতে (খাম্বাজ—আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল) অথবা প্রচলিত গ্রাম্য বাউল সুরে (যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে) রচিত। কোথাও সুরকে অযথা প্রাধান্য দিয়া অন্তঃস্থ রসের ব্যাঘাত করা হয় নাই। নৃত্যে মনোভাব প্রকাশের ন্যায় সঙ্গীতে স্বরসম্মত উপায়ে কৌতুকরস প্রকাশ করা হইয়াছে। বাল্মীকি-প্রতিভায় রবীন্দ্রনাথের সহজ সরলভাব প্রকাশের ছলে এই প্রকার কয়েকটি তরল গান আছে—বলবো কী আর বলবো খুড়ো (গৌরী)। সর্দার মশায়, দেরি না সয় (শঙ্করা)। আঃ, বেঁচেছি এখন (সিন্ধু)। এইগুলি প্রায় সবই পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে রচিত। 'তাসের দেশে' অদ্ভুত রসের সৃষ্টির জন্য কয়েকটি মজার গান আছে—(১) হা-আ-আ-আই, (২) আমাদের যুদ্ধ, (৩) হাঁচ্চো,—কি ভয় দেখাচ্চো, (৪) জয় জয় তাসবংশ অবতংস, (৫) ইস্কাবন-চিঁড়েতন প্রভৃতি। এইগুলিতে সুর অপেক্ষা স্বরানুকৃতির প্রভাব বেশি প্রকাশ পাইয়াছে।

এই শ্রেণীর স্বরানুকৃতি সহযোগে হাস্যরসের অবতারণা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আরও ছিল। যেমন—খাম্বাজ; আড় খেমটায়—

(কোরাস) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হেসে বাঁচিনে ॥
দাড়ি ফেলে সাড়ি পরে, সাজস্থ গো কনে।
(কোরাস) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হেসে বাঁচিনে ॥

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "হাঃ হাঃ হাঃ এই জায়গাটাতে সুর হাসির অনুকরণে রচনা করিয়া দিয়াছিলাম।"

দ্বিজেন্দ্রলালের এইপ্রকার অভিনয়-প্রবণাত্মক হাসির গানের সুর অতুলনীয়। তবে রবীন্দ্রনাথের মতে ইহা অবশ্য সুরলক্ষ্মীর অপমান!

কবির স্বাভাবিক রহস্যপ্রিয়তা অনেক সময়ে সুন্দর সুন্দর হাসির গান রচনার প্রেরণা দিয়াছিল, তাহার মধ্যে দুইটি গান—অবশ্য ঠিক জানি না এগুলির সুর সকলের জানা আছে কিনা! কানাড়া রাগিণীতে—হায় রে হায় সারে গামা পাধা নিসা।

(আমার) গাড়ীর হলো উল্টো মতি, কোথায় হবে আমার গতি ;
খুঁজে আমি না পাই দিশা। সারে গামা পাধা নিসা ॥

ভৈরবী, ঝাঁপতালে—

যদিও আঘাত গায়ে লাগেনি তবুও করুণ সুরে,
দিব আমি গান জুড়ে ঝাঁপতালে, ভৈরবী রাগিণী।
শুন সবে দিদিমণি মামা, সারে সারে সারে গারে গামা ॥

তারপর আসিল 'হৈ হৈ সঙ্ঘের' যুগ। এই মজলিসের কৌতুক অভিনয়ের ফরমাইশে রবীন্দ্রনাথ হাসির গান রচনা করিয়াছিলেন।

গোড়ায় গলদ, শেষরক্ষা, বিনি পয়সার ভোজ প্রভৃতি কয়েকটি কৌতুকনাট্যেও কবির এ শ্রেণীর গান আছে। এ ধারার অনেকগুলি গান 'ফাল্গুনী' গীতিনাট্যের ঠাকুরদা'র ছন্নছাড়া দলের উল্লাসের গান এবং কয়েকটি উক্ত হৈ হৈ সঙ্ঘে'র "ভরসা-মঙ্গল" নামক উল্লাস অভিনয়ের জন্য রচিত। 'আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল' গানটি বাঁশরী গীতিনাট্যের। এগানগুলির সুর প্রায় সবই

উল্লাসের, কৌতুক অথবা বিদ্রূপের যথার্থ উপযোগীও নয়।

হাসির গান তাহাকেই বলে যে গানে প্রধানতঃ কোন ব্যক্তি, সমাজ অথবা আচারকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করা হয়, অথচ সেই বিদ্রূপ ব্যঙ্গের মধ্যে অনেকখানি সমবেদনা সহানুভূতিও লুকানো থাকে।

নৃত্যনাট্যগুলিতে নানারসের গান থাকিলেও হাস্যরস কিন্তু বিন্দুমাত্র নাই! কবির রচনা এতো Serious যে, কৌতুক করিবার অবসরও নাই।

হাস্যকে স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করিবার মতন ক্ষমতা সুরের সত্যসত্যই নাই। রবীন্দ্রনাথের হাসির গানে সুরুচি রক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু রাগ-রাগিণীর শক্ত কাঠামোয় সুরের স্বাভাবিক অঙ্গচালনা হয় নাই, কাজেই সেগুলি গানই হইয়াছে, হাসির প্রেরণামূলক গান হয় নাই।

তাহা ছাড়া, কবি মনে করিতেন সঙ্গীতকলার মধ্যে অন্য কোন শিল্পকলার প্রভাব সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয়, অনধিকার চর্চ্চা। কবি সুরের মধ্যে অভিনয়প্রবণতা প্রকাশের বিরোধীই ছিলেন, তাঁহার মতে— "দুঃখের গানে গায়ক যদি সেই অশ্রুপাতের এবং সুখের গানে হাস্যধ্বনির সহায়তা গ্রহণ করে তবে তাতে সংগীতের সরস্বতীর অবমাননা করা হয় সন্দেহ নেই। সুরে ও কণ্ঠে জোর দিয়ে হৃদয়াবেগের নকল করতে গেলে সংগীতের সেই গভীরতাকে বাধা দেওয়া হয়।"

তাহা সত্ত্বেও এ সকল গানের সুর প্রায় সর্বত্রই বিলিতি ধরণের অভিনয়-মুখী হইয়া পড়িয়াছে! কবি এসম্বন্ধে একটি কৈফিয়ৎও দিয়াছেন—

"এই একই কারণে হাস্যরস আমাদের সংগীতের আপন জিনিষ নয়। কেননা বিকৃতিকে লইয়াই বিদ্রূপ। প্রকৃতির ত্রুটিই এই বিকৃতি, সুতরাং তাহা বৃহতের বিরুদ্ধে। শান্ত হাস্য বিশ্বব্যাপী, কিন্তু অট্টহাস্য নহে। সমগ্রের সঙ্গে অসামঞ্জস্যই পরিহাসের ভিত্তি। এইজন্যই আমাদের আধুনিক উত্তেজনার গান কিংবা হাসির গান স্বভাবতই বিলিতী ছাঁদের হইয়া পড়ে।"

রবীন্দ্রনাথের উদ্দীপনার গান

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এ শ্রেণীর গানের ভূমিকায় বলিয়াছেন "কোনো একটা বিশেষ উদ্দীপনা—যেমন যুদ্ধের সময় সৈনিকদের মনকে রণোৎসাহে উত্তেজিত করা—আমাদের সঙ্গীতের ব্যবহারে দেখা যায় না। তার বেলায় তুরী ভেরী দামামা শঙ্খ প্রভৃতির সহযোগে একটা তুমুল কোলাহলের ব্যবস্থা। কেন না, আমাদের সঙ্গীত জিনিসটাই ভূমার সুর। তার বৈরাগ্য, তার শান্তি, তার গম্ভীরতা সমস্ত সংকীর্ণ উত্তেজনাকে নষ্ট করিয়া দিবার জন্যই। এই জন্যই আমাদের আধুনিক উত্তেজনার গান কিংবা হাসির গান স্বভাবতই বিলিতি ছাঁদের হইয়া পড়ে।"

রবীন্দ্রনাথ আমাদের সঙ্গীতের এই বীররসের দৈন্য বিশেষ দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাই বিলিতি ভঙ্গীতে দৃপ্ত, তেজস্বী, ওজস্বী গম্ভীর সুরের গানে উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছেন। বাংলা দেশে একমাত্র দ্বিজেন্দ্রলালের ও কাজী নজরুল ইস্‌লামের কয়েকটি গান ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের এই পর্য্যায়ের সমতুল্য গানের রচনা আজিও হয় নাই।

দিলীপকুমার যে মনে করেন এ শ্রেণীর গানে রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষা দ্বিজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব অনেক বেশি, তাহা মোটেই অযৌক্তিক নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সুরে যে পৌরুষব্যঞ্জক ভাব প্রস্ফুরিত তাহা অতুলনীয়! কিন্তু তাঁহার ধারা পরে ব্যাহত হইয়া গেল। দিলীপকুমারের কথায়—"তিনি বাংলাগানে সুরসমৃদ্ধি, পৌরুষ ও স্বদেশভক্তির উজ্জ্বল আবাহন ক'রে সার্থক গীতিকার তথা সুরকার পদবী অর্জন করেছেন। কিন্তু তাঁর এ-কীর্ত্তি পুরোপুরি সার্থক বল্‌ব তখনই যখন দেখ্‌ব যে

চলেছে—থামছে না, আরো ঊর্ধ্বে আরোহণ করবার প্রেরণা দিচ্ছে, বেশ শান্তির ঘুমপাড়ানি কোলে ঘুম পাড়াচ্ছে না।"

ললিত গীতের শ্রোতাদের অনভ্যস্ততার দরুণ সে প্রগতি কেবল স্তব্ধই হয় নাই, উদাত্ততা ক্রমেই নম্রতায় নামিতেছে!

গম্ভীর ভাবকে বাণীরূপ দেওয়ায় জন্য ভারতীয় সঙ্গীতে ধ্রুপদ-পদ্ধতি প্রচলিত আছে, কিন্তু এই ধ্রুপদ ভাগবতী গীতিরই কেবল উপযোগী; উৎসাহময় গানের জন্য এই পদ্ধতির প্রয়োগ সুষ্ঠু নয়। ইউরোপীয় Chorus songsও অনেকটা ওজস্বী সুরের, তাহারই পন্থানুসারে রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই বীররসের গানগুলি সমবেত কণ্ঠের উপযোগী করিয়া রচিত হইয়াছে।

গম্ভীর আবেষ্টনী, প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়, উদাত্ত আবাহন, আনন্দ-উচ্ছ্বাস, উদ্বেল আনন্দ, দৃপ্ত বিশ্বাস, আন্তরিক দেশ-প্রীতি, আত্মপ্রত্যয় কবি প্রকাশ করিয়াছেন বিলাতি গীতিরীতির সহায়তায় নিম্নের গানগুলিতে—(১) ঐ মহামানব আসে। (২) ঐ বুঝি কাল বৈশাখী। (৩) আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে। (৪) আমরা নূতন যৌবনেরই দূত। (৫) আয়রে তবে মাতরে সবে। (৬) আর নহে, আর নয়। (৭) দেশ দেশ নন্দিত করি। (৮) আমরা দুজনা স্বর্গ খেলনা গড়িব না ধরণীতে প্রভৃতি।

তিনটি পৃথক বিষয় এই উত্তেজনার গানগুলির সহায়—(১) সমবেত কণ্ঠ, (২) জোর যন্ত্রসঙ্গীত এবং (৩) দ্রুতগতি। রবীন্দ্রনাথ বলেন :—"আমাদের হাল ফ্যাসানের কন্সার্টের গৎগুলি তার প্রমাণ। এই গতের সুরগুলি কাটা কাটা হইয়া নৃত্য করিতে থাকে, কিন্তু তাদের মধ্যে সেই বেদনার সম্বন্ধ থাকে না, যা লইয়া আমাদের সঙ্গীতের গভীরতা। এইসব কাটা সুরগুলিকে লইয়া নানা প্রকারে খেলানো যায়,—উত্তেজনা বল, উল্লাস বল, পরিহাস বল মানুষের

বিশেষ বিশেষ হৃদয়াবেগ বল, নানাভাবে তাদের ব্যবহার করা যাইতে পারে।"

এই ধারায় Church Music-এর অনুকরণে সৃষ্ট সমবেত কণ্ঠোপযোগী প্রার্থনাসঙ্গীতগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয়—এইগুলির ভঙ্গী যেমন দৃঢ় ও ওজস্বী, তেমনি উদ্দীপক ও গাম্ভীর্যদ্যোতক; পিয়ানোর গম্ভীর শান্ত সঙ্গত এই শ্রেণীর গানের প্রধান সহায়ক। এই জাতীয় গানের নিদর্শন—'সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি'। 'আমার সকল রসের ধারা'। 'তোমার হলো সুরু আমার হল সারা'। মোর মরণে তোমার হবে জয়' প্রভৃতি। 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' গানটির গুরুগাম্ভীর্য্য আমাদের অন্তরে সাত্ত্বিকভাব উদ্দীপিত করে।

হিন্দুমেলা উপলক্ষে রচিত 'একসূত্রে বাঁধা আছি সহস্রটি মন' খাম্বাজ রাগিণীতে এই পর্য্যায়ে রবীন্দ্রনাথের প্রথম গানের নিদর্শন। এই গানটিরই আনুরূপ্যে বাল্মীকিপ্রতিভায় 'এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে' গানটি সৃষ্ট হয়।

বাল্মীকি-প্রতিভায় দস্যুদিগের অনেক গানেই এই উদ্দীপনার ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। যথা (১) কালী কালী কালী বলো রে আজ, (২) এই বেলা সবে মিলে চল হো, (৩) গহনে গহনে যারে তোরা। প্রথমটি জংলা ভূপালী, দ্বিতীয়টি ইমন কল্যাণ এবং তৃতীয়টি বাহার রাগিণীতে রচিত। প্রায় সবগুলি গানেই কথার উচ্চারণে, সুরের উঠানামায় এবং দ্রুত গতিতে উত্তেজনা প্রকাশ পাইতেছে। মনোভাবের উদ্দামতার উচ্ছ্বাস যে সুরেও প্রকাশ করা যায় সঙ্গীতের রসপ্রমাতা Herbert Spencer তাহা প্রথম লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কবি তাঁহার এ শ্রেণীর গানে স্পেন্সারের মতটি গ্রহণ করিয়াছেন। সে মতটির কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

তাঁহার উদ্দীপনার গানগুলির সুরও প্রায় সকল স্থানেই উত্তেজক কথারই বহিঃপ্রকাশের সহায়ক রূপে গাঁথা হইয়াছে। এই সকল গানের গতি দ্রুত লয়ে, কারণ সুরের তৎপরতার দ্বারাই মানসিক দ্বন্দ্ব প্রকাশ পায়। কবি সে কথা নিজেও বলিয়াছেন "অনেক সময়ে আমরা উল্লাসের গান রচনা করিতে হইলে রাগিণী যে ভাবেরই হোক তাহাকে দ্রুততালে বসাইয়া লই, দ্রুততাল সুখের ভাবপ্রকাশের একটা অঙ্গ বটে।" এই অঙ্গের গান—গগনে গগনে ধায় হাঁকি।

তালের উপরই এই সকল গান সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। মনের উত্তেজনা যতটা প্রকাশ পাইবে সুরে তাহার অপেক্ষা অধিক নির্ভর করিবে উপযোগী ছন্দের উপর। রণসঙ্গীত বা March Songএর এককালীন পায়ের তাল পড়িবার মত একটি বিচিত্র ছন্দোগতি এই গানগুলির সুর প্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর গানের মধ্যে—শুভকর্ম্মপথে ধরো নির্ভয় গান ; চলো যাই, চলো যাই ; আগে চল, আগে চল ভাই প্রভৃতি। কবির এ সব গানে সাধারণতঃ ঝাঁপতাল (৫ মাত্রা),তেওড়া (৭ মাত্রা), সুরফাক্তা (১০ মাত্রা) প্রভৃতি ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই সকল গানের সবচেয়ে সহায়ক হইয়াছে উচ্চারণ-পদ্ধতি। মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনঘন,গাম্ভীর্য্যময় যুক্তাক্ষরবহুল কথার উপরই এই গানগুলির উৎকর্ষ নির্ভর করিতেছে। এই শ্রেণীর অনেক গানের শব্দঝঙ্কারই উদ্দীপনা প্রকাশ করে—নীল অঞ্জন ঘন, হৃদয়ে মন্দ্রিল, আঁধার অম্বরে, ধ্বনিল আহ্বান, পিনাকেতে লাগে টঙ্কার, প্রচণ্ড গর্জনে, মাতৃমন্দির, সর্ব খর্বতারে, আহ্বান আসিল মহোৎসবে, দারুণ অগ্নিবাণেরে প্রভৃতি।

অনেক গানে একটি শব্দের উপর ঝোঁক বা stress দিয়া তাহার দৃপ্ততার কথা বিশেষ ভাবে জানানো হইয়াছে—নাই নাই ভয়। নয় নয় এ মধুর খেলা। হবে জয়, হবে জয়। হারে রে রে প্রভৃতি।

সুরের ব্যবহারে কবিকে মৌলিকতা দেখাইতে হইয়াছে। রাগরাগিণীর

মধ্যে যে গুলি গাম্ভীর্য্যপ্রকাশ করিবার উপযুক্ত যেমন ভৈঁরো, খাম্বাজ, হাম্বীর, শঙ্করা প্রভৃতি তো আছেই, সে সঙ্গে অন্যান্য মৃদুরাগিণীকেও বিচিত্রভাবে গম্ভীর করিয়া তুলিয়াছেন।

ধ্রুপদের নিয়মবদ্ধ বন্ধনের মধ্যে উল্লাস, উত্তেজনার আবেগ প্রকাশের স্বর সুরশৃঙ্খলের আবদ্ধে চাপা পড়িয়া যায়। রাগরাগিণীর উল্লাস প্রকাশ, উচ্চস্বর হইতে নিম্নস্বরে আকস্মিক পরিবর্ত্তন, সুরের রকম-ফের, প্রচলিত রীতির ধ্রুপদে সম্ভব নয়, একমাত্র দ্রুতলয়ের খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদের পদ্ধতি অনেকটা এই তেজঃসন্দীপক ভাব প্রকাশ করে। কিন্তু খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদ অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। পাঁচটি মহিষের সমান বল ব্যতীত এই ধ্রুপদ নাকি গাওয়া যায় না! তাহা সত্বেও সাধারণ ধ্রুপদ রীতিতে রচিত উপাসনার গানেও কবি উদ্দীপনাময় সুর ব্যবহার করিয়াছেন। ভৈরবী সুরে 'আনন্দ তুমি স্বামী, মঙ্গল তুমি' ; ইমনকল্যাণে 'সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি'; ভূপনারায়ণে 'মোরা সত্যের পরে মন' প্রভৃতি উচ্চাঙ্গ সুরের পদ্ধতিতে রচিত প্রথম যুগের উদ্দীপক উপাসনার গানের নিদর্শন।

দ্রুতলয়ের হিন্দি তেলেনা-চতুরঙ্গ গানও উদ্দীপনা প্রকাশ করে। কবি বলেন—"যে কোন তেলেনা লইয়া যদি পরীক্ষা করিয়া দেখি, তবে দেখিতে পাইব যে, তার সুরগুলিকে কাটা কাটা রাখিলে একই রাগিণীর দ্বারা নানাপ্রকার হৃদয়ভাবের বর্ণনা হইতে পারে।" এই প্রকার তেলেনা গান কবির—(১) ঐ পোহাইল তিমির রাতি, (২) চরাচর সকলি মিছে মায়া, (৩) সুখহীন নিশিদিন, (৪) এই বেলা সবে মিলে চলো হো প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথের উদ্দীপনার গানগুলির অধিকাংশ ভারতীয় রাগ-রাগিণী সম্মত সুরে রচিত হইলেও প্রতিটি গানেরই উল্লাস অথবা বীর্যভাবটি

অভিব্যক্ত করিবার জন্য পাশ্চাত্য সুরের ভঙ্গিগুলি তিনি নানাভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন।

এই সমস্ত গানই তারুণ্যের সজীবতায় সমুজ্জ্বল এবং প্রাণচঞ্চল! তাই এই পর্য্যায়ের গানগুলিকে 'নবযৌবনের গান' আখ্যা দেওয়া যায়। তরুণের জয়যাত্রাকে উৎসাহিত করিবার জন্য কবির বিশেষ গীতিনাট্য ফাল্গুনী, নবীন, বসন্ত, শারোদৎসব, তাসের দেশ, এ শ্রেণীর গানে পূর্ণ। কবির অধিকাংশ নাটকেই একটি তরুণের দল আছে, 'ঠাকুর দা' হইলেন সে দলের অধিনায়ক; নবজাগ্রত প্রাণের উদ্দীপনা ফুটিয়া উঠে তাহাদের গানে—(১) ভাঙো ভাঙো বাঁধ ভেঙে দাও, (২) আনন্দেরি সাগর হতে, (৩) আমাদের ভয় কাহারে, (৪) আমরা লক্ষীছাড়ার দল, (৫) সব কাজে হাত লাগাই মোরা, (৬) আমরা নূতন যৌবনেরি দূত, (৭) মোদের যেমন খেলা (৮) যিনি সকল কাজের কাজী, (৯) আমরা নূতন প্রাণের চর প্রভৃতি। শরৎ এবং বসন্তের অধিকাংশ গানের মধ্যেই উল্লাসের সুর ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ঋতুমঙ্গলের অন্যান্য গানের সুরে উদ্দীপনা না থাকিলেও উজ্জীবনের উল্লাস কিংবা উদাত্ত হৃদয়াবেগ প্রকাশ পাইয়াছে—(১) হৃদয় আমার ঐ বুঝি তোর, (২), বৈশাখ হে মৌনী তাপস, (৩) হে তাপস, তব শুষ্ক কঠোর, (৪) চক্ষে আমার তৃষ্ণা, (৫) নমো নমো হে বৈরাগী প্রভৃতি। বৈশাখের রুদ্র বৈরাগী রূপটির বিকাশের জন্য কবি সব সময়ে গম্ভীর সুরের ব্যবহার করিয়াছেন।

আত্মসচেতনতা ও আত্মনির্ভরতার উদ্দীপনা দিতে, অন্যায়ের প্রতিবাদে, ক্লৈব্য দমনে তাঁহার আকুল আগ্রহ সব সময় কবি উদাত্ত সুরে প্রকাশ করিয়াছেন—(১) পাছে সুর ভুলি এই ভয় হয়, (২) কালের মন্দিরা যে, (৩) আমি ভয় করব না, (৪) নয় এ

মধুর খেলা, (৫) অনেক দিনের শূন্যতা মোর, (৬) হবে জয়, হবে জয় প্রভৃতি। এ শ্রেণীর গান সংখ্যায় অল্প হইলেও এগুলিতে বৈচিত্র্য আছে।

কবির গীতিভাণ্ডারে এ গানগুলি স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়া রহিয়াছে। এ সমস্ত গানের উৎকর্ষ নির্ভর করিতেছে গায়নের কণ্ঠেরই উপর; গম্ভীর উদাত্ত পৌরুষদীপ্ত কণ্ঠে এগুলি যেমন বলিষ্ঠতা অর্জন করিবে, স্ত্রীজনসুলভ সুকুমার গলায় মোটেই ভাল শুনাইবে না!

কবির এ শ্রেণীর গান কেবল মাত্র যোগ্য গায়কের অভাবেই সম্যক সমাদৃত হইতে পারে নাই। সুরসমালোচক অনেকেই সে বিষয়ে আক্ষেপও করিয়াছেন। শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিতেছেন "বীর্য্যের গানও বাদ যায়নি তাঁর সৃষ্টি থেকে, তাঁর গান গেয়ে আমাদের দেশের ছেলেরা ফাঁসিকাঠে ঝুলেছে; বন্দীর মুস্‌ড়েপড়া মন চাংগা হয়ে উঠেছে এই গানে। যে গান প্রাণের রসে পরিপূর্ণ এবং যে গানে সব রস প্রকাশিত কথা ও সুরের মিলিত ব্যঞ্জনায় সেই গানেই আছে আসল জোর।"

কবির 'সঙ্গীতের মুক্তি' প্রবন্ধ প্রকাশের সময়ে বাংলাদেশের রক্ষণশীল সঙ্গীতের মহলে একটি আলোড়ন আসিয়াছিল। সে প্রবন্ধে কবি বলেন উদ্দীপনা এবং কৌতুকের গান আমাদের দেশে ছিল না; এ বিষয়ে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্ত চিন্তামণি তীব্র প্রতিবাদ করিয়া জানান "তন্ত্রশাস্ত্র বাংলার নিজস্ব সম্পত্তি। ভয়ঙ্করের পূজা বাংলাদেশের যে রূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল সেরূপ ভারতের কুত্রাপি নহে; সেই তন্ত্রপ্লাবিত দেশে বীরোচিত সঙ্গীতাদির ব্যবহার নাই দেশের হস্তান্তর প্রাপ্তিই তাহার কারণ। বীররসোদ্দীপক কাব্যের এবং তদঙ্গীভূত গানের ব্যবস্থা আছে……যেমন অশদল গজদল সাজনি রামা ……। মতিদানা, তোটক প্রভৃতি ছন্দে খড়্‌কা নামক গীতাদি যথাযথ-

ভাবে গায়ন করিলেই আপনাদের অবসন্ন হৃদয় বীররসে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে, যেমন—

ঝল্‌ঝল্‌ তেজ ঝলাঝল গেল। টটটুর রথ্য অপক্ষর পেল।"

কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ যে স্বরশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন সে কথা মহারাজা শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন! নারায়ণ পত্রিকায় শ্রীশরৎচন্দ্র সিংহ মহাশয়ও কবির উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছিলেন—"রণসঙ্গীতের ব্যবহার ভারতের সাবেক আমলে যে একেবারে ছিল না, তা বড় গলা করে বলা চলে না। যদি এক কুরুক্ষেত্রের শাঁখের হিসেব ধরা যায়, তা হলে মিলিটারী ব্যাণ্ড যে কি রকমে গঠন হয়েছিল, তার একটু আভাস পাওয়া যেতে পারে!"

প্রাচীন সাহিত্যেও ঘন ঘন দুরুচ্চার শব্দযোজনার দ্বারা চিরকালই যুদ্ধবর্ণনা করা হইত। এইশ্রেণীর ধ্বন্যাত্মক শব্দ উদ্দীপনার সঞ্চার করে; যেমন বিদ্যাপতির কীর্ত্তিলতার গানে শব্দযুদ্ধ—

গঅন্নী করন্তো সিবন্তো ভরন্তো। মহামাস্থখণ্ড পরেতো ভরন্তো॥
সিয়াসার ফেক্কার রোলং করেন্তো। বুভুগ্‌খা বহু ডাকিনী ডক্করেন্তো॥

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের মানসিংহ-প্রতাপের যুদ্ধ—

ধুধু্‌ ধম্‌ ধম্‌ ঝাঁ ঝাঁ ঝম্‌ ঝম্‌ দামামা দম্‌ দম্‌ বাজে।
হুড় হুড় হুড় দুড় দুড় দুড় কামানের গোলা গাজে।
সিন্দুর সুন্দর মণ্ডিত মুদ্গর যোড়শ হলকা সাথী।
পতাকা নিশান রবিচন্দ্র বাণ অযুতেক ঘোড়া হাতী॥

স্বদেশী গান—কবির স্বদেশীগানগুলির অধিংকাংশই কিন্তু উদাত্তস্বরে উপনিবদ্ধ নয়, এ গুলির মধ্যে একটি শান্ত স্নিগ্ধ শুচি হৃদয়াবেগ স্পন্দিত হইতেছে। অনেক সমালোচকই এজন্য কবির প্রতি দোষারোপ করেন; তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের আদর্শই ছিল শান্ত মধুর স্নিগ্ধগুণোপেত। রুদ্ররসের গান তাঁহার

কণ্ঠে সহজে তাই আসে নাই। তাহাছাড়া কবি তাঁহার স্বদেশী-গানের অধিকাংশেই বাংলাদেশের প্রশান্তিময় মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্যের বর্ণনাই করিয়াছেন, এখানে রুদ্ররসের অবতারণার অবকাশইবা কোথায়? যেমন—সার্থক জনম আমার (ভৈরবী)। আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে (বিভাস)। আমায় বোলনা গাহিতে বোলনা (সিন্ধু)। আমার সোনার বাংলা (বাউল)। আমরা পথে পথে যাব (রামকেলি)। আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে (রামপ্রসাদী) প্রভৃতি। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গানের মতন প্রাণচাঞ্চল্য তাঁহার গানে নাই।

তবে তাঁহার বহু স্বদেশীগানের সুর উদ্দীপনাময় গাম্ভীর্য্যেও গ্রথিত। এগুলির মধ্যে (১) দেশ দেশ নন্দিত করি, (২) সঙ্কোচের বিহ্বলতা, (৩) মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন, (৪) নাই নাই ভয়, (৫) ব্যর্থ প্রাণের আবর্জ্জনা পুড়িয়ে ফেলে, (৬) সর্ব খর্বতারে দহে, (৭) ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে প্রভৃতি গানের সুরে আশা, আত্মসচেতনতা, উদ্দীপনা প্রকাশ পাইয়াছে। বিশেষতঃ হাম্বীর রাগিণীকেই এশ্রেণীর গানে গাম্ভীর্য্য দ্যোতনায় প্রয়োগ করিয়াছিলেন—জননীর দ্বারে আজি ওই, আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে; ভূপালীতে—আজি এ ভারত লজ্জিত-হে প্রভৃতি।

তাঁহার এই সব স্বদেশীগান প্রায়ই সবই সমবেত কণ্ঠের উপযোগী করিয়া রচিত। তাহাছাড়া 'আমাদের শান্তিনিকেতন, মোরা সত্যের পরে মন, আমাদের যাত্রা হলো শুরু' প্রভৃতি গানও এ রকম কোরাস সুরের উপযোগী। এ সকল গানে উদ্দীপনার সঙ্গে উল্লাসের ভাবও বিজড়িত। এমনকি তাঁহার অনেক বাউল গানেও উৎসাহ উদ্দীপনা প্রকাশ পাইয়াছে; স্বদেশী গানেও কবি বাউলের সুর প্রয়োগ করিয়াছেন—যদি তোর ডাক শুনে, নিশিদিন ভরসা রাখিস, তোর আপন জনে ছাড়বে, এই কথাটা ধরে রাখিস, বক্ষে তোমার বাজে বাঁশী প্রভৃতি।

কবির আদি যুগের স্বদেশী গানগুলির সুর কিন্তু অতিরিক্ত ভাবপ্রধান নম্রতাপূর্ণ, যেমন—(১) অয়ি বিষাদিনী বীণা (বাহার); (২) ভারত রে তোর কলঙ্কিত (ভৈরবী)। জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমনের' সুরও তেমন ঔদার্য্যপূর্ণ মোটেই নয়! তবে অধিকাংশ স্বদেশী গানের মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দৃঢ়তা প্রকাশ পাইয়াছে।

কবি সাধ্যপক্ষে জাতীয় অন্দোলনে সক্রিয় সাহিত্যেতর অংশ গ্রহণে চিরকালই বিরত ছিলেন। একমাত্র দৃষ্টান্ত জনগণের ভীড়ে নিজেকে মিশাইয়া রাখীবন্ধন উৎসবে (৩০শে আশ্বিন, ১৩১২) সকালে 'বাংলার মাটি' গানটি গাহিতে গাহিতে বিরাট শোভাযাত্রা পরিচালনা করিয়া গঙ্গার ঘাটে লইয়া যান। সে দিনই বিকালে 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি' গানটি গাহিয়া আর একটি শোভাযাত্রার পুরোভাগে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের চতুরঙ্গ পরিচালনা তিনি করেন নাই—তিনি ছিলেন মন্ত্রদাতা চারণ।

অতুলপ্রসাদ এবং দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশীগানের সুর যে রকম জনগণ সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছে, তাঁহার গান তেমন আদৃত হয় নাই! কবি স্বদেশী গানের সুরে কলাকৌশল দেখাইয়াছেন তাহাও হয়ত তাঁহার গানের জনসমাদরের বাধা হইয়াছে। অতুলপ্রসাদী, দ্বিজেন্দ্রলালী গীতি তাহাদের সুরের সহজ সঞ্চরণ এবং ভাবের চারণ ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যগীতি

বাংলাদেশের সমস্ত গানই তাহার কাব্যধারার অন্তর্গত। কবি বাংলার এই সুর ও বাণীর মিলনকে 'অর্দ্ধনারীশ্বর রূপ' বলিয়াছেন। বাংলা কাব্য হিন্দুস্থানী সুরের সহায়তায় উৎকর্ষ লাভ করিবে, কবি সে আশায় গীতরচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন—"বাংলায় নূতন যুগের গানের সৃষ্টি হোতে থাক্‌বে ভাষায় সুরে মিলিয়ে। সেই সুরকে খর্ব কর্‌লে চল্‌বে না। × × × এই মিলন সাধনে ধ্রুব পদ্ধতির হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সহায়তা আমাদের নিতে হবে, আর অনিন্দনীয় কাব্য মহিমা তাকে দীপ্তিশালী করবে।"

কবি তাঁহার এই কাব্যগীতিগুলিতে সেই ভাবে কথা ও সুরের যুগল মিলন ঘটাইয়াছেন।

গান হইতেছে এক শ্রেণীর গীতিকবিতা। সাধারণতঃ দশবারো লাইনের Lyric কবিতা হইতেছে রবীন্দ্রনাথের গানের আদর্শ আয়তন। এত ক্ষুদ্র কাব্যাংশে কোন অন্তর্নিহিত মনোভাবের পরিপূর্ণ প্রকাশ সম্ভব নয়; রবীন্দ্রনাথের গান তাই কাব্য-রসানুভূতির গূঢ় আভাস মাত্র।

সাধারণতঃ সুরের রূপ প্রকাশের জন্যই বাণীসন্নিবেশ হয় গানে, কবির কাব্যগীতিগুলিতে সুরের প্রয়োজনে বাণী গাঁথা হয় নাই। প্রচলিত কবিতাকে অধিকতর মর্ম্মস্পর্শী করিবার জন্যই সুরের সাহায্য লওয়া হইয়াছে, সুর কেবল দোসরমাত্র। গানে সুরই সব, সুরের প্রকাশের জন্যই আনুষঙ্গিক আর যাহা কিছু। যোজিত সুর কবিতায় সুরের অপেক্ষা আবৃত্তিপ্রবণতাই তাই বেশি রহিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ কবি, ছন্দে কথা গাঁথাই তাঁহার ব্রত; সুরসৃষ্টিতেও তাঁহার কবিমানসের গভীর অনুভূতিই প্রাধান্য পাইয়াছে। এ যেন—

"ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া॥"

কিন্তু সুরের রূপ রবীন্দ্রনাথের গানে ভাবের মাঝারে মুক্তি পায় নাই, কবি সুর ও ছন্দের রূপকে বাণীর সঙ্গে চিরতরে বাঁধিয়া দিয়াছেন, পৃথিবীর কোনো সঙ্গীতে এভাবে সুরকে বাণীর আজ্ঞাবহ করা হয় নাই!

কবি তাঁহার গানের বাণীপ্রাধান্যের কথা অস্বীকার তো করেন নাই, বরং সগৌরবে তাহা ঘোষণাই করিয়াছেন—"আমার মনে যে সুর জমে ছিল, সে সুর যখন প্রকাশিত হতে চাইলে, তখন কথার সঙ্গে গলাগলি করে সে দেখা দিল। ছেলেবেলা থেকে গানের প্রতি আমার নিবিড় ভালোবাসা যখন আপনাকে ব্যক্ত করতে গেল, তখন অবিমিশ্র সঙ্গীতের রূপ সে রচনা করলে না, সঙ্গীতকে কাব্যের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে, কোন্‌টা বড় কোন্‌টা ছোট বোঝা গেল না।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিভিন্ন সময়ের রচিত কতকগুলি শ্রেষ্ঠ কবিতায় সুর সংযোজন করিয়াছিলেন। বড় কবিতা যখন গানে পরিণত হইল, তখন Monotony দূর করিবার জন্য সুরের বৈচিত্র্যেরও আয়োজন হইল। সুরাশ্রিত কবিতার ধারায় কবিকে তাঁহার কাব্যপ্রতিভা এবং সঙ্গীত প্রতিভা উভয়ের সুসঙ্গতি রাখিতে হইয়াছে।

সাহিত্য এবং সঙ্গীত রসের ক্ষেত্রে অঙ্গাঙ্গী ভাবে সন্নিবিষ্ট; একটি অন্যটির সাহায্যে পূর্ণতালাভ করে। রবীন্দ্রনাথ বলেন—"এ-ছাড়া শব্দে, ছন্দে, বাক্যবিন্যাসে, সাহিত্যকে সঙ্গীতের আশ্রয় তো গ্রহণ করিতেই হয়। যাহা কোনোমতে বলিবার জো নাই, এই সঙ্গীত দিয়াই তাহা বলা চলে। অর্থ বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে যে-কথাটা যৎসামান্য, এই সঙ্গীতের দ্বারাই তাহা অসামান্য হইয়া উঠে। কথার মধ্যে বেদনা এই সঙ্গীতই সঞ্চার করিয়া দেয়।"

বাংলাদেশের সমগ্র গাথা ও কাব্যসাহিত্য—মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব-

কাব্য, রামায়ণ-মহাভারত সবই এই ভাবে সুরের সহায়তায় অভিনব রূপ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলা চলে "হিন্দুস্থানে বিশুদ্ধ সঙ্গীত প্রাবল্য লাভ করিয়াছে ; কিন্তু বঙ্গদেশে কাব্য ও সঙ্গীতের সম্মিলন ঘটিয়াছে। গানের যে একটি স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য, একটি স্বাধীন পরিণতি, তাহা এদেশে স্থান পায় নাই। কাব্যকে অন্তরের মধ্যে ভালো করিয়া ধ্বনিত করিয়া তুলিবার জন্যই এদেশে সংগীতের অবতারণা হইয়াছিল।"

কবিতা এবং সংগীত উভয়ে উভয়ের পরিপূরক, সংগীতকে বাদ দিলে কাব্য পরিপূর্ণ রসগৌরব পাইতে পারে না। কাব্যে ভাববস্তুর গভীরতা, অর্থগৌরব, বহু তত্ত্বতথ্য অনেক কিছুই থাকিতে পারে, কিন্তু সবার উপরে থাকা চাই সংগীত ! এই সংগীতই পদ্যকে (verse) গীতিকবিতার (Lyric) মাধুর্যদান করে। কাব্যের অন্তর্নিহিত রস ভাষায় যতটা প্রকাশিত হয়—তাহার অনেক বেশি প্রকাশিত হয় সুরে। কাব্যের একটা প্রধান লক্ষণ তাহাতে কথিত অপেক্ষা অকথিত সার্থকতা থাকে বেশি। তাহাই কাব্যের ব্যঞ্জনা। এই ব্যঞ্জনাটি স্পষ্টভাবে অনুভূত হয় সুরের সাহায্যে। এই সংগীত অনেক সময় কাব্যের অন্তর্নিহিত (Intrinsic) না-ও হইতে পারে। সে ক্ষেত্রে পাঠাবৃত্তির সময় বাহির হইতে সে সংগীত আরোপিত করিতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "সত্যের খাতিরে একথা মানতেই হবে যে বিশুদ্ধ সংগীতে হিন্দুস্থান বাংলাকে এড়িয়ে গেছে। যন্ত্রসংগীতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যন্ত্র-সংগীত সম্পূর্ণই সাহিত্য নিরপেক্ষ।"

যন্ত্র-সংগীতে কথা নাই—তবু তাহা যে মর্মস্পর্শ করে তাহাতে সুরের আবেদন আছে বলিয়াই। তবু তাহা রস নয়, রসের উদ্বোধন করে মাত্র। সংগীত হীন কাব্যও রস নয়, তাহাও রসের উদ্বোধক। কাব্য ও সংগীত উভয়ের মিলনেই হয় রসের সৃষ্টি। কবির আবেগের মধ্যেই

থাকে সুর। তাই কবির কাব্য ও সংগীত অঙ্গাঙ্গী ভাবে অনুস্যূত হইয়া গানে অভিব্যক্ত হয়।

গীতিকাব্য ছাড়া অন্যান্য কাব্যে অর্থগৌরবই প্রাধান্য লাভ করে। সংগীতে অর্থ গৌরবের কোন স্থান নাই। সে কাব্য শুধু পাঠ করিলেই চলে—তাহাতে সুর আরোপিত না করিলেও হয়। আবৃত্তি—পাঠ ও সংগীতের মাঝামাঝি, আবৃত্তির মধ্যেও গীতিধর্ম্ম আছে। তাহাতে অর্থ গৌরবের অতিরিক্ত একটা মাধুর্য্যও পাওয়া যায়।

বৈষ্ণব কবিতা কবির চিত্ত হইতেই বাণী ও সুরের সম্মিলিত রূপ লইয়াই জন্মিয়াছে। ইহাতে সংগীতেরই প্রাধান্য। তাই ইহাতে ভক্তিভাবকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে একটা রসানুভূতি। এই রসানুভূতি তাহার নিজস্ব সুরেরই সৃষ্টি। বৈষ্ণব ভক্ত এই রসানুভূতিকেই ভাগবতী অনুভূতি বলিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের মনোবেগের মধ্যেই সংগীতের সুর আছে—তাই তাঁহার সমস্ত রচনাই হয় গীতিধর্ম্মী, গীতিকবিতার তো কথাই নাই!

কবি চেষ্টা করিয়া মনোবেগের সংগে সুরের মিশ্রণ ঘটাইতে পারেন—কবিতায় Emotional Sequenceএর সৃষ্টি করিতে পারেন—তাহাতে একটা Musical Sequenceএর মায়ার সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাহা নয়; তাঁহার মনের আবেগের পক্ষে সুর সহজাত; তাই যখনই তাহা অভিব্যক্তি লাভ করে তখনই সে তাহার সহজাত সুর লইয়াই জন্মে—তাই তাঁহার রচনায় বাণী ও সুর ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন—কলাবিদ্যা যেখানে একেশ্বরী সেখানেই তাহার পূর্ণ গৌরব। সে হিসাবে তাঁহার গানে কাব্যের প্রাধান্য সংগীতের পক্ষে গৌরবের হানিকর। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য এই—কবিতা ছাড়া সংগীত অথবা সংগীত ছাড়া

কবিতা রচনা তাঁহার দ্বারা সম্ভবই হয় নাই। অনেকে তাঁহার কাব্য-গীতিগুলি বাণীভারাক্রান্ত বলিয়া আবার অপছন্দও করেন। শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্র প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন—

"বাংলা গানে, বিশেষতঃ রৈবিক সংগীতে যেখানে কথায় অনেক কথা বল্‌বার আছে, সেখানে আভিধানিক শব্দের ব্যঞ্জনা সুরের ব্যঞ্জনাকে স্তব্ধ ক'রে, কথার চাপে সুরের বিস্তার আপনা আপনি ক্ষুব্ধ হয়ে আসে। × × × সুরের স্বাতন্ত্র্যবাদীরা বল্‌বেন, সুরের নিজস্ব 'কথা' আছে, কথার 'কথা' স্তব্ধ হলেও সেটা শোনা যায়, কথার কচ্‌কচিতে সেটা মারা যায়।" বহু গানে রাগিণী অন্তরংগের সংগীতকে অর্থাৎ ভাবকে সহায়তা করিয়াছে, সম্পূর্ণাঙ্গ করিয়াছে; অনেক ক্ষেত্রে অন্তরঙ্গের সংগীতকে ক্ষুণ্ণ করিয়া ফেলিবে—এই ভয়ে কবি বিজ্ঞানকে বর্জ্জনও করিয়াছেন। তবে কাব্যের অনেক ত্রুটিই সুরে ঢাকা পড়িয়াছে; বাণীর ত্রুটি যে চিরকালই সুরধ্বনি ঢাকিয়া দেয়—সুরধুনী ধারায় যাহাই আশ্রয় লয়, তাহাই সার্থকতা পায়, পবিত্রতা অর্জ্জন করে।

রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতের মূলসূত্রের ব্যাখ্যানে বলিয়াছেন—"সঙ্গীতের উদ্দেশ্যই ভাব প্রকাশ করা। যেমন কেবলমাত্র ছন্দ কানে মিষ্ট শুনাক তথাপি অনাবশ্যক, ভাবের সহিত ছন্দই কবিদের ও ভাবুকদের আলোচনায়, তেমনি কেবলমাত্র সুরসমষ্টি ভাব না থাকিলে জীবনহীন দেহমাত্র। সে দেহের গঠন সুন্দর হইতে পারে কিন্তু তাহাতে জীবন নাই। গায়করা সঙ্গীতকে যে আসন দেন, আমি সঙ্গীতকে তদপেক্ষা উচ্চ আসন দিই। তাঁহারা সঙ্গীতকে কতকগুলি চেতনাহীন জড়সুরের উপর স্থাপন করেন. আমি তাহাকে জীবন্ত অমর ভাবের উপর স্থাপন করি। তাঁহারা গানের কথার উপরে সুরকে দাঁড় করাইতে চান, আমি গানের কথাগুলিকে সুরের উপর দাঁড় করাইতে চাই। তাঁহারা

কথা বসাইয়া যান সুর বাহির করিবার জন্য, আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য।"

কবিতা এবং গান—দুইটি বিভিন্ন শিল্পকৌশল। কবিতার প্রধান উপজীব্য বাণী, সঙ্গীতের প্রধান উপজীব্য সুর; কিন্তু কবি বলিয়াছেন "বাণীর প্রতিই বাঙ্গালীর অন্তরের টান। কিন্তু একা বাণীর মধ্যেও মানুষের প্রকাশের পূর্ণতা হয় না, এই জন্যে বাংলাদেশে সঙ্গীতের স্বতন্ত্র পংক্তি নয়, বাণীর পাশেই তার আসন।" রবীন্দ্রনাথ কবিতায় সুর-সংযোজনা করিয়া দুই বিরোধী ভাব প্রকাশের বিচিত্র ভঙ্গিমাকে মিলিত করিয়াছেন। বিশুদ্ধ সঙ্গীতে কথার প্রয়োজন নাই, বিশুদ্ধ কাব্যেও সুরের প্রয়োজন নাই। সঙ্গীতে সুরকে কথার ভূষণে ভাবরূপ দেওয়া সম্ভব হইয়াছে, কাব্যে সুরের দ্বারা অধিকতর মর্ম্মস্পর্শী এবং আবেগময় করা হইয়াছে। "গান রচনা অর্থাৎ সঙ্গীতের সঙ্গে বাণীর মিলন সাধনই এখন আমার প্রধান সাধনা হয়ে উঠেছে।" কাব্যে বুদ্ধি ও যুক্তির ভাষার সঙ্গে মনোভাবের দ্বারা পূর্ণ অভিব্যক্তিকে রূপ দেওয়া হয়; গানের ক্ষুদ্রপরিসরে তাহা সম্ভব নয়; কিন্তু কবিতা যখন সুরের রূপ পাইল তখন একসঙ্গে উভয় কাজই সুসম্পন্ন হইল।

কবির কথায় "বিশুদ্ধ কাব্য এবং বিশুদ্ধ সঙ্গীত স্ব স্ব অধিকারের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু বিদ্যাদেবীগণের মহল পৃথক হইলেও তাঁহারা কখনো কখনো একত্র মিলিয়া থাকেন। তখন উভয়েই পরস্পরের জন্য আপনাকে কথঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করিয়া লন, কাব্য আপন বিচিত্র অলঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া নিরতিশয় স্বচ্ছতা ও সরলতা অবলম্বন করেন; সঙ্গীতও আপন তাল সুরে উদ্দাম লীলাভঙ্গকে সম্বরণ করিয়া সখ্যভাবে কাব্যের সাহচর্য্য করিতে থাকেন।" কবির গানে কাব্য ও সঙ্গীতের সেই সখ্য ঘটিয়াছে। অনেকস্থলে তাহার ফলে অসংযমও হইয়াছে।

গানের ছন্দোবিন্ধের ত্রুটি সম্বন্ধে কবি অবহিতও ছিলেন। তাঁহার কাব্যগ্রন্থাবলীর ভূমিকার বেশ সঙ্কোচের সঙ্গেই বলিয়াছেন—"কোন এক প্রবন্ধে আমার গানের সমালোচনায় এমন সকল গানকে আমার কবিত্বের পঙ্গুতার দৃষ্টান্ত স্বরূপে লেখক উদ্ধৃত করেছিলেন যেগুলি ছাপার বইয়ে প্রশ্রয় পেয়ে আমাকে অনেক দিন থেকে লজ্জা দিয়ে এসেছে। সেগুলি অপরিণত মনের প্রকাশ অপরিণত ভাষায়।" অর্থাৎ এ গানগুলি আবৃত্তি করিলেও রস পাওয়া যায় না।

রবীন্দ্রনাথের এই কাব্যগীতির দুইটি বিভাগ পরিকল্পনা করা যায়—একটি রবীন্দ্র রচিত ও সুরযোজিত তাঁহার প্রসিদ্ধ কবিতাগুলি, অপরটি রবীন্দ্রসুরযোজিত প্রচলিত কবিতা, বৈদিক মন্ত্র এবং পালি স্তবগাথাগুলি।

মন্ত্রগান—বেদমন্ত্রের এই ছয়টি সুর কবির প্রদত্ত—

(১) ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল ১৯১ সূক্ত—সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম (ইমন ভূপালী)।

(২) তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং (ইমন ভূপালী) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

(৩) শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ (মিশ্র ভৈরবী)।

(৪) উষাবাজেন বাজিনী প্রচেতা প্রচেতাঃ স্তোমং জুষস্ব গৃণতো মঘোনি (ভৈরবী)।

(৫) ঋগ্বেদ, ৭ম মণ্ডল ৮৯ সূক্ত; যদেমি প্রস্ফুরন্নিব দৃতির্ন ধ্মাতো অদ্রিবঃ মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়ঃ (ইমন ভূপালী)।

১৩৩৮ সালের ৯ই এবং ১০ই পৌষ ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবের গীতানুষ্ঠান ঐ বৈদিক মন্ত্রগানের দ্বারা উদ্বোধন করা হয়। সে সঙ্গে কবির কৃত অনুবাদ গানটিও গীত হয় (স্বরলিপি—আনন্দ সংগীত পত্রিকা)—

যদি ঝড়ের মেঘের মতো আমি ধাই চঞ্চল অন্তর।
তবে দয়া কোরো হে, দয়া কোরো হে, দয়া কোরো ঈশ্বর।
ওহে অপাপ পুরুষ, দীনহীন আমি এসেছি পাপের কূলে
প্রভু দয়া কোরো হে, দয়া কোরো হে, দয়া কোরে লও তুলে॥

(৬) ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল, ১২১ সূক্ত—য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবা (ইমন ভূপালী)।

কবি এই ধারায় তাঁহার গৃহের এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত বেদগানের পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার পিতা এবং ভ্রাতারা অনেকেই তাঁহার পূর্বেই বেদমন্ত্রকে গানে পরিণত করিয়াছিলেন। যেমন ইমন কল্যাণে, ধামারে রচিত—

শাশ্বতমভয়মশোকমদেহং পূর্ণমনাদি চরাচরগেহং।
চিন্তয় শান্তমতে পরমেশং স্বীকুরু তত্ত্ববিদামুপদেশম্॥

কবি বলিতেন "আমাদের বেদ মন্ত্রগানেও ঐরূপ। তার সঙ্গে একটা সরল সুর লাগিয়া থাকে মহারণ্যের মর্মরধ্বনির মত, মহাসমুদ্রের কলগর্জনের মত; তাহাতে কেবল এই আভাস দিতে থাকে যে এই কথাগুলি একদিন দুইদিনের নহে, ইহা অন্তহীন কালের। ইহা মানুষের ক্ষণিক সুখদুঃখের বাণী নহে, ইহা আত্মার নীরবতারই যেন আত্মগত নিবেদন।"

১৩৩৬ সালের ২৬শে শ্রাবণ শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত 'বর্ষামঙ্গলে' পর্জন্য সূক্তের পাঁচটি শ্লোকের সুররূপ আবৃত্তি করা হইয়াছিল। সূক্তিগুলি দিনেন্দ্রনাথের সহায়তায় সুর যোজিত হয়, সঙ্গে বাংলায় সুর সম্মত গদ্যানুবাদও প্রচারিত হয়। শেষ শ্লোকটি—

যস্য ব্রতে পৃথিবী নংনমীতি যস্য ব্রতে শফবজ্জর্ভুরীতি।
যস্য ব্রতে ওষধী বিশ্বরূপাঃ স নঃ পর্জন্য মহি শর্ম যচ্ছ!

"যাঁহার ব্রতে পৃথিবী সবার নীচে সংনত, যাঁহার ব্রতে পশুগণ

সর্ব্বদিকে বিচরণ করে, যাঁহার ব্রতে ওষধিগণ বিশ্বরূপ, সেই পর্জন্য আমাদের সকলকে মহৎ শর্ম দান করুন।"

এ ছাড়া গীতিনাট্যের সূচনায় অনেক মঙ্গলাচরণ পর্য্যায়ের সূক্তিও আছে।

রবীন্দ্রনাথ **বিহারীলালেরই** কবিশিষ্য। তাঁহার সারদামঙ্গলের ভাবালম্বনেই বাল্মীকিপ্রতিভার রচনা। তাঁহার রচিত "হৃদয়ে রাখ গো দেবী" গানটিতে কবি প্রথম বয়সে সুর যোজন করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্ (দেশ) এবং অক্ষয় বড়ালের 'বুঝতে নারি নারী কি চায়' (কাফি, খেমটা) এক সময়ে কবি সুর সংযোজন করেন।

সাধারণতঃ ১২টি লাইনের মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পূর্ণরূপ পায়। আমরা রবীন্দ্রসুরসংযোজিত কবিতা বলিতে ২টি Stanzaর অপেক্ষা বেশি কাব্যাংশকে গণ্য করিতেছি। এই প্রসঙ্গে কয়টি বিষয় লক্ষণীয়—

(১) এ সকল কাব্যাংশ সুরের তাগিদে রচিত হয় নাই, পরে সুর যোজিত হইয়াছে মাত্র। ইহাতে মনে হয় সুরের গুরুর অপেক্ষা কবিগুরুর পুঁজি অনেক পূর্ব্বেই সমাপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

(২) গানের ক্রম এইগুলিতে অনেক দীর্ঘ। কলির পুনরাবৃত্তির জন্য আরো বড় হইয়াছে। তাই এসব গানে কোনো একটিমাত্র রাগিণী ব্যবহৃত হয় নাই। একাধিক রাগিণীর মিশ্র সুর কবি এ ধারার গানে যোজনা করিয়াছেন। এমন কি কোন কোন গানে পৃথক পৃথক রাগিণীতে ভাগ করিয়া গাহিবার নির্দেশও আছে।

(৩) এখানে গানের সুরের জন্য কাব্যের ভাবের অথবা গতির ব্যাঘাত করা হয় নাই। কবিতা আবৃত্তিতে ক্লান্তি আসিবার কথা নয়, গানের সুর সেই আবৃত্তিরই অনুযায়ী করিয়া সাবলীল গতিতে রচিত হইয়াছে।

(৪) কবি এ সমস্ত গানে গীতিকৌশল সম্পূর্ণ বর্জন করিয়াছেন। রাগ-রাগিণীর বৈশিষ্ট্য, তান প্রভৃতির বিস্তার, রাগরীতির নির্দিষ্ট অনুশাসন

এসব গানে একেবারেই নাই। তাঁহার কাব্যগীতি স্বররসিকের ভালো লাগিবে না, এগানের শ্রোতা কেবলমাত্র তাঁহার রসমুগ্ধ কাব্য পাঠকরাই।

(৫) কবির এ শ্রেণীর গানের স্বর নয়, কথাই ভাবকে রূপ দান করিয়াছে। কবির উক্তি—"প্রথম বয়সে আমি হৃদয় ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি গানে, আশা করি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে। পরিণত বয়সের গান ভাব বাৎলাবার জন্যে নয়, রূপ দেবার জন্য। তৎসংশ্লিষ্ট কাব্যগুলিও অধিকাংশই রূপের বাহন।"

তাঁহার গানে তো রাগরাগিণীর স্বাতন্ত্র্য নাই, আছে বাণীর প্রাধান্য; এমন কি তাঁহার গানে স্বরের অংশ যথেষ্ট কম এ কথা সবিনয়ে স্বীকার করিয়াই স্বরের স্বাতন্ত্র্যবাদী দিলীপকুমারকে বলিয়াছেন "আমি যাকে গান বলি সে হবে সজীবমূর্ত্তি, যে যেমন খুসি তার হাত পা নাক চোখের বদল করতে থাকলে জীবনের ধর্ম্ম ও মূর্ত্তির মূল প্রকৃতিকেই নষ্ট করা হয়। সে হয় কেমন—যেমন, চাঁপাফুল পছন্দ নয় বলে তাকে নিয়ে স্থলপদ্ম গড়বার চেষ্টা। সে স্থলে উচিত, চাপার বাগান ত্যাগ করে স্থলপদ্মের বাগানে আসন পাতা। কারণ যে জিনিষ জীবধর্মী তাকে উপেক্ষা করলেও চলে কিন্তু উৎপীড়ন করলে অন্যায় হয়।"

কাব্য-গীতিতে স্বর, ছন্দ, ভঙ্গীকে অতিক্রম করিয়া অন্তঃস্থ ভাবই প্রাধান্য পাইয়াছে। রবীন্দ্রকাব্যধারার অনুসরণে এই পর্য্যায়ের কালানুক্রমিক স্বরের বিভাগ এইরূপ দাঁড়ায়—

কৈশোরক পর্য্যায়—(১) শুন নলিনী, খোলো গো আঁখি গানটি এই ধারার প্রথম গান। ভানুসিংহ ঠাকুরের অধিকাংশ গানকে এই ধারা হইতে বিচ্যুত করা যায়, কারণ, এইগুলির ছন্দোহিল্লোলই যেন গানের অঙ্গে উচ্ছসিত। একমাত্র (২) মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান (ভৈরবী) এই দিক হইতে সম্পূর্ণ কবিতা-গোষ্ঠীরই অন্তর্গত।

'ছবি ও গানে' এই ধারায় দুইটি স্বরসংযোজিত কবিতা আছে—

(১) আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে (মিশ্র খাম্বাজ) এবং (২) ওই জানলার কাছে।

'কড়ি ও কোমলে' এই ধারার ১০টি গান আছে। অধিকাংশ কবিতাই গীতিভাবাত্মক, কাজেই সুর-সংযোজনায় উৎকর্ষের অভাব ঘটে নাই। গানগুলি এই—(১) বাঁশরি বাজাতে চাহি, (সিন্ধু, একতালা) (২) কখন বসন্ত গেল, (৩) আমি নিশি নিশি কত, (৪) ওগো এত প্রেম আশা, (৫) আজি শরৎ তপনে, প্রভাত স্বপনে (বিভাস) (৬) ওগো কে যায় বাঁশরী বাজায়ে, (৭) এ শুধু অলস মায়া, এ শুধু মেঘের খেলা, (৮) আমায় বোলো না গাহিতে বোলোনা। (১০) কেন চেয়ে আছ গো মা মুখপানে।

'মানসী'র তিনটি কবিতা সুর সংযোজিত হইয়াছে—(১) কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া (মিশ্র রামকেলি), (২) আবার মোরে পাগল করে দিবে কে (কীর্তন) এবং (৩) এমন দিনে তারে বলা যায় (মিশ্র মল্লার) (বর্ষার দিনে)।

'সোনার তরী'র ৪টি বেশ বড় কবিতা সুরে রূপ পাইয়াছে। (১) তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও (২) খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে (কীর্তন) (৩) আমার পরাণ লয়ে কী খেলা খেলাবে এবং (৪) আজি যে রজনী যায় (ব্যর্থ যৌবন)। এইগুলি ছাড়া 'হৃদয় যমুনা' (যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ) কবিতার প্রথম এবং শেষ স্তবক লইয়া ভৈরবী, ঝাঁপতাল গান গঠিত হয়।

চিত্রার 'উর্বশী' কবিতার প্রথম স্তবক 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ,' এবং পঞ্চম স্তবক 'সুরসভাতলে যবে নৃত্য কর', মিশ্র কানাড়ায় শাপমোচন নৃত্যনাট্যে সুররূপ লাভ করে; তবে সুরটি সুপরিচিত নয়। তাহা ছাড়া 'কেন নিবে গেল বাতি' (গৌড় সারং) এবং 'একদা প্রাতে কুঞ্জতলে' (ভৈরবী) গানে পরিণত হয়।

চৈতালি কাব্যগ্রন্থের দুইটি কবিতাকে সুর-সংযুক্ত করা হইয়াছিল—আজি কোন ধন হ'তে বিশ্বে আমারে (মিশ্র কেদারা) এবং তুমি পড়িতেছ হেসে (কাফি)।

নৈবেদ্যের ভগবৎ-গীতিগুলির মধ্যে কবিতারূপে গণ্য করা যাইবে—
যারা কাছে আছে তা'রা কাছে থাক্। তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি। ঘাটে ব'সে আছি আনমনা যেতেছে চলিয়া সুসময়।

'কল্পনা'র "ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে" (বর্ষামঙ্গল) ১৩৩৪ সালে বর্ষামঙ্গল উৎসবে সুর-সংযোজিত হয়। ৭টি স্তবকের মধ্যে ৫টী গানে রূপ পাইয়াছে। এই গানটি রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীত, সুর মিশ্রকানাড়া, গানের স্তবকে স্তবকে ভাবানুসারে ছন্দের বৈচিত্র্য সঞ্চার করা হইয়াছে। সুরের ভিতর দিয়া প্রাচীন ভারতের অপরূপ বর্ষার মনোহর রূপ প্রকাশ পাইয়াছে।

'কল্পনা'র 'কিসের তরে অশ্রু ঝরে কিসের লাগি দীর্ঘশ্বাস' (একতালা; বিভাস) যে সুর-যোজিত হয়, তাহার উল্লেখ আছে কাব্যগ্রন্থাবলীতে। তবে এ সুর স্বরলিপি বন্ধনে আবদ্ধ নয়। 'এ কি সত্য সকলি সত্য, হে আমার চিরভক্ত' কবিতার সুর যোজনার তথ্যই কেবল নয়, স্বয়ং কবির স্বহস্তে লেখা স্বরলিপিও নাকি আবিষ্কৃত হইয়ছে! এবার চলিনু তবে (বিভাস; একতালা); ভাঙ্গা দেউলের দেবতা (পূরবী); 'সে আসি কহিল (কীর্ত্তন) প্রভৃতি কবিতাও সুররূপ লাভ করে। 'আজি উন্মাদ মধুনিশি ওগো চৈত্র নিশীথ শশী' বেহাগের সুরে অপূর্বতা লাভ করিয়াছে (কাওয়ালি)।

'উৎসর্গে'র প্রসিদ্ধ কবিতা "আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী" (ভৈরবী) বস্তুতঃ তিনটি গানের মালা। 'উৎসর্গের' অপর গানটি—"নব বৎসরে করিলাম পণ" (মিশ্র ঝিঁঝিট; একতালা) দেশপ্রেমের উদ্দীপক কবিতার সুররূপ।

'খেয়া' কাব্যের ছয়টি গান—"দিনের শেষে ঘুমের দেশে" গানটির কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। সেইটি ছাড়া (১) দুঃখমূর্ত্তি, (২) গোধূলিলগ্ন (ইমন পূরবী); (৩) ভার, (৪) মিলন (৫) খেয়া, সুরে রূপ লাভ করিয়াছে।

'বলাকা'র প্রসিদ্ধ "ছবি" কবিতার প্রথমাংশ হইতে নয় লাইন এবং শেষাংশ হইতে নয় লাইন লইয়া মিশ্রকানাড়া সুরে ১৩৩৮ সালে "তুমি কি কেবলি ছবি" গানটি গ্রথিত হয়। "বদল" কবিতাটিও অল্প পরিবর্ত্তিত হইয়া একটি গানে রূপ পাইয়াছ। 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতার প্রথম ও শেষের অল্প কয়টি লাইন সংযোগে— "হে নূতন, দেখা দিক আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ", গানটি রচিত। 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যে 'আনমনা' কবিতার প্রথম ও শেষাংশে কীর্ত্তনের সুর যোজিত হইয়াছে।

গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতাঞ্জলির সুর-সংযোজিত বড় কবিতার মধ্যে উল্লেখ করিতে হয়—(১) উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে, (২) জানি জানি কোন্ আদিকাল হতে, (৩) যাত্রী আমি ওরে, (৪) যেথায় থাকে সবার অধম (ভৈরবী), (৫) হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে জাগো রে ধীরে (প্রভাতী), (৬) ওগো শেফালীবনের মনের কামনা, (৭) ভেঙেছে দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ম্ময় তোমারি হউক জয় প্রভৃতি। গীতাঞ্জলি প্রভৃতি গানেরই চয়ণ, সুতরাং এগুলিকে গান-পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা অতি সহজ হইয়াছে।

'গীতপঞ্চাশিকা'র ৩টি দীর্ঘ কবিতার নাম উল্লেখযোগ্য—

(১) মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন কর মহোজ্জ্বল আজ হে (ভূপালী) (২) দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী। (৩) এই তো ভালো লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়।

'গীতবীথিকা'র দীর্ঘ গানের মধ্যে (১) অকারণে অকালে মোর

পড়লো যখন ডাক, (২) তোমায় কিছু দেবো বলে এবং (৩) যে আমি ঐ ভেসে চলে উল্লেখনীয়।

রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য সুরযোজিত কবিতার মধ্যে নাম করিতে হয়—(১) "নৃত্যের তালে তালে নটরাজ ঘুচাও সকল", (২) "যাবো, যাবো, যাবো তবে," (৩) "হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী," (৪) 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্য-নাট্যের "নারীর ললিত লোভন লীলায়" প্রভৃতি। ঋতুরঙ্গের "ওগো কিশোর, আজি তোমার দ্বারে পরাণ মম জাগে" রবীন্দ্রনাথের অন্যতম দীর্ঘ গান। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ সুর-বৈচিত্র্যের নিদর্শন এই গানটিতে পাওয়া যায়; ইহার ২৪টি দীর্ঘ লাইনে চারিটি বিভিন্ন রাগরাগিণী অবলম্বন করা হইয়াছে (তাল-তেওড়া এবং পিলু, ঈমন, খাম্বাজ এবং কানাড়ার মিশ্রসুর)। 'চিত্রাঙ্গদা' গীতিনাট্যের "এসো এসো বসন্ত ধরাতলে" ৪৫ লাইনের এই ধারার অন্যতম দীর্ঘ গান।

রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং সুপ্রসিদ্ধ কবিতায় সুর-সংযোজন হইয়াছে 'ক্ষণিকা' এবং 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থে। 'ক্ষণিকা'র ৭টি কবিতা সুর-সংযোজিত সেগুলি এই—।

(১) নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে (ঈমন কল্যাণ) আষাঢ়। (২) হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে (ঈমন কল্যাণ)—নববর্ষা। (৩) কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি (টপ্পা ভঙ্গিমার গান)—কৃষ্ণকলি (৪) ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে (ভৈরবী) মেঘমুক্ত! (৫) যাবই, আমি যাবই ওগো বাণিজ্যেতে যাবই, (খাম্বাজ)—বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। (৬) হে নিরুপমা, গানে যদি লাগে (মিশ্র) অবিনয়। (৭) আজ বরষার রূপ হেরি (ঈমন ভৈরবী)—বর্ষার রূপ।

'হে নিরুপমা' গানটি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গান; গানের চারিটি স্তবক চারিটি বিভিন্ন সুর ও ছন্দে গ্রথিত—প্রথম স্তবকের সুর মিশ্র-বসন্ত,

দ্বিতীয়টিতে মিশ্র রামকেলি, তৃতীয়টিতে সিন্ধু এবং চতুর্থটিতে দেশরাগিণী অবলম্বন করা হইয়াছে। 'মহুয়া'র ১০টি কবিতা স্বর-সংযোজিত—

(১) বিবশ দিন, বিরস কাজ—"বিজয়ী" (২) প্রাঙ্গণে মোর শিরিষ-শাখায় ফাগুনমাসে (ভৈরবী)—"প্রত্যাশা" (৩) আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায় (পিলু)—"সন্ধান" (৪) চপল তব নবীন আঁখি দুটি—"মুক্তি" (৫) অজানা জীবন বাহিনু (জানি তোমার অজানা নাহি গো)—"উদ্ঘাত" (৬) অজানা খনির নূতন মণির গেঁথেছি হার (পরজ বসন্ত)—"নিবেদন" (৭) আমরা দুজনা স্বর্গ খেলনা গড়িব না ধরণীতে (খাম্বাজ)—"নির্ভর" (৮) আরো কিছুখন না হয় বসিয়ো পাশে (মিশ্রদেশ)—"গুপ্তধন" (৯) বাহির পথে বিরাগী হিয়া কিসের খোঁজে গেলি (মিশ্র সারঙ্)—"অবশেষ" (১০) আজি এ নিরালা কুঞ্জে আমার অঙ্গমাঝে (কীর্ত্তন)—"বরণডালা"।

'শিশু' কাব্যগ্রন্থের "খেলা" কবিতাটি (তোমার কটিতটের ধটি কে দিল রাঙিয়া) ছেলেভুলানো ছড়ার আবেশের স্বরে রচিত। কবিতাটির শান্ত, সংযত মাতৃ-ভাবের প্রকাশ স্বরে অব্যাহত আছে। বৈষ্ণব কবিদিগের বাৎসল্যরসের পদাবলীর কথা বারবার গানের স্বরটি স্মরণে আনিয়া দেয়।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় স্বর-সংযোজনের এই প্রচেষ্টা দেখিয়া স্বতই মনে হয় যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাব্য-ভাণ্ডার শেষ বয়সে যদিও প্রায় শূন্য হইয়াছিল, স্বরগুরু রবীন্দ্রনাথ তখনও মুক্তহস্তে দান করিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার কথায়—

"বিশুদ্ধ সঙ্গীতের স্বরাজ তার আপন ক্ষেত্রেই, ভাষার সঙ্গে শরিকিয়ানা করবার তার জরুরি নেই। কিন্তু ছন্দে, শব্দবিন্যাসের ও ধ্বনিঝংকারের তির্য্যক্ ভঙ্গীতে যে সংগীত-রস প্রকাশ পায় অর্থের কাছে অগত্যা তার জবাবদিহি আছে।"

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ধারার সূত্রপাত হইয়াছিল গীতিনাট্যের রূপে সমাপ্তি হইয়াছে নৃত্য-নাট্যে। প্রথমজীবনে 'বাল্মীকি-প্রতিভা', 'কালমৃগয়া', 'মায়ার খেলা'য় রবীন্দ্র-সঙ্গীত অভিনয় সংযোগে প্রকাশ পাইয়াছিল, পরিণত-জীবনে নৃত্যের ভঙ্গীতে রূপ পাইল। প্রকৃত পক্ষে গীতিনাট্য এবং নৃত্যনাট্য তাঁহার একই রঙের বিভিন্ন শ্রেণী—একটিতে গানকে রূপ দিয়াছে অভিনয়, অপরটি নৃত্য অভিনয়কে দিয়াছে রূপ।

মানসকল্পনার যে চিত্রটি আর কোন ভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই, দেহভঙ্গী সেইটিকে প্রকাশ করিয়াছে। তাই একমাত্র নৃত্যের সাহায্যেই সেই বিশেষ রূপটি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। শেষজীবনে রবীন্দ্রনাথ নৃত্যচর্চ্চায় বিশেষ মন দিয়াছিলেন, শান্তিনিকেতনে সেই সময়ে নৃত্যের অনুশীলন সুরু হইয়াছিল; দেশবিদেশের বহু গুণী নৃত্যশিক্ষককে শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রণ করিয়া আনা হয়!

নৃত্যকে অধিকতর মনোগ্রাহী, সেই সঙ্গে নিয়মশৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছিল এই নৃত্যনাট্যগুলি। একজন নর্ত্তক অথবা একটিমাত্র নৃত্যকে প্রাধান্য না দিয়া একটি সমগ্র নৃত্যদৃশ্যের সহায়তায় একটি কাহিনী হইয়াছে এইগুলির বিষয়বস্তু। নৃত্যের মধ্য দিয়া অন্তরের সুখ-দুঃখ বিরহ-মিলনের যে রূপটি প্রকাশ করা যায়, তাহারই ভাবাদর্শে রচিত হয় রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যগুলি।

অভিজাতমহলে নৃত্যের প্রথম প্রচলন করেন রবীন্দ্রনাথই। উদয়শঙ্করের অভ্যুদয় ভারতীয় নৃত্যজগতে আগেই বিপ্লবের সূত্রপাত

করিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ এই হিসাবে নৃত্যবিষয়ে উদয়শঙ্করের অনুগামী। শান্তিনিকেতনে নৃত্যকেন্দ্র স্থাপন করিয়া নৃত্যকেও রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতের সমগোত্রে আনয়ন করিলেন এবং এই নৃত্যসূত্রে আকৃষ্ট তরুণ-তরুণীদল শান্তিনিকেতনকে কলাকেন্দ্রে পরিণত করিল। তাহার ফলে এই নৃত্য কলাচর্চ্চাই আধুনিক বাঙ্গালী যুবসমাজকে নারীভাবাপন্ন (Effeminate) করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন!

পাশ্চাত্য দেশে নৃত্য সংস্কৃতির একটি প্রধান বাহন, আমাদের দেশে নৃত্যকে সেই আসনে অন্ততঃ ভাবপ্রকাশের অন্যতম অবলম্বনরূপে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য; এইজন্য তিনি স্বয়ং নটরাজের অংশ গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্বগামী গীতিনাট্যগুলিতেও নৃত্যের অবকাশ আছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য জীবনে চিরকালই এই নটরাজের রূপ নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। নটরাজের নৃত্যসঙ্গী রূপে কবি নিজের পরিচয়ও দিয়াছেন—'নটরাজ, আমি তব কবিশিষ্য'।

তাই তাঁহার সকল গীতিনাট্যগুলিতেই অভিনয়াংশ নৃত্যের ভঙ্গীতে প্রকাশ করা চলে। নৃত্যাভিনয়ের ক্রমবিকাশ হইয়াছিল আমাদের প্রাকৃতজনের গ্রাম্যযাত্রা, কবিগান এবং তর্জ্জা হইতে। যাত্রার একটি প্রধান অংশ নৃত্য এবং নৃত্যভঙ্গীতে গান; অভিনয়ের সঙ্গে সাধারণ দর্শকদিগের মনোরঞ্জনের জন্য নৃত্যাঙ্গ যাত্রায় প্রচলিত ছিল।

মণিপুরের বৈষ্ণবসমাজে এবং দক্ষিণাপথের বহু অংশে গান এবং অভিনয় নৃত্যের সহযোগেই প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথের অনুসৃত এ শ্রেণীর নৃত্যনাট্য অবশ্য যবদ্বীপে বহুদিন হইতেই প্রচলিত ছিল এবং পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপ হইতেই কবি তাঁহার নৃত্যনাট্য রচনার প্রেরণা পাইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—

"আমাদের দেশে এবং য়ুরোপে গীতাভিনয় আছে, এদের দেশে নৃত্যাভিনয়। এদের সঙ্গীতই তাল, এদের নৃত্যই গান।

এদেশে উৎসবের প্রধান অঙ্গ নাচ। এখানকার নারিকেল বন যেমন সমুদ্র হাওয়ায় দুলছে তেমনি সমস্ত দেশের মেয়ে পুরুষ নাচের হাওয়ায় আন্দোলিত।……এখানকার যাত্রা অভিনয় দেখেছি, তার প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত চলায় ফেরায়, যুদ্ধে বিগ্রহে, ভালোবাসার প্রকাশে এমন কি ভাঁড়ামিতে সমস্তটা নাচ; সেই নাচের ভাষা যারা ঠিকমতো জানে তারা বোধ হয় গল্পের ধারাটা ঠিকমতো অনুসরণ করতে পারে।…… এর থেকে বোঝা যায়, কেবল ভাবের আবেগ নয়, ঘটনাবর্ণনাকেও এরা নাচের আকারে গড়ে তোলে।……এরা প্রধানতঃ নাচের ভিতর দিয়েই সমস্ত হৃদয়ভাব ব্যক্ত করতে চায়, সুতরাং বিদ্রূপের মধ্যেও এরা ছন্দ রাখ্‌তে বাধ্য। এরা বিদ্রূপকে বিরূপ করতে পারে না—এদের রাক্ষসেরাও নাচে।"

ইউরোপীয় নৃত্যের পারস্পরিক সামঞ্জস্যের সূত্রটি রবীন্দ্রনাথ বিদেশভ্রমণ করিতে যাইয়া লক্ষ্য করিয়াছিলেন। নাট্য এই বিভিন্ন নৃত্যের মধ্যকার পারস্পরিক সূত্র। বিলাতে Dance Performance এ প্রধান সহযোগী তাহার অর্কেষ্ট্রা। একটি নাচের সঙ্গে অপর নাচের সুরটিকে বজায় রাখিবার দায়িত্ব এই যন্ত্র-সঙ্গীতের, রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যে সেই ভার গ্রহণ করিয়াছে অভিনয়। জার্ম্মাণীর ব্যাভেরিয়া প্রদেশে এবং চেকোশ্লোভাকিয়ায় কোন একটি ঘটনাকে রূপ দিবার জন্য নাচের সঙ্গে গল্পের ব্যবস্থা আছে। এইরূপ আখ্যানাংশ বা বিষয়বস্তু অপেক্ষা অভিনয় নিশ্চয় অধিকতর মর্ম্মস্পর্শী।

তবে নৃত্যনাট্যের গানগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য প্রকটিত হইয়াছে যন্ত্র-সঙ্গীতের পূর্ণ সহযোগিতায়। কবি আমাদের বাংলাগানের এই যন্ত্র সঙ্গীতের দৈন্যের কথা বহু সময়ে উল্লেখ করিয়াছেন—"সঙ্গীতের স্বাতন্ত্র্য যন্ত্রে সব চেয়ে প্রকাশ পায়। বাংলার আপন কোন যন্ত্র নেই এবং প্রাচীন কালেই হোক আর আধুনিক কালেই হোক, যন্ত্রে যাঁরা ওস্তাদ

তাঁরা বাংলার নন্। বীণ, রবাব, শরদ, সেতার, এস্রাজ, সারেঙ্গি প্রভৃতির তুলনায় আমাদের রাখালের বাঁশী বা বৈরাগীর একতারা কিছুই নয়।"

যন্ত্র সঙ্গীতের প্রাধান্য কবি তাঁহার কাব্য-সঙ্গীতে বিশেষ না দিলেও এ শ্রেণীর নাট্যগীতিতে অনেক স্থলেই দিয়াছেন। "বাংলার বৈশিষ্ট্য যে অবিমিশ্র সঙ্গীতে নয় তার একটা প্রমাণ যন্ত্র সঙ্গীতের ক্ষেত্রে মেলে। সঙ্গীতের বিশুদ্ধতম রূপ কিসে? না যন্ত্র সঙ্গীতে। বাংলাদেশ কখনও হিন্দুস্থানীদের মত যন্ত্রীর জন্ম দিয়েছে কি?"

নৃত্যনাট্যের বিষয়বস্তুরূপে কবি আদর্শমূলক নাটকীয় ঘটনাকেই গ্রহণ করিয়াছেন। প্রেমের দেহজ প্রতিপত্তির পরিণাম, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, সত্যের ও ধর্ম্মের জন্য প্রেমের আত্মবিসর্জ্জন প্রভৃতি এক একটি বিশিষ্ট সমাজচেতনাকে নৃত্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

টেকনিকের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, কোন একপ্রকারের নৃত্যভঙ্গীকে তিনি অনুসরণ করেন নাই। কোথাও তাঁহার নৃত্যের আদর্শ সম্পূর্ণ শাস্ত্রীয় ভারতীয় নৃত্য, কোথাও পাশ্চাত্য নৃত্যের অনুকরণ, কোথাও তিনি প্রচলিত লৌকিক নৃত্যপদ্ধতিও অনুসরণ করিয়াছেন, সেই সঙ্গে তাঁহার নব-প্রবর্ত্তিত নিজস্ব নৃত্যভঙ্গীকেও গ্রথিত করিয়াছেন।

প্রথম যুগের গীতিনাট্য এবং শেষযুগের নৃত্যনাট্যের মধ্যবর্ত্তী সময়ে তিনি রচনা করিয়াছিলেন ঋতুনাট্যগুলি; ফাল্গুনীর 'অন্ধবাউল' প্রথম নৃত্যবহুল চরিত্র; কবি নিজেই তাহার অভিনয় করিতেন। তাহার পর 'নটীর পূজা'। নটীর নৃত্যই গীতিনাট্যটির প্রধান উপজীব্য, অভিনয়কে রূপায়িত করিবার জন্য নৃত্যই সেই প্রথম প্রাধান্য পাইল। নটীর শেষ গানটি "নৃত্যরসে চিত্ত মম উছল হয়ে বাজে, আমায় ক্ষম হে ক্ষম" সম্পূর্ণ নৃত্যের আদর্শে রচিত নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পিমানস জীবনের প্রতি স্তরেই আত্মপ্রকাশ করিতে

চাহিয়াছিল, প্রথমে কাব্যের ধারায়, দীর্ঘ সাধনায় তাহার কাজ শেষ হইয়া গেলে কবি মানস আসিল সুরের ধারায়, কিন্তু তাহাতেও বৈচিত্র্যের অবসান হইল না, কবিমনের পরিতৃপ্তি ঘটিল না; তাই সর্বশেষে তাহা অবলম্বন করিল নৃত্যকে—নৃত্য এবং সঙ্গীত উভয়ের সংযোগে সৃষ্টি হইল সম্পূর্ণ—জন্ম হইল নৃত্যনাট্যের। যে ভাববৈচিত্র্যের আর কোন প্রকারে রূপ পাইবার উপায় ছিল না, সেই ভাববৈচিত্র্য রূপ গ্রহণ করিল পায়ের ছন্দে, দেহের ভঙ্গীতে; সেই ছন্দোময় দেহভঙ্গীই রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলির সুরসৃষ্টিরও প্রেরণা দিয়াছে।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে বিলাতে যাইয়া রবীন্দ্রনাথ সে দেশের Ballet নৃত্যভঙ্গী সাগ্রহে অনুধাবন করিয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে পুত্রবধূ শ্রীমতী প্রতিমা দেবী বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন।

তবে একটি কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে, কবি নিজে নাচিতে জানিতেন না এবং নৃত্য সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা যে খুব স্পষ্ট ছিল তাহাও মনে হয় না! এ সকল নৃত্যনাট্যের নৃত্যপরিকল্পনা ছিল ভিন্ন জনের, একমাত্র সুর ছাড়া কবির নিজস্ব কৃতিত্ব এসব নাটকে বিশেষ কিছুই নাই। অভিনয়াংশ অতি দুর্বল, তবে গীতিসূত্রে যে নাট্যরস ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে বেশ বৈচিত্র্য আছে।

গীতিনাট্য এবং পালাগানগুলির মতো কবির এগুলিও তাঁহার সাময়িক গীতিচয়নিকা মাত্র। সুর ছাড়া এগুলির স্বতন্ত্র মূল্য সামান্যই।

শাপমোচন :—"যে বৌদ্ধ আখ্যান অবলম্বন করে রাজা নাটক রচিত তারই আভাসে শাপমোচন কথিকাটি রচনা করা হল। এর গানগুলি পূর্বরচিত নানা গীতিনাটিকা হতে সংকলিত।" (ভূমিকা)

'শাপমোচন' ঠিক নৃত্যনাট্য নয়। কারণ, কাহিনীটি নাট্যাকারে গ্রথিত হয় নাই; নাচ এবং গানগুলি অনেকটা অবান্তর এলোমেলোভাবে সাজানো আছে। তবে শাপমোচনই পরবর্ত্তী নৃত্যনাট্যগুলির পূর্ব্ববর্ত্তী

ভূমিকা। 'শাপমোচনে'র কাহিনীটি অভিনয়ে নয়, আবৃত্তি ও গানের সাহায্যেই রূপায়িত হইয়াছে; শাপমোচনের নাচগুলি বেশীর ভাগ মণিপুরী পদ্ধতিতে পরিকল্পিত, কথাকলি এবং ব্যালট নাচের কিছু কিছু অংশ আছে।

নৃত্যনাট্য **চিত্রাঙ্গদা :** (১৩৪৩) রূপ এবং অরূপ বা রূপাতীত সত্তার দ্বন্দ্ব নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদার বিষয়বস্তু। এই নৃত্যনাট্যে শুদ্ধ আবৃত্তিও রহিয়াছে; প্রথম প্রস্তাবনা এবং সর্ব্বশেষে তিনটি সংস্কৃত মন্ত্র এবং তাহার অনুবাদ এবং মধ্যে মধ্যে কাব্যে কথোপকথন আবৃত্তির যোগ্য; বাকি সমগ্র নাটিকাটি গান এবং নাচের ছন্দে রূপ পায়।

চিত্রাঙ্গদার নৃত্যগুলি প্রায় সবই মণিপুরী পদ্ধতিতে পরিকল্পিত হইয়াছিল, অল্প কিছু কথাকলি এবং গুজরাটী লোকনৃত্যও সংযোজিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া অনেক অংশে বোলের নাচ বা বাদ্যযন্ত্রের ছন্দ সন্নিবেশ করা আছে।

যেন মণিপুরী নৃত্যপদ্ধতির অনুশীলন করিবার জন্যই মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে নাটকে গ্রহণ করা হইয়াছে! 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর নৃত্য—একক নৃত্য এবং সমবেত নৃত্য; গানও সেভাবেই গ্রথিত। সুরের সঙ্গে নৃত্যের যে আঙ্গিক সম্বন্ধ তাহার প্রাধান্য দিবার প্রয়োজনে 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যে অনেকস্থলে নাটকীয় রসের হানি হইয়াছে, এমন কি সন্দেহ হয় নৃত্যের অনুকূল দৃশ্যগঠনের তাগিদে রবীন্দ্রনাথ সুরেরও অঙ্গহানি করিয়াছেন!

দেহভঙ্গী ব্যতীত ভাবপ্রকাশের আর একটি বিচিত্র পন্থা আছে—সেটি রূপ পায় চোখে মুখের ভঙ্গীতে, অঙ্গুলির সঞ্চালনে—এই 'মুদ্রা' 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা'য় সুন্দর ভাবে অঙ্গীভূত হইয়াছে। মনের ভাষা যে ভ্রূ'র কুঞ্চনে, চোখের দৃষ্টিসঙ্কেতে, মুখের ভাবে কতটা প্রকাশ পায়,—নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদায় তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। এই

ভাও-বাৎলানো বা সঙ্কেত সহযোগে মনোভাব প্রকাশ ভারতীয় নৃত্যপদ্ধতির একটি বিশিষ্ট ভঙ্গী।

নাটকে প্রধান চরিত্র তিনটি—অর্জ্জুন, চিত্রাঙ্গদা এবং মদন; সেই সঙ্গে সমবেত নৃত্যের জন্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে অর্জ্জুনের বন্য পরিচরগণ, গ্রামবাসিগণ এবং সখীগণ। বন্য-অনুচরগণের এবং গ্রামবাসিগণের এবং "ওরে ঝড় নেমে আয়" নাচগুলিতে গ্রাম্য রাইবেঁশে নাচের আভাস পাওয়া যায়।

চিত্রাঙ্গদার স্বতন্ত্র গান ২০টি, অবশিষ্ট সঙ্গীতাংশও কথোপকথন এবং সচেষ্টতার (Action) মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত; সেগুলি ঐ গানগুলির গ্রন্থিকরূপে এবং সেই সঙ্গে নাটকীয় রূপপ্রকাশে অঙ্গীকৃত হইয়াছে। নৃত্যনাট্যের অভিনয় বা Actionই নৃত্য ব্যক্ত করে, গানগুলি এই Actionএ রসের যোগান দেয়।

নৃত্যনাট্য **শ্যামা :** (১৩৪৬) প্রেমের জন্য অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ 'শ্যামা'র বিষয়বস্তু, কবি তাঁহার পূর্ব্বতন 'পরিশোধ' কবিতাকেই 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে রূপায়িত করেন। ইহার টেক্‌নিক 'চিত্রাঙ্গদা'রই অনুরূপ।

"কথা ও কাহিনীতে প্রকাশিত পরিশোধ নামক পদ্য কাহিনীটিকে নৃত্যাভিনয় উপলক্ষে নাট্যীকৃত করা হয়েছে। প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত এর সমস্তই সুরে বসানো। বলা বাহুল্য, ছাপার অক্ষরে সুরের সঙ্গ দেওয়া অসম্ভব বলে কথাগুলির শ্রীহীন বৈধব্য অপরিহার্য্য।" (ভূমিকা)

কাহিনীটি একটু অতরল ঢঙের, কাজেই গানের সুরে যথাসম্ভব উচ্ছলতা রোধ করা হইয়াছে। গান যে গুরুত্ব আনিতে পারে নাই, নাচে তাহার ক্ষতিপূরণ সম্পাদিত হইয়াছে। 'শ্যামায়' তিনটি বিভিন্ন নৃত্যপদ্ধতির অপূর্ব্ব সমাবেশ হইয়াছে; মণিপুরী পদ্ধতি, কথাকলি এবং কথক নৃত্যপদ্ধতি—এই তিনটি ধারা 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যকে রূপায়িত করিয়াছে। করুণা (উত্তীয়), গাম্ভীর্য্য

(শ্যামা) এবং সৌন্দর্য্যানুভূতি (বজ্রসেন)—তিনটি ভিন্ন রসকে রূপ দিবার জন্য তিনটি বিভিন্ন পদ্ধতির অনুসীবন করা হইয়াছে।

'শ্যামা'র প্রধান তিনটি চরিত্র ব্যতীত গৌণ আরও কয়টি চরিত্র আছে—বন্ধু, কোটাল, প্রহরী প্রভৃতি। 'শ্যামা'র চারিটি দৃশ্য, স্বতন্ত্র গান ১২টি; প্রত্যেকটি গানেই করুণরসের আবেদন সুপ্রকটিত। নৃত্যনাট্যের মধ্যে যে চরম নাটকীয় পরিণতি (Dramatic Action) সম্ভব, 'শ্যামা'য় তাহার সুন্দর নিদর্শন আছে—তাহার মধ্যে একটি দ্বিতীয় দৃশ্যে বজ্রসেনের পশ্চাদ্ধাবন এবং উত্তীয়ের হত্যা, এবং চতুর্থ দৃশ্যে বজ্রসেনের শ্যামাকে আঘাত—'শ্যামার' করুণরসের মধ্যে এগুলি যেন বীররসের অবতারণা। শেষ দৃশ্যে বজ্রসেনের বিদায় গ্রহণে করুণরসের চরম অভিব্যক্তি লাভ হইয়াছে।

নৃত্যনাট্য **চণ্ডালিকা:** স্বামী বিবেকানন্দ এবং মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের আন্দোলনই এই নৃত্যনাট্যের অনুপ্রেরণা দান করিয়াছে। নেপালী বৌদ্ধসাহিত্যের একটি গল্প ইহার আখ্যানাংশ। অপর নৃত্যনাট্যগুলি অপেক্ষা ইহা গীতাংশে যথেষ্ট দুর্ব্বল। 'চণ্ডালিকা'র নৃত্যগুলি মণিপুরী, কথাকলি পদ্ধতির সমাবেশে রচিত। গীতি চয়নিকা রূপে এখানি বিশেষ সুখ্যাতি পাইবার যোগ্য হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের নৃতনাট্যগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, সাধারণ নাটকের ন্যায় পাত্রপাত্রীগণের কথোপকথনের দ্বারা ভাবপ্রকাশ না করিয়া দেহভঙ্গীর কৌশলে তাহার প্রকাশ করা হইয়াছে; অন্যান্য বিষয়ে নৃত্যনাট্যগুলি গীতিনাট্যেরই আঙ্গিকের হুবহু অনুরূপ।

গীতিনাট্যের ন্যায় এইগুলিতে অবশ্য কাব্যাঙ্গের গান নাই, তাহার পরিবর্ত্তে আছে নাট্যরসের অভিব্যক্তি। প্রাচীন বাংলার কথকতার পদ্ধতি এইগুলিতে অনুসৃত হইয়াছে; কথকঠাকুরের সকল পাঠই সুরসংযোগে আবৃত্ত হইত, নৃত্যনাট্যের অভিনয় নৃত্যসংযোগে উদ্গীত

হয়। গীতিনাট্যগুলিতে ভাবপ্রকাশের প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছে যেমন সুর, এগুলির প্রধান অংশ গ্রহণ করা উচিত ছিল তেমনি নৃত্যের, কিন্তু সুরই নৃত্যনাট্যেও মূল উপজীব্য হইয়া উঠিয়াছে। সুর ব্যতীত কাব্যাংশে হীনতর গানগুলির সাহিত্যিক মূল্য নাই, কিন্তু নৃত্য ব্যতীত গানগুলির সুর অপূর্ব্বই রহিয়াছে। কাজেই ভবিষ্যতে নৃত্যনাট্য কয়টির নৃত্যাংশ বিস্মৃত হইয়া গেলেও কেবল গানের রূপেই ইহাদের মূল্য রবীন্দ্র-গীতসঞ্চয়নে অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

অমিত্রাক্ষরী নৃত্যনাট্যগুলির সুরপ্রধান গানের আবৃত্তি সুসঙ্গত নয়। কারণ, রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য গানের ন্যায় এইগুলিকে বাণীপ্রধান বলা সম্ভব নয়; এমন কি এইগুলির কাব্যাংশও সুষ্ঠু নয়।

শুধু তাই নয়, অনেক জায়গায় এমন গান আছে যাহাতে কাব্য ভাবের সম্পূর্ণ অভাব। দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতা অনেক গানের উপাদান হইয়াছে, তাহাতে নাটকীয়তার সৃষ্টি হইলেও কাব্যাদর্শের মর্য্যাদা রাখা হয় নাই। যেমন—

সে দিন বাজল দুপুরের ঘণ্টা, ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ্দুর,
স্নান করাইতেছিলেম কুয়োতলায় মা-মড়া বাছুরটিকে।

নৃত্যনাট্যগুলি সম্পূর্ণই সুরে বাঁধা হইলেও এইগুলিতে দুইটি পৃথক অংশ লক্ষিত হয়—একটি যথার্থ গান, কবিতার ভাষায় গাঁথা, অপরটি সুরে কথোপকথন, কথোপকথন অংশগুলি গদ্যেই রচিত। যেমন—'চিত্রাঙ্গদা'য় চতুর্থ দৃশ্যে চিত্রাঙ্গদা ও অর্জ্জুনের বাক্যবিনিময়, অথবা 'শ্যামা'য় বজ্রসেন, কোটাল এবং শ্যামার পরিচয়প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ সাধারণ নাটকীয় ভঙ্গীর আলাপ; এই ধারার পূর্ণাঙ্গতা লক্ষিত হয় 'চণ্ডালিকা'য়, সেখানে বহু গানের অংশ গদ্যে রচিত এবং বহু গানে কাব্যসুলভ মিল ও অনুপ্রাসকে একেবারে এড়ানো হইয়াছে; যেমন—

আমি ভয় করিনে মা, ভয় করিনে।
ভয় করি মা, পাছে সাহস যায় নেমে।
পাছে নিজের আমি মূল্য ভুলি।
এত বড়ো স্পর্দ্ধা আমার, একি আশ্চর্য্য!
এই আশ্চর্য্য সেই ঘটিয়েছে,
তারো বেশি ঘটবে না কি,
আসবে না আমার পাশে
বসবে না আধো আঁচলে?

নৃত্যনাট্যগুলির আগাগোড়াই এই রকম মুক্তবন্ধ ছন্দ বা Free Verseএ রচিত। লিপিকায় গদ্য কথিকাগুলিকেও তাঁহার সুরদানের ইচ্ছা ছিল "কথনো কখনো গদ্য রচনায় সুরসংযোগ করবার ইচ্ছা হয়। লিপিকা কি গানে গাওয়া যায় না ভাবছ?" লিপিকায় সুর না দিলেও গদ্য এবং মিলহীন কাব্যাংশে কবি অনেক গানই রচনা করিয়াছেন যেমন—ধূসর জীবনের গোধূলিতে। মন মোর মেঘের সঙ্গী। আজি কোন সুরে বাঁধিব দিন অবসানে। শ্রাবণের পবনে আকুল বিষণ্ণ সন্ধ্যায়। ওগো স্বপ্নস্বরূপিণী প্রভৃতি উল্লেখনীয়; তবে এ সব গানের ভাব কবিত্বরসঘন।

চিত্রাঙ্গদার তৃতীয় দৃশ্যের প্রারম্ভে গান গদ্যছন্দে। যেমন—

একি দেখি! এ কে এল মোর দেহে পূর্ব্ব ইতিহাস হারা!
আমি কোন গত জনমের স্বপ্ন বিশ্বের অপরিচিত আমি
আমি নহি রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা।
আমি শুধু এক রাত্রে ফোটা অরণ্যের পিতৃমাতৃহীন ফুল।
এক প্রভাতের শুধু পরমায়ু তারপরে ধূলিশয্যা, তারপরে ধরণীর চির অবহেলা—এইভাবে লিখিলেই যেন উচিত মনে হয়।

নৃত্যনাট্যের গানে অপর একটি বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্র সংগীতে বৈদিক

এবং বৌদ্ধ মন্ত্রের সংযোজন। এইগুলির মধ্যে নটীর পূজার কয়েকটি বৌদ্ধ পালি মন্ত্রের 'চণ্ডালিকা'য় পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে।

'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যে বৌদ্ধ পালি মন্ত্র আছে তিনটি—

(১) যো সন্নিসিন্নো বরবোধিমূলে (ইমন ভূপালী)।

(২) নমো নমো বুদ্ধ দিবাকরায় (বেহাগ) এবং

(৩) বুদ্ধো সুসুদ্ধো করুণা মহান্নবো (মিশ্র রামকেলি)।

'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যে একটি মন্ত্রগানও আছে; গানটির ভঙ্গী আহিতুণ্ডিক বা বেদিয়াদের গানের অনুকরণ—

"জাগেনি এখনো জাগেনি রসাতলবাসিনী নাগিনী।"

'চণ্ডালিকা'র দ্বিতীয় দৃশ্যের প্রারম্ভে একটি পালিগাথার বঙ্গানুবাদের আবৃত্তিও মন্ত্রোচ্চারণের ভঙ্গীতে সম্পাদ্য—

স্বর্ণবর্ণে সমুজ্জ্বল নব চম্পাদলে
বন্দিব শ্রীমুনীন্দ্রের পাদপদ্মতলে।
পুণ্যগন্ধে পূর্ণ বায়ু হোলো সুগন্ধিত;
পুষ্পমাল্যে করি তাঁর চরণ বন্দিত॥

'নটীর পূজায়' শ্রীমতীর প্রথম বুদ্ধবন্দনাটি ভৈরবী রাগিণীতে গেয় —"ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে নমো ধর্ম্মায় তারণে॥" দ্বিতীয় অঙ্কের "নমো নমো বুদ্ধো দিবাকরায়" বেহাগে এবং "নত্থি মে সরণং বরং" মিশ্ররামকেলিতে এবং তৃতীয় অঙ্কের 'উত্তমঙ্গেব বন্দেহং পাদপং সুবরুত্তমং' কাফি রাগিণীতে গেয়। 'চিত্রাঙ্গদার' শেষে তিনটি সংস্কৃত মন্ত্র এবং তাহার বাংলা অনুবাদ আছে; এইগুলি মঙ্গলাচরণ সূক্তির আবৃত্তি,— গীতাভিনয়ের মধুরেণ পরিসমাপ্তি—

(১) মা মিং কিল ত্বং বনাঃ শাখাং মধুমতীমিং।

(২) যথেমে দ্যাবা পৃথিবী সদ্যঃ পর্য্যেতি সূর্য্যঃ।

(৩) অক্ষ্যৌ নৌ মধুসংকাশে অনীকং নৌ সমঞ্জনম্।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের রস

সঙ্গীত কথা, সুর ও ছন্দের সম্মিলনেই উৎপন্ন, তাহার সার্থকতা গায়কের গাহিবার এবং বিশেষ করিয়া শ্রোতার শুনিবার অধিকারের উপরই নির্ভর করিতেছে। ওস্তাদী গান অর্থাৎ যেখানে সুরেরই আধিপত্য, সেই গানের শ্রোতার সংখ্যা অল্প। ধ্রুপদ খেয়াল-ঠুংরি প্রভৃতি গান শুনিবার রসজ্ঞ এবং গাহিবার শিল্পী উভয়ই বিরল। এই সব গানের রস উপভোগের জন্য গাহিবার মতই সাধনার প্রয়োজন।

লোকসঙ্গীত অর্থাৎ কীর্ত্তন-বাউল শ্রেণীর গান শুনিবার অধিকার গ্রামাঞ্চলে সাধারণতঃ সকলেরই অল্পবিস্তর আছে। এ সব গানে বিশেষজ্ঞের উপভোগ্য এমন কোন সুরবৈচিত্র্য নাই। কীর্ত্তনের মহাজন পদাবলীর সুর অবশ্য উচ্চাঙ্গেরই ছিল, তাহাও গায়কেরা বিশেষ এক ঢঙে তরল করিয়া লইয়াছেন।

কবিতার চেয়ে এক হিসাবে সঙ্গীত সমৃদ্ধ। কারণ, কবিতায় সুরটা অন্তর্নিহিত নাও থাকিতে পারে। কাব্যের জন্য চাই রচয়িতা ও পাঠক; সঙ্গীতের জন্য চাই রচয়িতা, গায়ক এবং শ্রোতা। রচয়িতা এবং গায়ক যদি এক ব্যক্তিই হ'ন, তবে তো কবির কথায় 'রসের গঙ্গা-যমুনা সংগম'।

কিন্তু 'আধুনিক বাংলা গান' নামধেয় কাব্য-সঙ্গীতের রস ওস্তাদ বা সমজদার কাহারও উপর বিশেষ নির্ভর করে না; বোধহয় পরিবেশের অর্থাৎ বিশিষ্ট সংস্কৃতির চাহিদার উপরই ইহার সম্পূর্ণ প্রভাব। বাংলা দেশের এই আধুনিক গান আমাদের সাঙ্গীতিক প্রগতির গতি রুদ্ধই করিতেছে! এই আধুনিক গান গড়িয়া উঠিয়াছে শোরীমিঞার টপ্পা ভঙ্গিমাকে আশ্রয় করিয়া। নিধুবাবু এবং শ্রীধর কথকের হাতেই

প্রথম হয় কাব্যগীতির সৃষ্টি। কাব্যসঙ্গীতেও রস রহিয়াছে, তবে ইহা একটি বিশেষ ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত।

রবীন্দ্রনাথের গানের সেই বিশেষ রসটি তাঁহার গীতিকাব্যের মাধ্যমেই প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার নিজস্ব আবেগানুভূতিই সৃষ্টি করিয়াছে 'গীতিরস'কে। অবশ্য তাঁহার কাব্যকলার অতিরিক্ত প্রভাব যেমন তাঁহার সঙ্গীতে, আমাদের মনও তেমনি পূর্ব হইতেই তৈরী ছিল। আসল সঙ্গীতে রাগরাগিণীর শাস্ত্রসম্মত রসরূপ যাহাই পরিকল্পিত হোক, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবিমনের আবেগের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া তাহার অভিনব রূপ দিয়াছেন।

অনুভূতির প্রকাশ অর্থাৎ Sentimentএর সঞ্চার বাংলাকাব্য-গীতির বৈশিষ্ট্য। হিন্দুস্থানী গানে যাহাকে 'দরদ' বলে এই অনুভূতি অনেকটা সেই শ্রেণীর। সঙ্গীতের নিজস্ব 'রস' ভাষা হইতে নির্গত হয় না, রাগরাগিণীর লীলা হইতেই উদ্গত হয়। গায়কের ও শ্রোতার উভয়ের মনই গীতিরসে অভিষিক্ত হইয়া উঠে।

মনোভাবের বহিরঙ্গের আত্মপ্রকাশকে 'বৃত্তি' বলা হয়। সঙ্গীত কলায়ও কতকগুলি বৃত্তি নির্দিষ্ট আছে—'কাব্যং গীতং তথা নৃত্তং বৃত্তিহীনং ন শোভতে'। ললিতগীতের রসসঞ্চারের উপযোগী 'কৈশিকী বৃত্তি' শান্ত ও মধুর রসের প্রকাশ করে।

শ্রীঅমিয়নাথ সান্ন্যাল বলিয়াছেন—

"বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও পদাবলী সমূহের প্রভাব সাধারণ ব্যক্তির বৃত্তিকে এরূপ আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, গায়কের কৈশিকী বৃত্তি অবলম্বন করাই যেন স্বাভাবিক বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের গানগুলি আদ্যোপান্ত কৈশিকীতে নিয়োজিত। বাক্য এবং অঙ্গাভরণের সুকুমারতা, গীতনৃত্ত বিষয়ে উল্লাস ও শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য, এই তিনের সমাবেশ কৈশিকী বৃত্তি।"

এই বৃত্তির উপযোগিতায় সঙ্গীতের ব্যবহারিক দোষগুণ পরিলক্ষিত হয়।

পণ্ডিতপ্রবর Armstrong সঙ্গীতের উপকারিতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"Music exalts each joy, allays each grief, expels diseases,softens every pain, subdues the rage of poison and the plague. And hence the wise of ancient days adored one power of physic, melody and song."

কাব্য-সঙ্গীতের রস সম্বন্ধে প্রাচীন রসশাস্ত্র 'রসতরঙ্গিণী'তে ভানুদত্ত বলিতেছেন— শৃঙ্গার হাস্য করুণ রৌদ্র বীর ভয়ানকাঃ।
বীভৎসোদ্ভুত সংজ্ঞাশ্চ নাট্যে চাষ্টরসাঃ স্মৃতাঃ॥

কোন রাগিণী কোন রসকে প্রকাশ করিবে, তাহারও শাস্ত্রে বিধান দেওয়া আছে। এমন কি কোন স্বর কোন রসের উপযোগী তাহাও বলা হইয়াছে—স-রী বীরেঽদ্ভুতে রৌদ্রে ধো-বীভৎস ভয়ানকে।
কার্য্যৌ গ-নী তু করুণে হাস্য শৃঙ্গারয়োর্ম-পৌ॥

রবীন্দ্র-সঙ্গীতে করুণরসেরই প্রাধান্য। কবির কাব্যসঙ্গীতের রসের বেদনা অলৌকিক বেদনা; বাহ্যজীবনের দৈনন্দিন সুখদুঃখের উর্দ্ধে যে আনন্দঘন হৃদয়ার্ত্তি অনুভূত হয়, কবির সুরের আবেদন তাহাতেই রসায়িত হইয়া আছে। তাঁহার কথায়—

"দুঃখের নিবিড় উপলব্ধি আনন্দকর, কেননা সেটা নিবিড় অস্মিতা-সূচক…দুঃখ আমাদের স্পষ্ট করে তোলে আপনার কাছে, আপনাকে ঝাপ্‌সা করে দেয় না। গভীর দুঃখ ভূমা, ট্রাজেডির মধ্যে সেই ভূমা আছে, সেই ভূমৈব সুখম্।"

"We enjoy tragedy because the pain which they produce rouses our consciousness to a white heat of intensity.'

তাঁহার সুরে অকারণেই আমাদের চোখে জল আসে। যাহা কিছু

আমরা পাই নাই তাহার জন্য যেন আক্ষেপ জাগায়। সুখের মধ্যেও একটা অজানা অননুভূতপূর্ব দুঃখে প্রাণ উচাটন হইয়া উঠে—

যদি জল আসে আঁখি পাতে। একদিন যদি খেলা থেমে যায় মধুরাতে।
একদিন যদি বাধা পড়ে কাজে শারদ প্রাতে, তবু মনে রেখো ॥
যদি পড়িয়া মনে, ছল ছল জল নাই দেখা দেয় নয়ন কোণে।
তবু মনে রেখো ॥

কবির সকল গানেই এই 'মনে রাখার' করুণ আবেদনটি ধ্বনিত হইতেছে। **ভৈরবী** রাগিণীকে করুণ রসের সুর বলিয়া ধরা হয়, কিন্তু 'সঙ্গীত দামোদরে' ভৈরবী'কে আনন্দ উৎসবের অঙ্গ বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ ভৈরবীকে করুণরসের রাগিণী বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন ;—যৌবনে একদিন কবি তাই বলিয়াছিলেন—

"ওগো কে তুমি বসিয়া উদাস মূরতি বিষাদ-শান্ত-শোভাতে।
ওই ভৈরবী আর গেয়োনাকো এই প্রভাতে,
মোর গৃহছাড়া এই পথিক পরাণ তরুণ হৃদয় লোভাতে ॥

রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন গাহিয়াছিলেন এই 'ভৈরবী'ই! তাঁহার এই রাগিণীটিই সর্বাপেক্ষা বেশি গানে ব্যবহৃত হইয়াছে। কখনও তিনি বলিয়াছেন- "সানাইয়েতে ভৈরবী বাজাচ্ছিল, এমনি অতিরিক্ত মিষ্টি লাগছিল যে, সে আর কি বল্‌ব—আমার চোখের সামনেকার শূন্য আকাশ এবং বাতাস পর্য্যন্ত একটা অন্তর্নিরুদ্ধ ক্রন্দনের আবেগে স্ফীত হয়ে উঠেছিল, বড়ো কাতর কিন্তু বড়ো সুন্দর।" কখনও তিনি অনুভব করিয়াছেন—"ভৈরবী সুরের মোচড়গুলো কানে এলে ঠিক্ যেন মনে হয় ঘর্ষণ-বেদনায় সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মর্মস্থল হতে একটা গভীর কাতর করুণ রাগিণী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে।"

নিশাবসানের গভীর দুঃখ ভোরের ভৈরবীতে নিবিড় হইয়া ফুটিয়া উঠে, সকাল বেলার আলোয় বিদায় ব্যথা বাজিতে থাকে—(১) সকাল

বেলার আলোয় বাজে। (২) হায় অতিথি এখনি কি হল। (৩) স্বপনে দোঁহে ছিনু কি মোহে। (৪) মিলনরাতি পোহালো। (৫) ওকে বাঁধবি কে রে। (৬) আমার যাবার বেলা পিছু ডাকে প্রভৃতি গানে ভৈরবী এবং আশাবরীতে সুরের বেদনা মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়াছে। 'শেষ বেলাকার শেষের গানে' সন্ধ্যার বেদনাও ভৈরবীতেই আসিয়াছে। 'মন যে বলে চিনি চিনি যে গন্ধ বয় এই সমীরে' গানে এই রসের বেদনাই—'চিত্ততলে জাগিয়ে তোলে অশ্রুজলের ভৈরবীরে'॥ 'তুমি যেয়োনা এখনি' গানে ইহাতেই আকুলতা ফুটিয়াছে।

করুণ রসের অন্যান্য রাগিণী আমাদের শাস্ত্রমতে—**বিভাস**, আলহিয়া, দেবগিরি, ককুভ, **যোগিয়া** ও গান্ধার! বিভাসে আক্ষেপ ফুটাইয়াছেন কবি—'হৃদয়ের একূল ওকূল দুকূল ভেসে যায়'। জয়জয়ন্তী, সিন্ধু, দেশ রাগিণীও করুণ রসের প্রকাশ করে। নৈরাশ্য প্রকাশ পাইয়াছে সিন্ধুতে—'যদি প্রেম দিলে না প্রাণে' (ঝাঁপতাল)। হতাশ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে জয়জয়ন্তীতে 'জীবন যখন শুকায়ে যায়'। বিষাদ ফুটিয়াছে পিলুতে 'দিন যায়রে বিষাদে'। আক্ষেপ প্রকাশ পাইয়াছে টোড়িতে 'রজনীর শেষ তারা'। যোগিয়া এবং বিভাসের মিশ্র সুরে 'আজি শরত তপনে' গানেও বেদনা ফুটিয়াছে! কবি অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন 'ভৈরবী'তে—

"আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে.
কেন নয়নের জল ঝরিছে বিফল নয়নে॥"

বীর রসের রাগিণী শাস্ত্রমতে—**সিন্ধুড়া**, নট, মালব, **শঙ্করা** ও পুরিয়া! 'শঙ্করা'য় বীররস উদ্দীপনার গান কবির অনেক আছে, যেমন—

"আর নহে আর নয়। আমি করিনে আর ভয়।
আমার ঘুচলো বাঁধন, ফল্‌লো সাধন, হলো বাঁধন ক্ষয়॥"

এই রাগিণীতে 'জাগিতে হবে রে' (চৌতাল) গানে ঘৃণা এবং

অভিশাপ প্রকাশ পাইয়াছে। সিন্ধুড়ায় 'না যেয়ো না কো' গানে আকুল আগ্রহ ফুটিয়াছে।

হাস্যরসের গান আমাদের শাস্ত্রমতে নিম্নস্তরের; হাস্যের ফেনিলতা জিনিসটি আমাদের সঙ্গীত প্রবাহ বর্জন করিতেই চায়। শাস্ত্রে অবশ্য এ রসের রাগিণী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—ভৈরব, কল্যাণ, ভূপালি, শ্যাম, হাম্বীর, আড়ানা ও সাহানাকে। বহিরঙ্গের প্রকাশ বৈচিত্র্যে তাহার সার্থকতা কবি অবশ্য স্বীকার করিতেন না—"যে সাহানার সুর অচঞ্চল ও গভীর, যাহাতে আমোদ আহ্লাদের উল্লাস নাই, তাহাই আমাদের বিবাহ উৎসবের রাগিণী।" তবে সে সঙ্গে কবি একথাও স্মরণ করিয়াছেন—

"নরনারীর মিলনের মধ্যে যে চিরকালীন বিশ্বতত্ত্ব আছে সেইটিকে সে স্মরণ করাইতে থাকে, জীবজন্মের আদিতে যে দ্বৈতের সাধনা তাহারি বিরাট বেদনাটিকে ব্যক্তি বিশেষের বিবাহ-ঘটনার উপরে সে পরিব্যাপ্ত করিয়া দেয়।" কবির বিবাহ-উৎসবে শান্ত শুচি পরিবেশ সৃষ্টির জন্য রচিত প্রায় সকল গানই **সাহানায়** রচিত। যেমন—(১) শুভদিনে শুভক্ষণে (২) দুই হৃদয়ের নদী প্রভৃতি। বিবাহোৎসবে লঘু চটুলতার স্থান আছে এ কথা তিনি মনে করিতেন না।

বসন্তের আগমনী গাহিবার জন্য তিনি 'সাহানা'কেই ব্যবহার করিয়াছেন 'আমার মালার ফুলের দলে আছে লেখা বসন্তের মন্ত্রলিপি।'

কবি নানাভাবেই তাঁহার সুরের মধ্য দিয়া বিশ্বরসকেই ফেনাইয়া তুলিবার ভার লইয়াছিলেন। তাঁহার কথায়—"এই জন্যই আমাদের রাগরাগিণীর রসটি সাধারণ বিশ্বরস। মেঘমল্লার বিশ্বের বর্ষা, বসন্ত বাহার বিশ্বের বসন্ত। মর্ত্ত্যলোকের দুঃখসুখের অন্তহীন বৈচিত্র্যকে সে আমল দেয় না।"

প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্যকে রূপে রসে বর্ণে ফুটাইয়া তোলাই

তাঁহার সঙ্গীত সাধনার মূলমন্ত্র ছিল, তাই তিনি বলিয়া গিয়াছেন—"গান রচনায় আমি নিজে কী করেছি, কোন পথে গেছি গানের তত্ত্ববিচারে তার দৃষ্টান্ত ব্যবহার করা অনাবশ্যক। আমার চিত্তক্ষেত্রে বসন্তের হাওয়ায়, শ্রাবণের জলধারায় মেঠো ফুল ফোটে, বড়ো বড়ো বাগানওয়ালাদের কীর্ত্তির সঙ্গে তার তুলনা করি না।"
রবীন্দ্রনাথের গান তাঁহার স্বাভাবিক রসসাধনা হইতেই উৎসারিত।

কবির একশ্রেণীর গানের নাম দেওয়া হইয়াছে **আনন্দ সঙ্গীত**। চাপল্য এবং উল্লাস অভিব্যক্ত হয় এ শ্রেণীর গানগুলির সুরে। কবি বলিতেছেন "এই বস্তুলোককে ঘিরে একটি অদৃশ্য আনন্দ লোক আছে। সেই আনন্দলোকের সঙ্গে আমাদের জীবনের যোগসূত্র না থাকলে আমরা ত্রিশঙ্কুর মতো শূন্যে থাকি।" বসন্ত-শরতের বহু গানের সুরে কবি আনন্দময় উচ্ছলতায় সে যোগসূত্র বহন করিয়াছেন। যেমন—ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে (পরজ বাহার)। ওরে আয়রে তবে মাতরে সবে (বাহার)। ওরে গৃহবাসী খোল্ দ্বার খোল্ (বসন্ত) প্রভৃতি। আনন্দ রয়েছে জাগি, আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে প্রভৃতি গানে হাম্বীর রাগিণী গাম্ভীর্য্যময় উল্লাস ফুটাইয়াছে।

মালকোষও গম্ভীর রসের রাগিণী। "মালকোষের চৌতাল যখন শুনি তাতে কান্না হাসির সম্পর্ক দেখিনে, তাতে দেখি গীতিরূপের গম্ভীরতা।" কবির সে ভাবের গান 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে'।

ভৈরোঁকেও তিনি উৎসবের রাগিণীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন—"আমাদের উৎসব দেবতা প্রতিদিনের নিদ্রা থেকে আজ এই উৎসবের দিনে আমাদের জাগিয়ে তোলবার জন্যে দ্বারে এসে তাঁর ভৈরব রাগিণীর প্রভাতী গান ধরেছেন।"

কিন্তু তিনি সে সঙ্গে ভৈরোঁকে রুদ্র রসের গান বলিয়া গ্রহণ

করিতেও দ্বিধা-সঙ্কোচ বোধ করেন নাই! তাঁহার শেষ জীবনের প্রচণ্ড উদ্দীপনার গান—ভৈরোঁতেই রচিত —

"ঐ মহামানব আসে দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে"।

শৃঙ্গার রসের রাগিণী—কলিঙ্গড়া, পরজ, ললিত, কেদারা, খট, সোহিনী ও বাহার। সোহিনীতে রচিত গান কবির 'চাঁদ, হাসো, হাসো।' শাস্ত্রের মতানুসারে **পরজ** প্রেমের সম্ভোগের গান; কিন্তু কবি পরজকে বিষাদের, বিরহের সুর রূপেই গ্রহণ করেন—"পরজ যেন অবসন্ন রাত্রিশেষের নিদ্রাবিহ্বলতা"—

'আজি পরজে বাজে বাঁশি,
যেন হৃদয়ে বহুদূরে আবেশ বিহ্বল সুরে।
বিকচ মল্লীমাল্যে তোমারে স্মরিয়া রেখেছি ভরিয়া ডালা।'

কালাংড়ায় প্রেমের মিনতি ফুটিয়াছে—

'আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা'।

রবীন্দ্রনাথকে বর্ষার কবি বলা হয়। বর্ষা বিরহেরই ঋতু—এই ঋতুর রাগিণী **মল্লার**। কবি তাঁহার অজস্র বর্ষার গানেই মেঘদূতের সেই সুদূর চিরন্তন বিরহকে রূপায়িত করিয়াছেন মেঘেরই সুরে। কবির কথায় "মেঘমল্লারে যখন বর্ষার গান চলে তখন তার মধ্যে না থাকে ঝরঝর বৃষ্টির অনুকরণ, না থাকে ঘড় ঘড় বজ্রের ডাক। তবু কোনো বাস্তববিলাসী তাকে অবাস্তব বলে নিন্দা করে না!"

মেঘমল্লারে বর্ষার গান, যেমন—'আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে,' 'আবার এসেছে আষাঢ়' প্রভৃতি। মল্লার কবির সুরে নানাভাবেই প্রাধান্য পাইয়াছে; বর্ষার গান ছাড়া অন্য গানেও মল্লার যোজনা করা হইয়াছে—'গরব মম হরেছো'; 'চলেছে তরণী প্রসাদ-পবনে'

প্রভৃতি। উপাসনার গানেও মল্লারের স্থর লাগানো হইয়াছে 'সফল করো হে প্রভু আজি সভা' 'দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া'।

মূলতান, পূরবী প্রভৃতি রাগিণীকে কবি ঔদাস্যের স্থর রূপেই ব্যবহার করিয়াছেন। **মূলতানে** কবির গান 'আমার মন মানে না দিন রজনী'। কবির কথায়—"আবার তারা মূলতান বাজাচ্ছে মনটা বড়ই উদাস করে দিয়েছে! পৃথিবীর এই সমস্ত সবুজ দৃশ্যের উপরে একটি অশ্রুবাস্পের আবরণ টেনে দিয়েছে।"

পূরবী কবির মনে চিরকালই মোহ বিস্তার করিয়াছিল: এ স্থরটীকে তিনি কারুণ্যময় করিয়া রাখিয়াছেন, 'যেন শূন্য গৃহচারিণী বিধবা সন্ধ্যার অশ্রুমোচন'! কবির দিন ফুরাইয়া আসিতেছে—

"দেখো নাকি হায়, বেলা চ'লে যায়—সারা হয়ে এলো দিন,
বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীণ।"

পূরবীর স্থরে দুঃখ ফুটিয়াছে—আমার গোধূলি লগন; সন্ধ্যা হল গো, ওমা; আজি এ আনন্দ সন্ধ্যা প্রভৃতি গানে।

'বেহাগ'ও কবির গানে উদাসিনী বিরহিণীর রূপ দিয়াছে;

"দেখি তার বিরহী মূর্ত্তি বেহাগের তানে
সকরুণ নত নয়ানে।"

তাই মনে হইতেছে কবির ভাষায় "নৌকা থেকে বেহালা যন্ত্রে প্রথম পূরবী পরে বেহাগে আলাপ শোনা গেল—সমস্ত স্থির নদী এবং স্তব্ধ আকাশ মানুষের হৃদয়ে একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে গেল; যেই পূরবীর তান বেজে উঠল, অমনি অনুভব করলুম এও এক আশ্চর্য্য গভীর এবং অসীম সুন্দর ব্যাপার, এও এক পরম সৃষ্টি—সন্ধ্যার সমস্ত ইন্দ্রজালের সঙ্গে রাগিণী এমনি সহজে বিস্তীর্ণ হয়ে গেল, কোথাও কিছু ভঙ্গ হল না—আমার সমস্ত বক্ষঃস্থল ভরে উঠল।"

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গানের গতি বিলম্বিত লয় এবং ভাব

ঔদাস্যময়। ধ্রুপদের রীতিতে সুপ্রসন্ন ভাগবতী গভীরতা তাঁহার বহু গানেই প্রকাশ পাইয়াছিল। কিন্তু এ সকল গানের তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিষাদময় নির্লিপ্ততা শেষ বয়সের বিশিষ্ট সুর হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতিটি সুরই আমাদের দৈনন্দিন দুঃখের বহু উর্দ্ধে ভাবলোকে লইয়া যায়—(১) ধীরে বন্ধু ধীরে। (২) আঁধার এলো বলে। (৩) এখন আমায় সময় হল। (৪) তুমি রবে নীরবে। (৫) সকরুণ বেণু বাজায়ে। (৬) আমারে করো তোমার বীণা। (৭) আমি তোমায় যত। (৮) কি পাইনি তার হিসাব মিলাতে প্রভৃতি গান।

মায়ের কোলে ঘুমপাড়ানি ছেলে-ভুলানো ছড়া গানের দ্বারা শিশুদের গান শোনা সুরু হয়, একটানা আবেশময় সুরবিহ্বলতা তাহাদের মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখে। রবীন্দ্রনাথেরও শিশুমনের উপযোগী এক শ্রেণীর গান আছে; তাহা ছাড়া তাঁহার কোনো কোনো গানে বাৎসল্যরসও ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবির ঋতুমঙ্গলের অধিকাংশ গান, বিশেষতঃ শরতের গানগুলিতে সহজ সারল্য প্রকটিত। ঋণশোধ এবং শারদোৎসব গীতিনাট্যের বহিরঙ্গ কিশোরমনের উপযোগী করিয়াই রচিত; সংসারের বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া প্রকৃতির আনন্দ উৎসবে যোগদানের আমন্ত্রণ বহন করিয়াছে ঐদুইটি রূপকনাট্য। ওগো সাঁওতালী ছেলে; এল যে শীতের বেলা; বাদল ধারা হোল সারা; পূবসাগরের পার হতে; দূরদেশী ঐ রাখাল ছেলে; তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে প্রভৃতি গান সুর এবং ভাব অনুযায়ী ছোটদের জন্যই বিশেষ করিয়াই যেন রচিত।

কবির একশ্রেণীর গানে অভিনয়ভঙ্গিমা সুস্পষ্ট। এগুলিকে **'নাট্য-সঙ্গীত'** আখ্যা দেওয়া যায়। কবির কথায় "সচরাচর কথার মধ্যে যেখানে একটু হৃদয়াবেগের সঞ্চার হয়, সেখানেই আপনি কিছু-না-কিছু সুর লাগিয়া যায়। বস্তুতঃ রাগ, দুঃখ, আনন্দ, বিস্ময়

আমরা কেবলমাত্র কথা দিয়া প্রকাশ করি না, কথার সঙ্গে সুর থাকে।" কবির গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের অধিকাংশ গান এই অঙ্গের অন্তর্গত।

এসব গানের সুরে 'হৃদয়াবেগের উত্থান পতনে'র ছায়াপাত হইয়াছে। যেমন—কেদারায় 'তিমির অবগুণ্ঠনে' গানে বিস্ময় প্রকাশ করা হইয়াছে 'কে তুমি'র পুনরাবৃত্তির দ্বারা। 'দে পড়ে দে আমায় তোরা' গানের 'দে' শব্দের দ্বারা আগ্রহ, 'ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো গানে 'ক্ষমা করো' র সংযোগে ক্লান্তি প্রকাশিত হইয়াছে। 'নূপুর বেজে যায়' গানে নূপুর ঝঙ্কার, 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে' গানে নৃত্যের ধ্বনি, 'ঝর ঝর ঝর, ঝর, ঝরে রঙের ঝর্ণা' গানে ঝর্ণার শব্দ ধ্বনিত হইয়াছে।

তাঁহার বহু গানের একটি শব্দের উপর বার বার Emphasis দিয়া সেই গানকে অভিনীতি প্রবণ করা হইয়াছে; যেমন— (১) সব দিবি কে, সব দিবি পায়; আয় আয় আয়। (২) যেতে দাও গেল যারা, তুমি যেয়ো না তুমি যেয়ো না। (৩) নারে না, হবেনা তোর। (৪) রঙ্ লাগালে বনে বনে কে। (৫) হবে জয়; হবে জয় প্রভৃতি গানের কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়।

গত শতাব্দীতে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সঙ্গীতের রসের উদ্দীপনা সম্বন্ধে আক্ষেপ করিয়াছিলেন—"সুরকারগণ গানের সুর বসাইবার সময় তাহার ভাবার্থের প্রতি কখনও মনোযোগ দেন না; এবং রাগরাগিণীর অবলম্বন ভিন্ন গীতে সুর বসাইবার প্রথা না থাকাতে, প্রায়ই গানে প্রয়োজনীয় রসের যথোচিত বিকাশ হয় না। ......আসল কথা এই যে, কলাবতী সংগীতরচয়িতাগণের মধ্যে তেমন প্রতিভাসম্পন্ন স্বর-কবি কেহ জন্মান নাই, যিনি রাগরাগিণী ব্যতীত রস-ভাবপূর্ণ নূতনতর স্বর যোজনা করিতে পারেন।" রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গানে তাহাই সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের গীতিরীতি

রবীন্দ্রনাথের গানের গাহিবার ভঙ্গীতেও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। তাঁহার গানের কথা, ভাব, সুর, গায়কের কণ্ঠস্বর সবার উপর আসন পাইয়াছে গীতিরীতি। তাঁহার গান গাওয়ার বিশিষ্ট ভঙ্গীতে রাগরাগিণী অভিনব রূপ ধারণ করিয়াছে।

রাগরাগিণীর শাস্ত্রানুগত অভিব্যক্তিই যথার্থ সঙ্গীত নয়; ভাবের রসে তাহাকে সুমধুর করিয়া তুলিতে হয়। তাহাছাড়া, যিনি গান গাহিবেন তিনিই যদি গানের সুরদাতা না হ'ন তবে সঙ্গীত অঙ্গহীন হইতে বাধ্য। কবির নিজের কথায়—

"যে মানুষ গান বাঁধিবে আর যে মানুষ গাহিবে দুজনেই যদি সৃষ্টিকর্ত্তা হয় তবে তো রসের গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম। যে গান গাওয়া হইতেছে সেটা যে কেবল আবৃত্তি নয়, তাহা যে তখন তখনি জীবন উৎস হইতে তাজা উঠিতেছে এটা অনুভব করিলে শ্রোতার আনন্দ অক্লান্ত অম্লান হইয়া থাকে। কিন্তু মুস্কিল এই যে, সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা জগতে বিরল। যাদের শক্তি আছে তারা গান বাঁধে আর যাদের শিক্ষা আছে তারা গান গায়, সাধারণত ইহারা দুইজাতের মানুষ। দৈবাৎ ইহাদের জোড় মেলে কিন্তু প্রায় মেলে না।"

গান একটি বিশেষ সময়ে বিশেষ কোন একজনের অনুভূতির সুকুমার প্রকাশ। কালক্রমে তাহার অপপ্রয়োগ সুরু হইয়াছিল। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ছিল মাত্র শ্রদ্ধার পাত্র, উপভোগের আনন্দের বস্তু নয়। কবির কথায় "দেবতার চেয়ে পাণ্ডাকে যেমন ঢের বেশি খাতির করিতে হয়, তেমনি আসরের ওস্তাদের খাতির স্বয়ং সঙ্গীতকেও

যেন ছাড়াইয়া যায়।" তাহার চেয়ে লৌকিক সঙ্গীতের রসগ্রহণ ছিল অনেক সোজা। যে অনুভূতির সুন্দর সুরম্য প্রকাশে সুরের সার্থকতা তাহা ভারতীয় সঙ্গীতে নিয়মজাল ভেদ করিয়া তেমন মর্ম্মস্পর্শী হইয়া উঠিত না। গ্রামের বাউল, ভাটিয়ালী, পদাবলী গানের মধ্য দিয়াই ভাবলোকের সংস্পর্শ অনেকাংশে মিলিত। ভারতের বৈঠকী সঙ্গীতে অনুভূতির সুর বিদায় লইয়াছিল ওস্তাদের হুঙ্কারে; সঙ্গীতের সুরের নয়, অসুরের পালোয়ানী কালোয়াতীই আমাদের মজলিস গরম করিয়া রাখিয়াছিল।

অপর দিকে লৌকিক সঙ্গীত ছিল সকলের সব সময়ের সাথী। বাংলার প্রাণের আসল সুরটা বড় বিষাদের, বৈরাগ্যের উদ্দীপক। কৃষক চাষ করিতে করিতে গান গায় 'রামপ্রসাদী'; মাঝি নৌকা বাইতে বাইতে গায় 'সারি'; ভিখারী ভিক্ষা চাইতে আসিয়া গায় 'কীর্ত্তন'; বৈরাগী গ্রাম্যপথে যাইতে যাইতে গায় 'বাউল'; সবার সুরই বৈরাগ্যের, নৈরাশ্যের। বাংলা গানই উদাস ক্লান্ত সুরের গান।

এই বৈরাগ্যের ভাবানুভূতিই ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের সীমা ছাড়াইয়া বিশ্বলোকের রসানন্দে পরিণত হয়। কবি তাঁহার গানের মধ্য দিয়া সে চেষ্টাই করিয়াছেন—"আর্টের প্রধান আনন্দ বৈরাগ্যের আনন্দ; তা' ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ হর্ষশোক থেকে মুক্তি দেয়ার জন্যে। সঙ্গীতে সেই মুক্তির রূপ দেখা গেছে ভৈঁরোতে, টোড়িতে, কল্যাণে, কানাড়ায়। আমাদের গান মুক্তির সেই উচ্চ শিখরে উঠ্‌তে পারুক বা না পারুক সেই দিকে ওঠবার চেষ্টা করে যেন।" বাংলার জাতীয় ধর্ম্মানুগত বৈরাগ্যভাবই সুরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

কবির সুরজ্ঞতা তাঁহার প্রতিভারই অঙ্গীভূত এবং তাঁহার সুর সম্পূর্ণ তাঁহারই নিজস্ব, একথা কবি বারবারই শুনাইয়াছেন। তাঁহার গানকে কেহ যেন শাস্ত্রীয় শৃঙ্খলের বন্ধনে না রাখেন। তাঁহার নান

সময়ের বহুউক্তি হইতে বেশ মনে হয় সঙ্গীতের Theoretical দিক তাঁহার প্রায় অজানাই ছিল। এক সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন—"দিনুকে যখন আমার গান শেখাতুম তিনি হঠাৎ বলে উঠতেন এইখানে কোমল নিখাদ লেগেছে। আমি অবাক হয়ে বলতুম, তাই নাকি? ছেলেবেলায় দেখেছি আমাদের বাড়ীতে বড়ো বড়ো গাইয়েদের আনাগোনা, শুনেছি অনেক গান কিন্তু শেখার মতো করে কখনো গান শিখিনি।" রবীন্দ্রনাথের গানের গীতিভঙ্গির পক্ষে সে ধরণের পরিবেশের প্রভাব কম নয়!

বীরবল (প্রমথ চৌধুরী) কবির গানের আবাল্য শ্রোতা, তিনিই প্রথম কবির গানের গায়নভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মত ব্যক্ত করেন। "Rabindra Nath sang a few songs—a tuppa of Nidhoo Babu, one of his own recently composed songs and a Hindi song. His voice took me by surprise. It was a powerful tenor voice of extraordinary range. His style of singing was also quite different from that of others. It was practically free from interminable trills (তান) and I felt that he had cultivated the Dhrupad style of singing. That he does not care for the classical style of singing Kheyal and Tuppa, is obvious. Vocal acrobatics are repugnant to him."

রবীন্দ্রনাথের গীতি-রীতির বৈচিত্র্যময় যুগের সূচনা হয় 'গীতাঞ্জলি'র গানের সঙ্গে; এই সময় হইতে রবীন্দ্র-সঙ্গীত তাহার সুরের চাতুর্য্যের ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া গীতি-কবিতার মাধুর্য্যলোকে মুক্তি লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গানগুলির সৃষ্টি এই যুগেই।

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের অধিকাংশ গানই অবশ্য সুরমর্য্যাদায়

নিকৃষ্টতর; গীতাঞ্জলির যুগ হইতেই কবি আর কোন একটি মাত্র ভারতীয় রাগরাগিণীর অনুসরণে গান রচনা করেন নাই; তাঁহার সমস্ত গানেরই সুর এই সময় হইতে নানা রাগরাগিণীর সংমিশ্রণে সৃষ্ট। সে জন্যই পূর্বের ন্যায় কবি গানের সঙ্গে আর তাহার সুর ও তালের নাম লিখিতেও চাহেন নাই। তাহার ফলে গানের রাগিণী সম্বন্ধে গায়কদের মধ্যে মতভেদ হইতে বাধ্য। কবি মনে করিতেন এই সুরগুলি তাঁহার নিজস্ব সৃষ্টি,—প্রচলিত আদর্শের অনুসৃত নয়। তাই বলিয়াছেন—"গানের কাগজে রাগরাগিণীর নাম নির্দেশ না থাকাই ভালো। নামের মধ্যে তর্কের হেতু থাকে রূপের মধ্যে না। কোন রাগিণী গাওয়া হচ্ছে বোলবার কোন দরকার নেই। কী গাওয়া হচ্ছে সেইটেই মুখ্য কথা, কেননা তার সত্যতা তার নিজের মধ্যেই চরম।"

রবীন্দ্রনাথের গীতিরীতির অন্যতম কর্ণধার দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন—"শৈলারোহণের সময় মোড় ফিরে অপ্রত্যাশিত প্রকৃতিমাধুর্য্য দেখে মনটা যেমন চমকে ওঠে, এও সেই রকম। কথাগুলো ভালমানুষের মতো মগজের এক কোণে চুপ করে বসেছিল, সুরগুলো নৃত্যচপল ভঙ্গীতে ঘিরে ঘিরে তাকে এমন একটা অপ্রত্যাশিত রূপদান করলে, যা দেখে রসিকচিত্ত বললে 'বাঃ, এই রকমটিতো ভাবিনি'। আমার মনে হয় কবি হয়তো নিজেই জানেন না, কেমন ক'রে সুরগুলো আপন গতিবেগের প্রেরণায় আপনি Decorative Design-গুলো তৈরী করল, যার আরম্ভ নেই, শেষও নেই, যে সুরটা গড়ে উঠল সেটা কালোয়াতিও নয়, বাউলও নয়, তা সম্পূর্ণ খেয়ালী, জ্ঞানলব্ধ দুর্বিদগ্ধ বলবেন হেঁয়ালী।"

সুররচয়িতা সুরই সৃষ্টি করিতেন সুরের আবেশ মাত্র থাকিত গানে। কবি এবং সুরকার যেখানে একজনই, সেখানে কেবল সুরই

স্থষ্ট হয় না, স্থরের নব নব প্রাণতরঙ্গ ও উন্মাদনাও জাগিয়া উঠে। রবীন্দ্রসঙ্গীতে তাই স্থরলক্ষ্মীর এই নিত্যনূতন নূপুর নিক্বণ: অবিরাম বাজিয়াছে। কত বিভিন্ন স্থরে কত বিভিন্ন নব নব শ্রেণীর সঙ্গীতের কত নব নব ভঙ্গী, কত রসের ধারাই এই গানের প্রবাহে মিশিয়াছে। প্রেমসঙ্গীতে উঠিয়াছে প্রাণের গোপন মরমবীণা ঝঙ্কারিয়া; ধর্ম্মসঙ্গীতে অন্তরাত্মা মাথা নত করিয়া পরম পুরুষকে প্রণাম জানাইয়াছে; স্বদেশসঙ্গীতে উদাত্ত আহ্বানবাণী ধ্বনিত হইয়াছে; ঋতুসঙ্গীতের নানা পটে নটরাজের নৃত্যলীলা বিম্বিত হইয়াছে। গ্রীষ্মে কঠোর তাপসের, বর্ষায় শ্যামল স্থন্দরের, শরতে শারদলক্ষ্মীর, হেমন্তে মাঠে মাঠে সোনার ফসলের ডালি হাতে বস্থমতীর, শীতে কুহেলিঘন ঘোমটা ঢাকা বিরহিণী প্রকৃতির এবং বসন্তে চিরকিশোরের মর্ম্মবাণী রবীন্দ্রসঙ্গীতের গীতিরীতিকে অভিনব বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে।

বিদেশী স্থরশিল্পী ডক্টর Arnold Bake তাঁহার গীতিরীতির এই ভাবে ব্যাখ্যা দিয়াছেন—

"His style is a simple one and yet the melodic contour is nor harsh. It is softened by numerous ornamentations, guttural sounds, light barely suggested appogiature and discreet portandos. These never obscure or clog up the musical phrase but rather emphasise it by rendering it softner and more pliable."

রবীন্দ্রসঙ্গীতের ছন্দ—কবির গানের নব ছন্দ বৈচিত্র্য লইয়া ইতিপূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি, এখানে প্রাচীন রীতিতে তিনি কি কি বৈশিষ্ট্য সঞ্চার করিয়াছেন দেখা যাক,—(১) সমস্ত গানেই তিনি বাণীর মর্য্যাদা রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সে জন্য তাঁহার গানে ছন্দও

হইয়াছে ভাবানুগামী। বহুগানেই একমাত্র শব্দের সুস্পষ্ট উচ্চারণের উপর তাহার ছন্দ নির্ভর করিয়া আছে, যেমন—নীল অঞ্জন ঘন পুঞ্জছায়ায়; দেশ দেশ নন্দিত করি, জনগণমন অধিনায়ক, যাত্রী আমি ওরে। (২) আবার বহু গান আবৃত্তির আদর্শে গাহিলে রসভঙ্গ ঘটিতে পারে, যেমন—আঁধার অম্বরে; ঐ মালতী লতা দোলে প্রভৃতি। কবি বলেন "এই গানগুলি কবিতা নয় এগুলি গান। পাঠসভায় এদের স্থান নয়, গীত সভায় এদের আহ্বান; সঙ্গে সুর না থাকলে এরা আলো-নেভা প্রদীপের মতো।" (৩) হিন্দীগানের অনুকরণে কবি যে সব রাগসঙ্গীত রচনা করেন, সেগুলিতে সুরের সঙ্গে প্রচলিত তালও বজায় রাখিয়াছেন। চৌতাল, ধামার, সুরফাক্তা, মধ্যমান প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের তাল তাঁহার ঐ সকল গানে অনেক পাওয়া যায়। (৪) শেষজীবনে নিজস্ব রীতিতে গান রচনার সময় অধিকাংশ সহজ এবং লঘু ছন্দই তিনি ব্যবহার করিতেন। দাদরা (৫ মাত্রা), কার্ফা, একতালা (১২ মাত্রা) এবং তেওড়া (৭ মাত্রা) তাঁহার এ সময়ের বহুল প্রচলিত ছন্দ। এ সমস্ত ছন্দেও প্রচলিত রীতির রূপান্তর করিয়া সম ও ফাঁকের নানা প্রকার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন—কত যে তুমি মনোহর; নিশীথ রাতের বাদল ধারা; শীতের বনে কোন সে কঠিন প্রভৃতি গান নিদর্শন। (৫) কথোপকথনের ভংগীতে Free verse বা গদ্যছন্দে এবং বিচিত্র আঙ্গিকে রচিত নানা প্রকার গানে তাঁহার ছন্দোবৈচিত্র্য অনন্য; যেমন—হে নূতন দেখা দিক্। আজি কোন সুরে বাঁধিব দিন অবসান বেলারে। নৃত্যনাট্যগুলির অধিকাংশ গানই এই ধারার অন্তর্ভুক্ত।

কবি সব সময়ে গানে ছন্দে শৃঙ্খলা মানিয়াছেন, কিন্তু স্বেচ্ছাচার স্বীকার করেন নাই। তাঁহার কথায়—"তাল জিনিসটা সঙ্গীতের হিসাব বিভাগ। এর দরকার খুবই বেশি, সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু দরকারের চেয়েও কড়াকড়িটা যখন বড় হয় তখন দরকারটাই মাটি

হইতে থাকে। তবু আমাদের দেশে এই বাধাটিকে অত্যন্ত বড় করিতে হইয়াছে, কেননা মাঝারির হাতে কর্ত্তৃত্ব।"

হিন্দুস্থানী গানের ওস্তাদরা তাঁহাদের সুরকৃতিত্ব প্রদর্শন করেন দুর্ব্বল কাব্যছন্দের গানে ছন্দোহিল্লোল সৃষ্টি করিয়া। সে গানের সুরই সর্বত্র ছন্দকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে—"নদী যেমন আপনার পথ আপনি কাটিয়া যায় গানও তেমনি আপনার ছন্দ আপনি গড়িয়া গেলেই ভালো হয়। অধিকাংশ স্থলেই হিন্দীগানে কথায় কোন ছন্দ থাকেনা—সেই জন্যই ভালো হিন্দিগানের তালের গতি বৈচিত্র্য এমন অভাবিতপূর্ব্ব ও সুন্দর; সে ইচ্ছামতো হ্রস্ব দীর্ঘের সামঞ্জস্য বিধান করিতে করিতে বিজয়ী সম্রাটের গুরুগম্ভীর ভেরীধ্বনি সহকারে অগ্রসর হইতে থাকে। তাহাকে পূর্ব্বকৃত বাঁধা ছন্দের মধ্য দিয়া চালনা করিয়া লইয়া গেলে তাহার বৈচিত্র্য এবং গৌরবের হানি হইয়া থাকে।"

এ ভাবে সে কথা মানিয়া লইলেও তিনি তাঁহার গানের সর্ব্বত্রই ছন্দের নিয়মপ্রথা শক্তভাবেই বাঁধিয়া দিয়াছেন। তবে হিন্দিগানে তো কথার কোনই মূল্য নাই, সেখানে তাঁহার গানে কাব্যচ্ছন্দ রীতিমতো প্রাধান্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। তাঁহার কথায় "হিন্দুস্থানী গানে কথা এতই যৎসামান্য যে তাহাতে আমাদের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে না —'ননদিয়া গগরিয়া চুনরিয়া' আমরা কানে শুনিয়া যাই মাত্র; কিন্তু সংগীতের সহস্রবাহিনী নির্ঝরিণী সেই সমস্ত কথাকে তুচ্ছ উপলখণ্ডের মতো প্লাবিত করিয়া দিয়া আমাদের হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যবেগ, এক অনির্বচনীয় আকুলতার আন্দোলন সঞ্চার করিয়া দেয়।" রবীন্দ্রনাথের গানে কথার মূল্য অশেষ, সুর ছন্দ সবই তাহার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। এমন কি তিনি বহু কবিতায় সুর যোজন করিয়া কাব্যচ্ছন্দকেই বজায় রাখিয়াছেন।

পাশ্চাত্য এবং ভারতীয় সংগীতের একটি বিচিত্র ভেদ আছে—

"Where as western music supplements the difference in volume with an alteration of time in order to create this intime atmosphere, the Indian song keeps the same time and rhythm throughout, only sometimes applying 'doppio movimento' and supplements the difference in volume of tone with an alteration of pitch."

বিদেশীর কাণে আমাদের গানে তালের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট না হইলেও ভারতীয় সংগীতে তাহাই বৈচিত্র্য সঞ্চার করে।

কবি 'সঙ্গীতের মুক্তি'তে যে সকল নব ছন্দ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন; হিন্দুস্থানী রীতির ওস্তাদরা তাহার সমর্থনতো করেন নাই-ই; উপরন্তু তাঁহারা প্রতিবাদই জানাইয়াছেন। তাঁহাদের মতে এভাবে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতের অমর্য্যাদাই করিয়া গিয়াছেন; শুধু তাই নয়, তাহার ফলেই বাংলাদেশের সাঙ্গীতিক প্রগতি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা বলেন—"But while Bengali literature made enormous progress through the genius of RabindraNath, his aesthetical and cultural imperialism made **bad music** widely accepted as good and retarded the progress of pure musical thought in Bengal by at least fifty years. One of the greatest mis-conceptions of musical rhythm which came nearly to be established through his criticisms and essays on music, is that poetic and musical rhythm and rhyme are similar things, on which most of the present attempts in Bengali musical composition is based. Thus much rhyming

poetry is sung as music which in itself is an absurd proposition. 'বনের পথে পথে বাজিছে বায়ে— নূপুর রুণুঝুনু কাহার পায়ে'—These songs are not to be sung but recited. There is no rhyme in classical songs, they must be read as prose when without music." (Uttara Mandra).

রবীন্দ্রনাথের গান প্রধানতঃ ধ্রুপদ ভঙ্গীর ; যদিও তাঁহার খেয়াল, ঠুংরি, টপ্পা জাতীয় গানও আছে। কিন্তু 'ধ্রুপদ'ই প্রধানতঃ তাঁহার গীতি-রীতি। ধ্রুপদ সঙ্গীতে প্রধানতঃ দুইটি ভাগ,—আস্থায়ী এবং অন্তরা। গানের প্রথম দুইটি কলিতেই সাধারণতঃ মূলভাবটি ব্যক্ত হয়, সম্পূর্ণ গানটির অন্তে এবং সেই সঙ্গে প্রতি খণ্ডাংশের শেষে প্রথম দুইটি অথবা তাহাদের যে কোন একটি কলি বারে বারে উদ্‌গীত হয়। কণ্ঠস্বর প্রথমে ধীরে ধীরে ব্যক্ত হইতে থাকে, তাহার পর ক্রমেই স্বর দ্রুত স্পন্দিত হয়। শেষের কলিটির সুর প্রথম কলি দুইটিরই অনুরূপ।

অন্তরার রূপ বিভিন্ন প্রকার : এখানে কণ্ঠ উচ্চ গ্রামে উঠে. সুর তীব্র হইয়া আসে (A flat becomes C natural)। গানের শেষের দিকে স্বর কোমল হইতে থাকে, ধ্বনির সরলতা সম্পাদিত হয় এবং সুর আস্থায়ীকে অনুসরণ করে। গানের অন্য দুইটি ভাগ, সঞ্চারী এবং আভোগ, যথাক্রমে আস্থায়ী এবং অন্তরায় অনুকৃত হইয়াছে।

সঞ্চারী রবীন্দ্রসঙ্গীতের তৃতীয় অংশ, এখানে সুরের গাম্ভীর্য্য বিশেষ রূপ লক্ষণীয়। সঞ্চারী, অন্তরা এবং আভোগের মধ্যে আস্থায়ী সুরের বৈচিত্র্য আনে। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের andante (which comes in between two quick movements), তাহার অনুকরণে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সঞ্চারীর ব্যবহার করিয়াছেন।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের উৎকর্ষ নির্ভর করে শ্রোতৃগণের মানসিক প্রকৃতি ও রসগ্রহণের অধিকারের উপর। কোনো গান যখন

আমরা শুনি, তাহার সুর, কণ্ঠস্বর, ছন্দ, বাণী কোন একটি স্বতন্ত্রভাবে আমাদের মুগ্ধ করে না। এই সবের সমন্বয়ে, সঙ্গীতের নিজস্ব যে আবেদন অর্থাৎ 'গীতিরস' তাহাই আমাদের অন্তর উল্লসিত করে।

সঙ্গীতের এই হৃদয়ভাব প্রকাশের উপর প্রধানতঃ তাহার মর্য্যাদা নির্ভর করিতেছে। তাঁহার গান অতি নিভৃত মনের সাধনার গান, এখানে গায়ক এবং শ্রোতা এই দুইজনের বাহিরে আর কাহারও অস্তিত্ব নাই, যেন গায়নের প্রাণের গোপন কথাটি গানে রূপ পাইয়াছে।

প্রসিদ্ধ সুরবৈজ্ঞানিক Bhule বলিয়াছেন—"It is impossible to bound down any true art into rules and laws, hence rules and laws to music are nothing more than false application and deathblow to this sweet child of nature. The works of Shakespeare were not produced by strict adherence to the rules of old Greek dramas. The musical works or Beethoven, Mozart, Chopin, Haydon, not to speak of many other great European composers, were not produced by strict observance to the rules and laws of composition. Rules to fine arts may be compared to telescope, which helps the sight of those who already see. With the help of that telescope when the vast region of music will appear before our vision, we will never require that instrument any more."

রবীন্দ্রনাথও তাঁহার গানে সব সময়ে Classic সঙ্গীতের

অনুশীলন করেন নাই ; কিন্তু যেখানে করেন নাই, সেইখানেই নূতনতর সৃষ্টি করিয়াছেন।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য তাহার কলির পুনরাবৃত্তি এবং সুরের rigidityর উপরই অনেকটা নির্ভর করিতেছে। হিন্দী রাগসঙ্গীতে সুরবিহার গায়নরা স্বেচ্ছামত করিতে পারেন, লোকসঙ্গীতে গায়ক প্রয়োজনমত এবং মনোমত সুর সৃষ্টি করিয়া লইতে পারেন। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যন্ত্র সঙ্গীত বা অর্কেষ্ট্রার গতিকেই গায়করা অনুসরণ করেন ; রবীন্দ্রনাথের গানের মতন কোথাও কথা ও সুরের নিবিড় বন্ধন নাই, তাঁহার গানে গায়কের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে অপহরণ করা হইয়াছে।

বাংলাদেশের দুইজন সঙ্গীত-সমালোচক তাঁহার গীতি-রীতির দুইটি বিশিষ্ট ভঙ্গী প্রবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব করেন, কবি উভয় রীতিতেই আপত্তি জানাইয়াছেন। শ্রীদিলীপ কুমার রায় চাহিয়াছিলেন তাঁহার গানের সুরবিহারের অধিকার। কবি বলেন "এতে যে গুণী ছাড়া পায় তাও মানি। আমার অনেক গান আছে যাতে গুণী এ রকম ছাড়া পেতে পারেন অনেকখানি। আমার আপত্তি এখানে মূলরীতি নিয়ে নয়, তার প্রয়োগ নিয়ে।"

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় চাহিয়াছিলেন তাঁহার গানে গায়কের স্বেচ্ছামতো সুরযোজনা করিয়া গাহিবার অধিকার। শ্রীদিলীপ কুমারও কবির কাছে অনুরূপ আবেদন করেন। কবি বলেন—"এমন অবস্থায় সহজ মীমাংসা এই যে, যে ব্যক্তি গান রচনা করেছে তার সুরটিকে বহাল রাখা। কবির কাব্য সম্বন্ধেও এই রীতি প্রচলিত, চিত্রকরের চিত্র সম্বন্ধেও। রচনা যে করে রচিত পদার্থের দায়িত্ব একমাত্র তারই, তার সংশোধন বা উৎকর্ষসাধনের দায়িত্ব যদি আর কেউ নেয় তা হলে কলাজগতে অরাজকতা ঘটে।"

ধূর্জটিপ্রসাদ কবির মতকে নির্বিচারে স্বীকার করিয়া ল'ন, কিন্তু দিলীপকুমার মনে করেন—"বাংলা গানেও গায়ক হবেন স্বরস্রষ্টা, যদিও হিন্দুস্থানী গায়কের মতন নিরঙ্কুশ হয়ে নয়—ভাবসঙ্গতি রক্ষা করে। রবীন্দ্রনাথ ঠিক এই ভুলটিই করেছিলেন যখন তিনি চেয়েছিলেন তাঁর গানের কাঠামোকে অনড় অচল করতে, গায়ককে হুকুম করেছিলেন সুরকারের তাঁবেদার হতে। এই জন্যে তাঁর গানের ভবিষ্যৎ আমি উজ্জ্বল মনে করি না।"

দিলীপকুমারের কথা খুব অযৌক্তিক নয় মোটেই। তিনি কবির অনুমতি লইয়া একসময়ে তাঁহাকে নিজস্ব ঢঙে তানাদির ব্যবহার সহ 'তোমার বীণা আমার মনোমাঝে' (মিশ্র তিলোক কামোদ-বেহাগ; ঝাঁপতাল) এবং 'হে ক্ষণিকের অতিথি' (ভৈরবী, ঠুংরি) গাহিয়া শুনাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন আপত্তি তো করেনই নাই, বরং দিলীপকুমারের প্রচেষ্টার অনুমোদনই করেন,—"তাঁর যে কোনও গানে অপরে স্বরচিত সুরসংযোজন করে গাওয়া সম্পর্কে তাঁর পূর্ব্বমতের পরিবর্ত্তন হয়েছে অর্থাৎ এখন তাঁর মত এই যে, তাঁর গানে কেউ সম্পূর্ণ নূতন সুর দিয়ে গাইলে সেটা অনুচিত হয় না।"

কিন্তু কবির এ স্বীকৃতির সঙ্গে গভীর দুঃখ জড়াইয়া আছে, এক সময়ে তিনিই বলিয়াছিলেন—"তুমি কি বল্‌তে চাও যে আমার গান যার যেমন ইচ্ছা সে তেমনি ভাবে গাইবে? আমার গানের বিকার প্রতিদিন আমি এত শুনেছি যে আমারও ভয় হয়েছে যে আমার গানকে তার স্বকীয় রসে প্রতিষ্ঠিত রাখা হয়ত সম্ভব হবে না। গান নানা লোকের কণ্ঠের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয় বলেই গায়কের নিজের দোষগুণের বিশেষত্ব গানকে নিয়তই কিছু না কিছু রূপান্তরিত না ক'রেই পারে না। গানের বেলাতে তাকে রসিক হোক অরসিক হোক সকলেই আপন ইচ্ছা মত উলট্‌ পালট্‌ করতে সহজে পারে বলেই

তার উপরে বেশী দরদ থাকা চাই। নিজের গানের বিকৃতি নিয়ে প্রতিদিন দুঃখ পেয়েছি ব'লেই সে দুঃখকে চিরস্থায়ী করতে ইচ্ছা করে না।"

তিনি অবশ্য নিজেও জানিতেন তাঁহার গান কালক্রমে ব্যবসায়ের পণ্য হইয়া বিকৃত হইতে থাকিবে এবং অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় তাঁহার জীবৎকালেই তাহা সুরু হইয়াছিল। সৌম্যেন্দ্রনাথ বলেন— "কবির মৃত্যুর পর থেকে তাঁর গান নিয়ে যে সুরমেধ যজ্ঞ চলেছে তা' দেখে বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। ঢঙের কথা না হয় বাদই দিলুম......।" রবীন্দ্রনাথের অনুবর্ত্তিগণের এ সম্বন্ধে পূর্বেই সচেতন হওয়া উচিত ছিল।

গান অপেক্ষা গায়কের সম্মান আজ বাংলাদেশে অসঙ্গত ভাবেই বাড়িয়া গিয়াছে; তাহার ফলে শিল্পকলার সৌন্দর্য্যের দিকে যথাযথ নজর আর কেহই দেন না। আধুনিক সঙ্গীত-সমালোচকদের অনেকেই এ বিষয়ে আক্ষেপও করিয়াছেন। শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল বলিয়াছেন—

"সভা ও রঙ্গমঞ্চের পশ্চাতে যে ব্যক্তিটি জীবনযাপন করছে, তার সঙ্গে শিল্পসমালোচনার কোনও সম্বন্ধ নেই এবং সভায় ও রঙ্গমঞ্চে যিনি সংগীত পরিবেশন করছেন সেই ব্যক্তির অবতারণ সম্ভব হয়েছে একমাত্র সঙ্গীত সংঘটনার কারণে। অতএব তাঁর কৃতিত্বই একমাত্র আদর্শ হতে পারে এবং সমালোচনার বিষয়ভুক্ত হ'তে পারে, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন কখনও শিল্পপক্ষে আদর্শ হ'তে পারে না বা সমালোচনার বিষয়ীভূত হতে পারে না।"

রবীন্দ্র-ভক্ত সমালোচকরা কবির গানের সুরের অপরিবর্ত্তনীয়তাকে (rigidity) অক্ষুন্ন রাখিতে সচেষ্ট, কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুরস্রষ্টা এবং রসবেত্তা শ্রীদিলীপকুমার রায় কেবল সে কারণেই এ সুরের স্থায়িত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন না—"আমাদের গানের

যারা রূপকার (performer) তারা সুরকারকে (Composer) এতটুকু লঙ্ঘন করলেও, গান থেকে চুনটি খসালেও মহতী বিনষ্টি। আমি চাই যে অন্তত একশ্রেণীর বাংলাগান থাকবে যাতে সুরকার শিল্পীকে এ স্বাধীনতা দেবেন, কেন না এ মূলনীতিটি সত্যে প্রতিষ্ঠিত না হলে ওস্তাদী গানে এখনো রসিক হৃদয় রসিয়ে উঠত না।"

কবি বলেন—"তোমার এ কথা আমিও স্বীকার করি যে সুরকারের সুর বজায় রেখেও এক্সপ্রেশনে কমবেশী স্বাধীনতা চাইবার এক্তিয়ার গায়কের আছে। কেবল প্রতিভা অনুসারে কম ও বেশির মধ্যে তফাৎ আছে একথাটি ভুলোনা। প্রতিভাবানকে যে স্বাধীনতা দেব অকুণ্ঠে, গড়পড়তা গায়ক ততখানি স্বাধীনতা চাইলে না করতেই হবে!"

রবীন্দ্র-সঙ্গীত দরদের (Sentiment) জন্যই অপূর্ব্ব! একই গান ওস্তাদ গাহিলেন, তাহার পর সেই সুর, ছন্দ ও কথাই অন্যজন গাহিলেন, কিন্তু তেমনটি হইল না। তাহার কারণ তাঁহার কণ্ঠে দরদের অভাব।

গানের মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া তাহাতে প্রাণস্পন্দন সৃষ্টি করিয়া রসোত্তীর্ণতা করার নামই 'দরদ'। এই 'দরদ'টির অভাবে কবির গান সম্পূর্ণ ব্যর্থ! কেবল রসগর্ভ বাণীর জন্য নয়, গায়কের অন্তরে কবির প্রতি অসীম শ্রদ্ধার জন্য এই দরদের সৃষ্টি। এই শ্রদ্ধা অন্ধ ভক্তি নয়, নামের মোহ নয়, তাঁহার কাব্য, সাহিত্য, জীবনদর্শনের রসগ্রহণ করিলে, তাঁহার জীবনাদর্শ এবং মনোমাধুর্য্যের সঙ্গে সুপরিচিত হইলে তাঁহার গানের প্রতি স্বতঃই এই শ্রদ্ধার উদ্ভব হইবে।

তাঁহার নিজের কথায়—"ওস্তাদীর চেয়ে বড়ো একটা জিনিষ আছে, সেটা হচ্ছে দরদ। সেটা বাইরের জিনিষ নয়, ভিতরের জিনিষ। বাইরের জিনিষের পরিমাপ আছে, আদর্শ ধ'রে সেটা সম্বন্ধে দাঁড়ি পাল্লার বিচার চলে। তার চেয়ে বড়ো যেটা সেটাকে কোনো বাইরের আদর্শে মাপা চলে না, সেটা হ'ল সহৃদয়হৃদয়বেদ্য।"

গায়কের কণ্ঠে যেমন দরদ দরকার, শ্রোতাদেরও সে রকম রসগ্রহণের ক্ষমতা চাই। রসিক শ্রোতার দায়িত্বের কথায় তিনি বলিতেন—"এই কবি ও রসিক একই জাতের মানুষ। তফাতের মধ্যে এই যে, একজনের আছে সুরের প্রাণ ও কান, আর একজনের আছে স্বরের প্রাণ ও গলা।"

রবীন্দ্রনাথের গানকে অবলম্বন করিয়াই বাংলাদেশে সাঙ্গীতিক 'রেনেসাঁ' আসিয়াছে। তবে দুঃখের কথা সে প্রগতি এখন অবনতির দিকেই, তাঁহার গানের বিকৃতি ঘটিতেছে আধুনিক গানের সুর-স্বেচ্ছাচারিতায় অবিরতই! কবি নিজেও তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন —"গানবাজনার সম্বন্ধে কালের যে বদল হইয়াছে তার প্রধান লক্ষণ এই যে, আগে যেখানে সঙ্গীত ছিল রাজা, এখন সেখানে গান হইয়াছে সর্দার। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ গান শুনিবার জন্যই এখনকার লোকের আগ্রহ, রাগরাগিণীর জন্য নয়। সেই সকল বিশেষ গানের জন্যই গ্রামোফোনের কাটতি। যুবক মহলে গায়কের আদর সে গান জানে বলিয়া, সে ওস্তাদ বলিয়া নয়।"

সত্যকার দরদী সমজদার শ্রোতার অভাবে সঙ্গীতসৃষ্টিধারা আজ রুদ্ধপ্রায়, রেডিও'র অনায়াসগম্য আসরের কল্যাণে গায়কদের সুরশিক্ষা আজ অসম্পূর্ণ। "কেন না, শুনিবারও প্রতিভা থাকা চাই কেবল শুনাইবার নয়।" কবির সুরসৃষ্টি এই শ্রেণীর ভক্তজনের স্তুতিবাদের দ্বারা অভিনন্দিত হইলেও, এককালে তিনি রসিকগোষ্ঠীরও সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন,—"সঙ্গীতের অলঙ্কার শাস্ত্রবোধ অন্ততঃ ধনিসমাজে প্রচলিত ছিল। ঠিক্ কোন্‌খানে সুর বা তালের কতটুকু স্খলন হচ্ছে, সেটা তাঁরা অনেকেই জানতেন, সেই দিকে কান রেখেই তাঁরা গান শুন্‌তেন। বাঁধা আদর্শের সঙ্গে তালমানলয় সম্পূর্ণ মিলেচে দেখলেই তাঁরা পুলকিত হ'য়ে উঠ্‌তেন।

রাগিণীর যে-সব জায়গায় দুরূহ গ্রন্থি, সেইখানটাতে যে-সব গাইয়ে অনায়াসে সঙ্কট পার হয়ে যেত তারাই বরমাল্য পেত।"

গানের মধ্য দিয়াই কবি নানাভাবে সুরের সঙ্গে তাঁহার অন্তরাত্মার নিবিড় সংযোগ অনুভব করিয়াছেন এবং গভীর হৃদয়াবেদন প্রকাশ করিয়াছেন। কখনও তিনি বিস্মিত হইয়াছেন—

আমার আপন গান আমার অগোচরে
নিয়ে যায় ভাসায় স্বপ্নের পারে ॥

কখন বা গভীর দুঃখে আক্ষেপ করিয়াছেন—

'আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল, নিল ভুলায়ে?'

সুর ভুলিবার জন্য ক্ষমা প্রার্থনাও করিয়াছেন—

সুর ভুলে যেই ঘুরে বেড়াই কেবল কাজে,
বুকে বাজে তোমার চোখের ভৎর্সনা যে ॥

আবার আশ্বাস পাইয়াছেন—

কণ্ঠে নিলেম গান, আমার শেষ পারানির কড়ি।
একলা ঘাটে রইব না গো পড়ি ॥

কখন বা আশা করিয়াছেন—

আপন গানের টানে তোমার বন্ধন যাক্ টুটে
রুদ্ধবাণীর অন্ধকারে কাঁদন জেগে উঠে ॥

এই ভুবনকে চিনিতে হইলে, তাহার রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণের আস্বাদ গ্রহণ করিতে হইলে আমাদের গানের মধ্য দিয়াই প্রবেশ করিতে হইবে, এই ছিল তাঁহার বিশ্বাস—

গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
তখন তারে চিনি, আমি তখন তারে জানি ॥

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের পরিবেশন পদ্ধতি

গাহিবার প্রথার বৈশিষ্ট্যে রবীন্দ্রনাথের গান অভিনব স্বাতন্ত্র্যলাভ করিয়াছে। গান তো গাহিবার জন্যই রচিত হয়, সুকণ্ঠে উদ্গীত হইয়াই তাহার সার্থকতা; আবৃত্তি করিয়া, কবিতার সুরে পড়িয়া তাহার মর্য্যাদা দেওয়া সম্ভব নয়। কবিকে সেজন্য মাঝে মাঝে সতর্কতার বাণী প্রচার করিতে হইত: "একথা মনে রাখা কর্তব্য যে, এই জাতীয় রচনায় স্বভাবতই সুর ভাষাকে বহু দূর অতিক্রম করে থাকে, এই কারণে সুরের সঙ্গ না পেলে এর বাক্য এবং ছন্দ পঙ্গু হয়ে থাকে। কাব্য-আবৃত্তির আদর্শে এই শ্রেণীর রচনা বিচার্য্য নয়। যে পাখীর প্রধান বাহন পাখা, মাটির উপরে চলার সময় তার অপটুতা অনেক সময় হাস্যকর বোধ হয়।"

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মূল রীতিনীতির লঙ্ঘন না করিয়াও বাংলা গানে যে স্বাতন্ত্র্য আনা যায়, কবি তাহা দেখাইয়াছেন। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের অচলায়তনের মধ্যে এ যেন 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে সুর মুক্তির স্বাদ' লাভ করিল। তাঁহার মতে—"বাংলায় নূতন যুগের গানের সৃষ্টি হোতে থাকবে ভাষায় সুরে মিলিয়ে। সেই সুরকে খর্ব করলে চল্‌বে না। তার গৌরব কথার গৌরবের চেয়ে হীন হবে না। সংসারে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকারে দাম্পত্যের যে পরিপূর্ণ উৎকর্ষ ঘটে, বাংলা সঙ্গীতে তাই হওয়া চাই। এই মিলন সাধনে ধ্রুবপদ্ধতির হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সহায়তা আমাদের নিতে হবে আর অনিন্দনীয় কাব্যমহিমা তাকে দীপ্তিশালী করবে!" হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকিলে তাঁহার গান পরিবেশন করা যায় না।

গান রচনা করার সময় তাঁহাকে তবে সব সময়ে স্মরণ রাখিতে হইয়াছে যে এ গানের শ্রোতা তাঁহারই কাব্যের সুপরিচিত দরদী পাঠকরাই। তাহারা তাঁহাকে কবি বলিয়াই জানে, ওস্তাদ বলিয়া নয়; তাঁহার কাছে তাহারা সেই গানই শুনিতে চাহে, যাহাতে তাঁহার নিজের কবি-পরিচয় রহিয়াছে।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন অনুকরণের জন্য নয়, তাঁহার গানের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির অভিলাষে। কবির ভাষায়—"হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে আমরা শিখব পাওয়ার জন্যে, ওস্তাদী করবার জন্যে নয়। বাংলা গানে হিন্দুস্থানী বিধি বিশুদ্ধভাবে মিলচে না দেখে পণ্ডিতেরা যখন বলেন সঙ্গীতের অপকর্ষ ঘটেছে, তখন তাঁরা পণ্ডিতি স্পর্দ্ধা করেন, সেই স্পর্দ্ধা সব চেয়ে দারুণ।"

অতএব কবি গানে বৈয়াকরণ প্রাধান্য দিতে অস্বীকার করিলেন।

কবি নির্বিচারে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের অনুকরণ এক বয়সে যথেষ্টই করিয়াছেন। এই শ্রেণীর ভাঙ্গা গানগুলিকে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী 'অর্দ্ধ-রবীন্দ্র-সঙ্গীত' আখ্যা দেবার পক্ষপাতী। এ বয়সে ধ্রুপদ গানগুলি তাঁহার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সুন্দর নিদর্শন হইলেও এসব গানে সেজন্য তাঁহার কৃতিত্ব অল্প, ক্রমে ধ্রুপদভঙ্গী তাঁহার গানের অঙ্গে অঙ্গে মিশিয়া গেল।

কবির স্বীকারোক্তি—"আমার আদি যুগের রচিত গানে হিন্দুস্থানী ধ্রুব পদ্ধতির রাগরাগিণীর সাক্ষীদল অতি বিশুদ্ধ প্রমাণসহ অপেক্ষা করে আছে। সেই সঙ্গীত থেকেই আমি প্রেরণা লাভ করি।"

এগুলি প্রকৃতপক্ষে হিন্দীভাষায় রচিত ধ্রুপদের অনুকরণ মাত্র, কাজেই অনুকৃত গানের গীতিরীতি বা গায়নী বৈশিষ্ট্যগুলি অনেকেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। হিন্দী ধ্রুপদের অনুসরণে মীড়, গমক এবং পুনরাবৃত্তি অত্যধিক বিস্তার করিয়া এবং

অনুকৃত গানের নিয়মে প্রচুর তান এবং বাঁটের সহায়তায় এসব গানকে ওস্তাদী গানের পর্যায়ে লইয়া যাওয়াও চলে। তবে তাহার ফলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও সমগ্রতা ক্ষুণ্ণ হইবে। তাহা ছাড়া কবির নিজস্ব গীতিরীতি ব্যাহত হওয়ায় গানগুলি শ্রুতিকটু শোনায়! কবি বাল্য বয়স হইতেই ধ্রুপদ গানেরই পক্ষপাতী ছিলেন—

"আমরা বাল্যকাল থেকে ধ্রুপদগান শুনতে অভ্যস্ত, তার আভিজাত্য বৃহৎ সীমার মধ্যে আপন মর্যাদা রক্ষা করে।"

এই ধ্রুপদেও কবি কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। Dr. Arnold Bake মন্তব্য করেন—"It is characteristic of the genius of Tagore that he has, as if by instinct, found the Dhrupad the only form in ancient Indian music that could serve as a basis for his creations. × × × The poet has succeeded in keeping the essential features of construction, but nevertheless has made the form supple and clear, fit for the direct appeal even to the heart of the simple peasant."

একই গান একই ঢঙে একই ভাবে চিরকাল গাওয়া হইলে তাহার বৈচিত্র্য থাকে না। তবে এ শ্রেণীর রক্ষণশীলতারও একদিকে সার্থকতা আছে। কবির ভাষায়—"তাঁরা একান্ত অবিকৃতভাবে প্রাচীন ধারাকে অনুসরণ ক'রে চলেন এইটেই তাঁদের গর্বের বিষয়। এইরকম রক্ষকতার মূল্য আছে। সমাজ সেই মূল্য তাঁদের যদি না দেয় তবে তাঁদের প্রতিও অন্যায় করে, নিজেরও ক্ষতি ঘটায়।"

প্রথম আমলে অর্থাৎ ব্রহ্মসঙ্গীতরচনার সময় হিন্দুস্থানী গানের অনুসরণে রাগরাগিণীর যথেষ্ট নৈপুণ্য তিনি পূর্বেই প্রকাশ করিতে

সুরু করেন, কিন্তু তাহাতে স্বরদক্ষতা যথেষ্ট থাকিলেও, তাঁহার কৃতিত্ব নাই, বৈচিত্র্যই বা কোথায় ?

পরে কবি সুরের মুক্তি খুঁজিয়া পাইলেন, তাহাকে অন্যের সঙ্গে মিলনের সুযোগ দিলেন, কবিমনের সঙ্গে শিল্পিমনের নিবিড় সহযোগ সৃষ্ট হইল নূতনতর সুরের গান। এখন হইতে তাঁহার গানে আর কোনো এক রাগিণীর একাধিপত্য রহিল না, তাই রসের আনন্দে রূপের উপলব্ধিই গান প্রকাশ করিতে চাহিল, বিজ্ঞানের দক্ষতাকে সাধ্যপক্ষে সংবরণ করিল। কিন্তু শ্রুতির মাধুর্য্য এবং মূর্চ্ছনার কলতরঙ্গই গানকে রম্যতর করিয়া রাখিল।

সঙ্গীতকলার রসপরিবেশনের অনুশাসন করিবার জন্য সঙ্গীত শাস্ত্রাদির রচনা। প্রাচীন বৈদিক যুগের নারদ, ভরত, মতঙ্গ, হনুমন প্রভৃতি মুনিগণের নির্দ্দেশিত স্বরশাস্ত্র পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিক যুগে বাংলাদেশেই এই শ্রেণীর শাস্ত্র প্রথম রচিত হয় সেনরাজাদের আমলে। বল্লাল সেনের সভাগায়ক পণ্ডিত লোচনদাসের 'রাগতরঙ্গিণী' এবং 'রাগসংগীত-সংগ্রহ' আজ পর্য্যন্ত ভারতীয় সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠতম প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত। লোচনদাস রাগ শ্রেণীকে দুইটি ভাগ করিয়াছিলেন—দ্বাদশটি আদি বা 'জনক' রাগ এবং ৮৬টি মিশ্র বা 'জন্য' রাগ।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতে শার্ঙ্গদেব 'সঙ্গীতরত্নাকর' রচনা করেন। তাঁহার টীকাকার কল্লিনাথ শার্ঙ্গদেবের মতকে উত্তরভারতে প্রচার করিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর শাস্ত্রপ্রণেতা পুণ্ডরীক বিঠল ছিলেন সামসময়িক গুণী তানসেন এবং গোপাল নায়কের সুপরিচিত। তাঁহার গ্রন্থ 'সদ্রাগচন্দ্রোদয়', 'রাগমালা' ও 'রাগমঞ্জরী'। রাম অমাত্য রচনা করেন দক্ষিণীরীতির 'স্বরমেলকলানিধি'।

সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত হয় শ্রীনিবাস পণ্ডিতের 'রাগতত্ত্ববিবোধ'; সোমনাথ পণ্ডিতের 'রাগবিবোধ'; অহোবলের 'সঙ্গীত পারিজাত'। শেষোক্ত গ্রন্থের পারসী ভাষায় অনুবাদ হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিকানীরের রাজা অনুপসিংহের সভাগায়ক ভাবভট্ট রচনা করেন 'অনূপসঙ্গীত বিলাস'। 'হৃদয়-কৌতুক' এবং 'হৃদয়-প্রকাশ'ও সম্ভবতঃ তাঁহারই রচনা।

মুসলমান শাস্ত্রবিদ্‌দের রচিত গ্রন্থের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ মহম্মদ রেজার 'নাগমাত উল্‌ অস্‌ফী'। এই সমস্ত সঙ্গীতশাস্ত্রই চিরকাল ভারতীয় সঙ্গীতের বিধিবিধানের নির্দ্দেশ দিয়া আসিতেছে।

কবি অবশ্য এ সকল অনুশাসন ঠিক্ মতো মানিতে চাহিতেন না; তাঁহার উক্তি—"মহাদেব নারদ এবং ভরত মুনিতে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া যদি আমাদের সঙ্গীতকে এমন চূড়ান্ত উৎকর্ষ দিয়া থাকেন যে আমরা তাকে কেবলমাত্র মানিতেই পারি, সৃষ্টি করিতে না পারি তবে এই সুসম্পূর্ণতার দ্বারাই সঙ্গীতের প্রধান উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবে।"

ওস্তাদী গানের আলাপের অন্ত নাই, রাগরূপও সীমার বাঁধনে বদ্ধ। কবি বলিতেন—"Art is never an exhibition but a revelation. Exhibition এর গর্ব তার অপরিমিত বহুলত্বে, Revelationএর গৌরব তার পরিপূর্ণ ঐক্যে। সেই ঐক্যে থামা বলে একটা পদার্থ আছে, চলার চেয়ে তার কম মূল্য নয়। সে থামা অত্যন্ত জরুরী। ওস্তাদী গানে সেই জরুরী নেই, সে কেন যে কথনোই থামে তার কোনো অনিবার্য্য কারণ দেখিনে।"

কবি তাঁহার গানের প্রচারের দায়িত্ব কখনও নিজে গ্রহণ করেন নাই। প্রথম বয়সে ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাতে প্রচারের ভার; মধ্য বয়সে পরিবেষণের ভার ছিল দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে। তাঁহার মৃত্যুর

পর কবির গীতিপ্রচারের আর কোনো সুব্যবস্থাই রহিল না। কবি বলিয়াছেন—

"এই আশ্রমকে আনন্দনিকেতন করবার জন্য তরুলতার শ্যাম শোভা যেমন দরকার, তেমনি প্রয়োজন ছিল সঙ্গীতের উৎসবের। সেই আনন্দ উপচারসংগ্রহের প্রচেষ্টার প্রধান সহায় ছিলেন দিনেন্দ্র। আমি যে সময় এখানে এসেছিলেম তখন আমি ছিলেম ক্লান্ত, আমার বয়স তখন অধিক হয়েছে, প্রথমে যা পেরেছি, শেষে তাও পারিনি। আমার কবি প্রকৃতিতে আমি যে দান করেছি, সেই দানের বাহন ছিলেন শ্রীমান দিনেন্দ্র।"

রবীন্দ্রনাথ যেন মৃত্যুশয্যায় উইলের দ্বারা তাঁহার সব গানকেই ভক্তদেরই দান করিয়া গিয়াছেন—"যারা খেটে খায় তাদের পক্ষে কালোয়াতি গান হয়ে উঠে না, তাদের পক্ষে ওস্তাদের মত গলা সাধা শক্ত—সেই জন্য আমার গান ব্যবসায়ীদের বাইরে থাকাই ভালো। গান হবে যারা আশেপাশে থাকে যাতে তারা খুসী হয়, তাদের আনন্দের জন্যেই আমার সব গান, বাইরের হাততালি পাবার জন্য নয়। আমার গান যদি শিখতে চাও, নিরালায় স্বগত গলা ছেড়ে গাবে! আমার আকাঙ্ক্ষার দৌড় এই পর্য্যন্ত।"

অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত প্রভৃতি সুরকারের বহু গান সুরমর্য্যাদায় রবীন্দ্রসঙ্গীত অপেক্ষা উচ্চাঙ্গের হইলেও তাঁহাদের গানকে অবলম্বন করিয়া কোনো বিশিষ্ট গীতিরীতি গঠিত হয় নাই। হয়ত সে কারণেই তাঁহাদের গান জনপ্রিয়তা লাভ করিল না। তাহা ছাড়া কবির গানের পরিবেশনে এবং প্রচারে যে ভাবে সুশৃঙ্খলা অবলম্বন করা হইয়াছে, তাঁহাদের গানের সে সৌভাগ্য লাভ হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের গানের গীতিরীতির অবিকল অনুকরণ বজায় রাখা হইয়াছে 'আধুনিক বাংলা-গানে।' কিন্তু এ সকল গান ভাবের

অগভীরতা এবং সুরের তরলতার জন্য মোটেই স্থায়িত্ব পাইতেছে না। সিনেমার চটুল সুর এবং লঘুভার কথাই ক্রমে বাংলাগানের একমাত্র অবলম্বন হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রসঙ্গীত জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছে তাহার সুর অপেক্ষা বাণী-সজ্জার জন্যই, একথা আগেই বলা হইয়াছে। কবি নিজেও তাঁহার গানের কথাকে সুরের উপর বসাইতে চাহিয়াছেন। তবু গান তো কবিতা নয়, শুধু আবৃত্তি করিলেই বা চলিবে কেন?

কবির কোনো কোনো গান অবশ্য প্রায় কাব্যাবৃত্তির পর্য্যায়েও সুরকে লইয়া গিয়াছে; এ সমস্ত গানে সুরের অংশ প্রায় নাই বলিলেই চলে। এ শ্রেণীর গানের সংখ্যা অল্প নয়, তাহাদের মধ্যে মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করা হইল—(১) দুঃখের বরষায় চক্ষের জল। (২) ছিন্ন পাতার সাজাই তরণী। (৩) কোথা বাইরে দূরে যায়রে উড়ে। (৪) প্রাণ চায়, চক্ষু না চায়। (৫) আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে। (৬) এ শুধু অলস মায়া প্রভৃতি। এ সমস্ত গানের কোনো অংশ ফিরিয়া গাহিবার প্রয়োজন হয় না; প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটানে পুনরাবৃত্তি না করিয়াই গাওয়া যায়।

অবশ্য কথার ভাবধারা রক্ষা করিয়া গাওয়াই রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রধান গীতিবৈশিষ্ট্য, কিন্তু সেই সঙ্গে সে ভাবধারা রক্ষা করিতে হইবে সুরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্বরলিপি ছাড়া তাহার একটি standardisd গীতি-প্রণালী খাড়া করা উচিত;—সেজন্য এই কয়টি পদ্ধতি অবলম্বন করা চলে:

(১) **প্রচলিত অলঙ্করণ-রীতির অনুসরণ**—রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত গানই ধ্রুপদ-খেয়াল-ঠুংরি-টপ্পা-বাউল-কীর্ত্তন-বিলিতিভঙ্গী প্রভৃতি কোনো-না-কোনো শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। প্রত্যেক শ্রেণীর গানেরই পরিবেশন বৈশিষ্ট্য আছে, রবীন্দ্রনাথের গানেরও যথাযোগ্য

স্থানে সেগুলি বজায় রাখা উচিত। কবি শাস্ত্রীয় বিধি বিধান একবারে কখনও অস্বীকার করিতেন না। তাঁহার কথায়—"সঙ্গীতে আমি নির্মমভাবে আধুনিক, অর্থাৎ জাত বাঁচিয়ে আচার মেনে চলিনে কিন্তু একেবারেই ঠাট বজায় না রাখি যদি, তবে সেটা পাগলামি হয়ে দাঁড়ায়।" অবশ্য কবি অনেক স্থলে নিজেই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া গিয়াছেন যেমন, তাঁহার নিজস্ব রীতির কীর্তনে আঁখরের ব্যবহার নাই। রবীন্দ্রনাথের আধুনিক সমস্ত গানেই কীর্ত্তনের শান্ত পবিত্রতা বিরাজ করিতেছে।

বাউলের ধুয়াও তাঁহার গানে নাই। বাউলের সহজ সুরটি একশ্রেণীর প্রায় সমস্ত গানেই অল্পবিস্তর আসিয়া পড়িয়াছে. কীর্তনের সঙ্গে সংমিশ্রিত হইয়াছে, রাগসঙ্গীতের উপর প্রভাব সম্পাতও করিয়াছে।

বিশিষ্ট ভঙ্গীর টপ্পাই তাঁহার শেষ বয়সের গানের রীতি হইয়া উঠিয়াছিল। টপ্পাভঙ্গিমার গানে পৃথক পৃথক দুইটি তুকে বিশিষ্ট ধরণের স্বরক্ষেপণ এবং সুরবিস্তার করা হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রথম বয়সে প্রচলিত রীতিতে টপ্পা রচনা করিতেন, পরে গিটকিরি, মুড়কিবহুল তান কমাইয়া নিজস্ব ভঙ্গীর টপ্পা সৃষ্টি করিলেন।

কাব্যসঙ্গীতের ধারায় কবি রাগসঙ্গীতের অনুশাসন নির্মমভাবে ভাঙ্গিয়াছেন। গানে চিরাচরিত 'পকড়' (রাগিণী চিহ্ন) দেখিয়া আর কেহ সুর নির্দ্দেশ করিতে পারিবে না। বেহাগ আর ভৈরবী কবির প্রিয় রাগিণী—এ দুটি রাগিণীর স্বর তিনি অন্যান্য বহু গানেই নির্বিচারে ব্যবহার করিয়াছেন।

(২) গানের **সাবলীল গতিকে** বজায় রাখা—গান সুরু করিলে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একই বেগে বা tempo-তে গাহিতে হয়; গানের মধ্যে অযথা বিরাম গ্রহণ অথবা অন্য কোনো ভাবে বিলম্বের দ্বারা রসের সঞ্চারকে মন্দীভূত করা উচিত নয়। একটা Mechanical

বা যান্ত্রিক গতিতে গানকে গাহিয়া চলা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য। Improvisation বা সুরবিহার করিয়া রবীন্দ্র সঙ্গীতকে ভারাক্রান্ত না করাই উচিত। অযথা কূটতানের ব্যবহার অনেকেই তাঁহার গানে করিয়া থাকেন, তাহাতে গানের কথার রীতিমতো রসভঙ্গ ঘটে!

(৩) **কণ্ঠসৌকুমার্য্য**—রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গানের রসোত্তীর্ণতা নির্ভর করে কণ্ঠের উপরই। তাঁহার প্রায় সকল গানই কোমলতার অভিদ্যোতক, তাই কোমল কণ্ঠেরই উপযোগী। অবশ্য উদ্দীপনাময় গানগুলি এবং সমবেত কণ্ঠের উপযোগী গানগুলি পৌরুষব্যঞ্জক স্বরেই মানায় ভালো। মনে হয় পুরুষের কণ্ঠের অপেক্ষা বামাকণ্ঠেই রবীন্দ্র-সঙ্গীত মধুরতর শোনায়! রবীন্দ্রনাথের নিজের কণ্ঠস্বরও অনেকটা বামাকণ্ঠস্বরের মতই ছিল!

শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই বিষয়ে বলেন—"রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়নপদ্ধতিতে কণ্ঠের সহজ উদাত্ত ব্যবহার বরাবরই কিছু কম। এখন আরো কমে আস্‌ছে। **দোষটি কিন্তু সহজেই কাটানো যায়। উপায়—তানপুরার সাহায্যে বছর দুই কণ্ঠস্বরের সাধনা। আ-স্বর যতদিন না কণ্ঠে বাসা বাঁধ্‌ছে অর্থাৎ স্থিত হচ্ছে ততক্ষণ রবীন্দ্রসঙ্গীত মুখস্থ করা উচিত নয়।"

(৪) **বাচন ভঙ্গীর স্বাভাবিকতা**—গানে স্বাভাবিক কথা বলার ভঙ্গীকে যতদূর সম্ভব গ্রহণ করার প্রয়োজন। আমরা যে ভঙ্গীতে আলাপ করি, গানের কথাগুলিকেও সে ভাবেই উচ্চারণ করা উচিত। কথাকে আড়ষ্টতায় দুষ্ট অথবা ন্যাকামিতে পুষ্ট করিলে রসভঙ্গ হইবে! তবে এ কথাও স্মরণ রাখার প্রয়োজন যে, শিল্পী গান গাহিতেই বসিয়াছে, কথা বলিবার জন্য নয়; লীলায়িত করিয়া সুকুমার করিয়া কথাগুলিকে বলিলে গানের একটি বিশেষ আবেদনের সঞ্চার হয়। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কথা বলিবার ভঙ্গী এবং তাঁহার কণ্ঠমাধুর্য্যকে যদি

গায়ক অজ্ঞাতসারেও অনুকৃত ক'রে তবে নিশ্চয় অন্যায় হইবে না।

(৫) **অনুভূতির রম্যতা**—রবীন্দ্রনাথের গান অনুভূতির গান! গানের মর্ম্মস্পর্শী কথার সঙ্গে তাহার উপযোগী সুর ইন্দ্রিয়কে বাহ্য জগৎ হইতে বহু দূরে স্বপ্নালোকে লইয়া যায়। এই অনুভূতি যতক্ষণ না গায়কের অন্তরে সঞ্চারিত এবং শ্রোতার অন্তরে উদ্‌বুদ্ধ হয় ততক্ষণ গানের রস সার্থকতা লাভ করিবে না! এই অনুভূতি গীতিকৌশল-সঞ্জাত নয়, কাব্য মাধুর্য্য সঞ্জাত। কবির নিজের কথায়—"আমি যদি ওস্তাদের কাছে গান শিক্ষা করে দক্ষতার সঙ্গে সেই সকল দুরূহ গানের আলাপ করতে পারতুম তাতে নিশ্চয়ই সুখ পেতুম, কিন্তু আপন অন্তর থেকে প্রকাশের বেদনাকে গানে মূর্ত্তি দেবার যে আনন্দ সে তার চেয়ে গভীর। সে গান শ্রেষ্ঠতায় পুরাযুগের গানের সঙ্গে তুলনীয় নয়, কিন্তু আপন সত্যতায় সে সমাদরের যোগ্য।"

(৬) **তানের ব্যবহার**—রাগসংগীতের স্বল্পাক্ষর গানের মধ্যে কলাবৈচিত্র্য সৃষ্টি করে এই 'তান'ই। রবীন্দ্রনাথের গানে তানের ব্যবহার অল্প; কিন্তু তান এবং উপজের ব্যবহারেই উচ্চাঙ্গ রাগসংগীতের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। কবির গানে বাণীর প্রাধান্যই তানের প্রয়োজন এড়াইয়াছে।

কবি তানালাপ ব্যবহারে ঠিক আপত্তিও করেন নাই। তিনি বলেন—"বাংলা গানে হিন্দুস্থানী সংগীতের মতন অবাধে তানালাপের স্বাধীনতা দিলে তার বিশেষত্ব নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।...... তবে আমি তো কখন এ কথা বলিনি যে কোনও বাংলা গানেই তান দেওয়া চলে না। অনেক বাংলা গান আছে যা হিন্দুস্থানী কায়দাতেই তৈরী, তানের অলঙ্কারের জন্য তার দাবী আছে। আমি এ রকম শ্রেণীর গান অনেক রচনা করেছি। সে গুলিকে আমি নিজের মনে কত সময়ে তান দিয়ে গাই।"

রবীন্দ্রনাথের অল্প কাব্যাশ্রিত গানে তানের কিছু কিছু ব্যবহার চলিতে পারে, যেমন—

(১) বাজে করুণ সুরে। (২) এসো শরতের অমল মহিমা। (৩) কার বাঁশী নিশি ভোরে। (৪) সখী, আঁধারে একেলা ঘরে। (৫) ঝরঝর ঝরিষে বারিধারা। (৬) বাদল মেঘে মাদল বাজে। (৭) অশ্রুভরা বেদনা। (৮) কোথা যে উধাও হল। (৯) বন্ধু, রহো রহো সাথে। (১০) ঝরে ঝর ঝর ভাদর-বাদর। (১১) তুমি কিছু দিয়ে যাও প্রভৃতি প্রচলিত সুরে রচিত গানগুলিতে বিশিষ্ট তান ব্যবহাব করা হয়।

রবীন্দ্রনাথের গান শুনিয়া শুনিয়া ক্রমে শ্রোতার মনের সঙ্গে তাঁহার সুরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য সঞ্চার হয়, অবচেতন মনে তাঁহার সুরের একটি অখণ্ড রূপেরও বিকাশ হয়। তখন শ্রোতার এমন একটি ক্ষমতা জন্মায় যে কেবল সুরের সামান্য ধ্বনি শুনিয়াই তাঁহার গানকে চিনিতে পারে অন্তরঙ্গের মতো সহজে।

সারাজীবন সাধনার পর বীণাপাণিব মন্দিরপ্রাঙ্গণে বীণাখানি নামাইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কবি বিশ্ববাসীকে বলিয়া গিয়াছেন:

আমি তীরে বসি তারি রুদ্রতালে
গান বেঁধে লভিয়াছি আপন ছন্দের অন্তরালে
অনন্তের আনন্দ বেদনা। নিখিলের অনুভূতি
সংগীত সাধনামাঝে রচিয়াছে অসংখ্য আকৃতি।
এই গীতিপথপ্রান্তে, হে মানব তোমার মন্দিরে
দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দ্যের তীরে
আরতির সান্ধ্যক্ষণে:—একের চরণে রাখিলাম
বিচিত্রের নর্ম বাঁশি,—এই মোর রহিল প্রণাম।

শেষ